বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

কোর্স কোড: SSC 1659

সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এসএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

কোর্স কোড :SSC-1659
এসএসসি প্রোগ্রাম

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ২০১৬
পুন:মুদ্রণ: মে, ২০১৭
পরিমার্জিত সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০২৬
[বাউবি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস বিষয়ক রিভিউ কমিটির তত্ত্বাবধানে পরিমার্জিত]

প্রচ্ছদ
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর।

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ টিপু সুলতান

© **বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়**

ISBN 978-984-34-3123-03

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

মুদ্রণ
সৃষ্টি প্রিন্টার্স
৬/৩, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

পাঠ প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য **বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা** নামক বইটি রচনা করা হয়েছিল। বইটি শুরুতেই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা আমলে নিয়ে স্ব-শিখন তথা মডিউলার পদ্ধতিতে লেখা হয়েছিল। তবে প্রাথমিকভাবে লিখিত গ্রন্থটিতে প্রচুর তথ্য বিচ্যুতি ও ইতিহাসের বিপরীতমুখী ধারণা উপস্থাপিত হয়। বিষয়টি আমলে নিয়ে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রিভিউয়ার প্যানেল গ্রন্থটির জন্য প্রয়োজনীয় নুন্যতম সংস্কার ও পরিমার্জন করেছেন। তবে দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রন্থটি নতুনভাবে প্রণয়নের প্রচেষ্টা রয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ইতিহাস বিষয়টি সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় হওয়াটা বাঞ্ছনীয়। সে উদ্দেশ্যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র, আলোকচিত্র ও অঙ্কিত চিত্র সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ব-শিখন পদ্ধতিতে পাঠ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের এই গ্রন্থটি উপকারে আসতে পারে।

সূচিপত্র

ইউনিট ১: ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা ১-৩
পাঠ ১.১: ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা ১

ইউনিট ২: বিশ্বসভ্যতা ৪-২০
পাঠ ২.১: মিসরীয় সভ্যতা ৪
পাঠ ২.২: মেসোপটেমীয় সভ্যতা ৮
পাঠ ২.৩: সিন্ধু সভ্যতা ১০
পাঠ ২.৪: চিন সভ্যতা ১৪
পাঠ ২.৫: গ্রিক সভ্যতা ১৮

ইউনিট ৩: বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব ২১-২৭
পাঠ ৩.১: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি ২১
পাঠ ৩.২: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং এর প্রভাব ২৫

ইউনিট ৪: প্রাচীন বাংলার জনপদ ও রাজনৈতিক ইতিহাস ২৮-৪১
পাঠ ৪.১: প্রাচীন বাংলার জনপদ ২৮
পাঠ ৪.২: প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ৩২
পাঠ ৪.৩: বাংলায় পাল বংশের শাসন ৩৪
পাঠ ৪.৪: বাংলায় সেন বংশের শাসন ৩৮

ইউনিট ৫: প্রাচীন বাংলার জীবনচর্যা ৪২-৪৯
পাঠ ৫.১: প্রাচীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি ৪২
পাঠ ৫.২: প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি ৪৬

ইউনিট ৬: মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ৫০-৬৫
পাঠ ৬.১: বখতিয়ার খিলজি ও বাংলায় তুর্কি শাসন ৫০
পাঠ ৬.২: ইলিয়াস শাহ্ ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন ৫৫
পাঠ ৬.৩: হোসেনশাহী বংশের অধীনে বাংলা ৫৮
পাঠ ৬.৪: বাংলায় মোগল শাসন ও বার ভুঁইয়া ৬১

ইউনিট ৭: মধ্যযুগে বাংলার জীবনচর্যা ৬৬-৭২
পাঠ ৭.১: মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি ৬৬
পাঠ ৭.২: মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি ৭০

ইউনিট ৮: বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ৭৩-৮৪
পাঠ ৮.১: বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ৭৩
পাঠ ৮.২: বাংলায় ইংরেজদের ক্ষমতা দখল ৭৬
পাঠ ৮.৩: চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৮১

ইউনিট ৯: বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রভাব ৮৫-৯১
পাঠ ৯.১: অর্থনৈতিক শোষণ ও দুর্ভিক্ষ ৮৫
পাঠ ৯.২: বাংলায় ইংরেজদের সংস্কার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন ৮৯

ইউনিট ১০: বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ ৯২-১০১
পাঠ ১০.১: ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ ৯২
পাঠ ১০.২: তিতুমীরের সংগ্রাম ৯৫
পাঠ ১০.৩: নীল বিদ্রোহ ৯৭
পাঠ ১০.৪: ফরায়েজি আন্দোলন ৯৯

ইউনিট ১১: বাংলায় নবযুগ ১০২-১১১
পাঠ ১১.১: নবজাগরণ ও রাজা রামমোহন রায় ১০২
পাঠ ১১.২: ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১০৫
পাঠ ১১.৩: নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী ১০৮
পাঠ ১১.৪: বেগম রোকেয়া ১১০

ইউনিট ১২: ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধীকার আন্দোলন ১১২-১৩৩
পাঠ ১২.১: ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম ১১২
পাঠ ১২.২: ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন ১১৬
পাঠ ১২.৩: বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন ১১৯
পাঠ ১২.৪: খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ১২২
পাঠ ১২.৫: লাহোর প্রস্তাব ১২৬
পাঠ ১২.৬: ব্রিটিশ শাসনের অবসান ১২৯

ইউনিট ১৩: ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয় ১৩৪-১৬০
পাঠ-১৩.১ : ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ১৩৪
পাঠ-১৩.২ : ভাষা আন্দোলন ১৩৭
পাঠ-১৩.৩ : পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি ১৪১
পাঠ-১৩.৪ : ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন ১৪৫
পাঠ-১৩.৫ : সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫) ১৪৯
পাঠ-১৩.৬ : ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন ১৫৩
পাঠ-১৩.৭ : উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ১৫৬

ইউনিট ১৪: ১৯৭০ এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ ১৬১-১৮৫
পাঠ-১৪.১ : ১৯৭০ সালের নির্বাচন ১৬১
পাঠ-১৪.২ : অসহযোগ আন্দোলন ১৬৫
পাঠ-১৪.৩ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ১৬৮
পাঠ-১৪.৪ : প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ ১৭২
পাঠ-১৪.৫ : মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা ১৭৬
পাঠ-১৪.৬ : মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত ১৮১
পাঠ-১৪.৭ : স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ১৮৩

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা **কোর্স কোড : SSC-1659**

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এসএসসি প্রোগ্রামের নতুন সিলেবাসের আলোকে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে 'বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা' বইটি রচিত হয়েছে।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হল স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একইসাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। এ কারণেই বইটির বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বোঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। কোর্স বইটির ভাবগত ঐক্য রক্ষা করে পাঠের বিষয়বস্তুকে কতগুলো ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। আবার ইউনিটগুলোকে কতগুলো পাঠে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশেষ কোন্ দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। ইউনিটটি কত সময়ে শেষ করতে হবে তা ইউনিটের শুরুতে উল্লেখ করা আছে এবং ইউনিটে কতগুলো পাঠ আছে তাও উল্লেখ করা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের শিখনফল/উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শিখনফল অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কী না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি মূলপাঠ অবশ্যই বুঝে-বুঝে পড়তে হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে ঐ পাঠের সারসংক্ষেপ দেয়া আছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে এবং ইউনিটের শেষে চূড়ান্ত মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন দেয়া হয়েছে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনা

শিক্ষার্থীরা যাতে এই বই পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারেন সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো :

- ইউনিটের শিরোনাম, ভূমিকা ও উদ্দেশ্য পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হল কী না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোন ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝার ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য প্রতিটি ইউনিটের প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার্থীর কাজ (অ্যাকটিভিটি) সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাকটিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- অধ্যয়নের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের সমস্যাগুলো নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করুন। বই-এর শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং সমস্যার সঠিক সমাধানের চেষ্টা করুন। চূড়ান্ত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রয়োজনে সহপাঠিদের সাথে সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন, দেখবেন সমাধানের পথ সহজ হয়ে গেছে।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে কতটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রত্যেক টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের (শিক্ষকের) সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মডিউল এর কোন্‌টি শিখনফল, কোন্‌টি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোন্‌টি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোন্‌টি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে এই পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

কোর্সবই অনুসরণের নির্দেশনা	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	শিক্ষার্থীর কাজ	সারসংক্ষেপ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	ভিডিও বা দেখা	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

কোর্স সমাপ্তির সময়	**কোর্সটি সমাপ্তির সর্বোচ্চ ৯০ দিন সময় লাগবে**

অডিও/ভিডিও	এ বিষয়ের অডিও ও ভিডিও প্রোগ্রাম যথাক্রমে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হবে। প্রোগ্রামের সিডিউল সংগ্রহ করে তা শুনতে পাবেন।

সাহায্য/ প্রয়োজনে	**সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–**	**ড. মো. আদনান আরিফ সালিম** **সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস)** ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর-১৭০৫। adnan@bou.ac.bd

ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা

ইউনিট ১

বাংলাদেশের অতীত ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্পর্কে জানতে হলে ইতিহাস পাঠ প্রয়োজন। ইতিহাস তুলে ধরে দেশ বা জাতির বিভিন্ন যুগের সামাজিক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনের সত্যনিষ্ঠ ধারাবাহিক বর্ণনা। মানব সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত এই সব বর্ণনাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু। ইতিহাস পাঠ করতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে ইতিহাস কী? জানতে হবে এর বিষয়বস্তু এবং পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এই ইউনিটে এসব বিষয় নিয়েই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ ঃ ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ দিন**

পাঠ-১.১ ইতিহাসের সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ইতিহাসের সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিবরণ দিতে পারবেন;
- ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ঐতিহ্য, ইতিহ+আস, হিস্টরিয়া, ইতিহাসের জনক, গুহাবাসী, কৃষিসভ্যতা, ভিকো, লিওপোল্ড ফন্ র‌্যাংকে

ইতিহাসের সংজ্ঞা: ‘ইতিহাস’ শব্দটির উৎপত্তি ‘ইতিহ’ শব্দ থেকে যার অর্থ ‘ঐতিহ্য’। ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস। ঐতিহাসিক ই.এইচ.কার-এর ভাষায়, ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।

ইতিহাস শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে এর রূপ দাঁড়ায়, ইতিহ+আস। যার অর্থ এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ড. জনসনও ঘটে যাওয়া ঘটনাকে ইতিহাস বলেছেন। তাঁর মতে, যা কিছু ঘটে তাই ইতিহাস। যা ঘটে না তা ইতিহাস নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ ও রাষ্ট্রে নিরন্তর বয়ে যাওয়া ঘটনা প্রবাহই ইতিহাস।

গ্রিক শব্দ ‘হিস্টরিয়া’ (Historia) থেকে ইংরেজি ‘হিস্ট্রি’ (History) শব্দটির উৎপত্তি। যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ইতিহাস। ‘হিস্টরিয়া’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক) তিনি ‘ইতিহাসের জনক’ হিসেবে খ্যাত। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণা কর্মের নামকরণে এ শব্দটি ব্যবহার করেন যার আভিধানিক অর্থ হলো সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস হলো যা সত্যিকার অর্থে ছিল বা সংঘটিত হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা ও লেখা। তিনি তাঁর গবেষণায় গ্রিস ও পারস্যের (বর্তমানে ইরান) মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন।

এতে তিনি প্রাপ্ত তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ এবং গ্রিসের বিজয়গাঁথা লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ ঘটনা ভুলে না যায়। এ বিবরণ যাতে তাদের উৎসাহিত করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। হেরোডোটাসই প্রথম ইতিহাস এবং অনুসন্ধান – এ দুটি ধারণাকে সংযুক্ত করেন। ফলে ইতিহাস পরিণত হয় বিজ্ঞানে; পরিপূর্ণভাবে হয়ে ওঠে তথ্য নির্ভর এবং গবেষণার বিষয়। ইতিহাসবিদ টয়েনবির মতে, সমাজের জীবনই ইতিহাস। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের অনন্ত ঘটনা প্রবাহই হলো ইতিহাস। আবার র‍্যাপসন বলেছেন, ইতিহাস হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বর্ণনা। আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন্ র‍্যাংকে মনে করেন, প্রকৃত পক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, ইতিহাস হলো মানব সমাজের অতীত কার্যাবলির বিবরণ। সুতরাং সাধারণভাবে বলতে গেলে, ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। সঠিক ইতিহাস সব সময় সত্যকে নির্ভর করে রচিত।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু : মানব সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রামাণ্য ও লিখিত দলিল হলো ইতিহাস। ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিকো (Vico) মনে করেন যে, মানব সমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশ হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। মানব জীবনের গতিধারা সৃষ্টির শুরু থেকে যা কিছু ঘটেছে, সব কিছুই ইতিহাস। কিন্তু ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা ইতিহাসে স্থান পায় না, বরং যে সব ঘটনা বা বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়, তাই সাধারণত ইতিহাসে স্থান পায়। এসব ঘটনাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

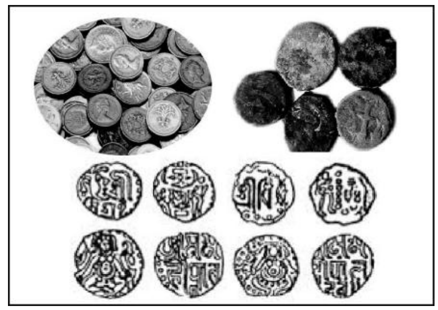

ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস শুধু ঘটনার সমষ্টি নয়, ঘটনার অন্তরালে থাকা পরিস্থিতির বিশ্লেষণও ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। ইতিহাসের অন্যতম বিষয়বস্তু হলো মানব সমাজ, সভ্যতা বিকাশের ধারাবিবরণী। অর্থাৎ মানুষের আদিম সভ্যতা ও তার ক্রমবিকাশ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। এক সময় মানুষ ছিল গুহাবাসী। তার জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল শিকার, মাছধরা, ফলমূল সংগ্রহ। এরপর ধীরে ধীরে তার জীবিকার ধরণ বদলাতে থাকে। এক সময় যাযাবর মানুষ কৃষিজীবী মানুষে পরিণত হয়। এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কৃষিসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকে নগরসভ্যতা। এসব পরিবর্তনের বিবরণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা মানব সমাজ-সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাস ভুক্ত বিষয়। যেমন– শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম আইন – প্রভৃতি বিষয় সামগ্রিকভাবে যা কিছু সমাজ-সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা: মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের সত্য নির্ভর বিবরণ হচ্ছে ইতিহাস। যে কারণে জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাসের গুরুত্ব অসীম। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে, ভবিষ্যৎ অনুধাবন করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের ফলে মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজদেশ সম্পর্কে মঙ্গল-অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব। সুতরাং দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তির প্রয়োজনে ইতিহাস পাঠ অত্যন্ত জরুরি।

অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ জাতির সফল সংগ্রাম, গৌরবময় ঐতিহ্যের তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। সে ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই।

ইতিহাস জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠির উত্থান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালো মন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারে। ফলে সে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

ইতিহাসের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ ইতিহাস পাঠ ক'রে অতীত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। ইতিহাস দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় বলে ইতিহাসকে বলা হয় শিক্ষনীয় দর্শন। মানুষ কৌতুহলপ্রিয়। মানুষ তার অতীত ঘটনা জানতে চায়। ইতিহাস পাঠ করার মাধ্যমেই অতীতকে জানা সম্ভব।

সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস পাঠ করে যে জ্ঞান লাভ হয়, তা বাস্তব জীবনে চলার জন্য উৎকৃষ্টতম শিক্ষা। ইতিহাস পাঠ করলে বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, যা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করে। ফলে জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ জন্মে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	১। সত্যনিষ্ঠ তথ্যের সাহায্যে অতীতকে পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য – ব্যাখ্যা করুন। ২। আপনার এলাকার অথবা কাছাকাছি অবস্থিত কোন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করে তার ঐতিহাসিক উপাদানগুলো চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

ইতিহাস হলো মানব সভ্যতা ও মানব সমাজের অগ্রগতির ধারাবাহিক সত্যনির্ভর বিবরণ। বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির উত্থান পতনের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। গ্রিক পণ্ডিত হেরোডোটাস সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সম্মতভাবে মানুষের অতীতের কাহিনি ধারাবাহিকভাবে রচনার চেষ্টা করেছিলেন বলে তাকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। ইতিহাস পাঠ করে আমরা অতীতের অবস্থা জানতে পারি। আবার অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যৎও গড়তে পারি। সর্বোপরি ইতিহাস পাঠ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম, আত্মমর্যাদাবোধ এবং জাতীয়তাবোধেরও জন্ম দেয়। সে ক্ষেত্রে ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ একটি শাস্ত্র বা বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ইতিহাস শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে কোনে শব্দ থেকে?
(ক) ইতি (খ) ইতিহ (গ) ঐতিহ্য (ঘ) ঐতিহ

২। আধুনিক ইতিহাসের জনক কে?
(ক) ই এইচ কার (খ) লিওপোল্ড ফন্ র‌্যাংকে (গ) হেরোডোটাস (ঘ) মারটিমার হুইলার

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুরাদনগরের ডালিয়া মামার সাথে ময়নামতি যাদুঘর দেখতে আসে, এখানে মুদ্রা, তাম্রলিপি, স্তম্ভলিপির মত প্রাচীন নিদর্শনগুলো দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়।

৩। উদ্দীপকের ডালিয়া ময়নামতি যাদুঘরে যে উপাদানগুলো দেখতে পায় তা– প্রয়োজন হয়
(ক) ইতিহাস রচনায় (খ) শাসকের পরিচয় প্রদানে (গ) স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় পেতে (ঘ) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে

৪। ডালিয়া যাদুঘর পরিদর্শন করে জানতে পারে–
i) সামাজিক ইতিহাস ii) অর্থনৈতিক ইতিহাস iii) সাংস্কৃতিক ইতিহাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। ইতিহাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–
(ক) গবেষণা (খ) যুদ্ধের বর্ণনা (গ) শাসকের কর্মকাণ্ড (ঘ) শুধু অতীত ঘটনার বর্ণনা

সৃজনশীল প্রশ্ন

নিলুফারের মেয়ে বইমেলায় কিছু ইতিহাসের বই কিনছিল। কারণ তার প্রিয় বিষয় ইতিহাস। শ্রেণিকক্ষেও সে শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় সবার আগে, সেই সাথে প্রশ্ন করে জানতে চায় ইতিহাস পাঠ করা কেন প্রয়োজন? শিক্ষক উত্তরে বলেন মানুষ ও তার চারপাশ এবং এর ধারাবাহিক অগ্রগতি সবই ইতিহাসের অংশ। তদুপরি "ইতিহাস সত্য নির্ভর" যা পাঠের মাধ্যমে দেশকে ভালোবেসে দেশ গঠনে মানুষ এগিয়ে যায়।

ক. কোন ইতিহাসবিদের মতে "সমাজের জীবনই ইতিহাস"।
খ. ইতিহাসের জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে কীভাবে? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের শিক্ষকের উত্তরের সাথে পাঠ্যপুস্তকের ইতিহাসের বিষয়বস্তুর কতটুকু মিল রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. ইতিহাসের উপাদান সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমৃদ্ধ দেশ গঠন করে – আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ ঃ ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ ৫. ক

বিশ্বসভ্যতা

ইউনিট
২

আদিম যুগে মানুষ কৃষিকাজ জানত না। বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করত। এই ছিল তাদের খাদ্য। এরপর মানুষ পাথর ভেঙে ঘষে ঘষে ধারালো অস্ত্র তৈরি করতে শেখে। সে সময় পাথরই ছিল তাদের একমাত্র হাতিয়ার। সে কারণে এ যুগকে পাথরের যুগ বলা হয়। পাথর যুগের প্রথম পর্যায়কে বলা হতো পুরনো পাথরের যুগ বা পুরোপলীয় যুগ। এ যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে দলবদ্ধভাবে পশু শিকার করত। এরা আগুনের ব্যবহারও জানত।

পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষ যখন কৃষিকাজ শেখে, একই সঙ্গে শেষ হয় তার যাযাবর জীবন। এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির প্রয়োজনে এযুগে মানুষ নদীর তীরে তীরে বসবাস শুরু করে। ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে শেখে। এভাবেই মানব সভ্যতার শুরু। এই ইউনিটে কীভাবে মানুষ ধাপে ধাপে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তারই সত্য কাহিনী, যাকে আমরা বলি ইতিহাস– সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে। যে সভ্যতাগুলো থেকে প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস জানা যায় এমনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সভ্যতা সম্পর্কে এ ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন: মিশরীয় সভ্যতা, মোসোপটেমীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, চীন সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ ঃ মিশরীয় সভ্যতা	পাঠ-২.২ ঃ মেসোপটেমীয় সভ্যতা
পাঠ-২.৩ ঃ সিন্ধু সভ্যতা	পাঠ-২.৪ ঃ চিন সভ্যতা
পাঠ-২.৫ ঃ গ্রিক সভ্যতা	পাঠ-২.৬ ঃ রোমান সভ্যতা

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১০ দিন**

পাঠ-২.১ মিশরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ধারাবাহিক বর্ণনা করতে পারবেন;
- নীলনদের অবদান, প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বিশ্বসভ্যতা বিকাশে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	খ্রিস্টপূর্ব, ঐতিহাসিক যুগ, হায়ারোগ্লিফিক, নরপতি, ফারাও, মমি, পিরামিড, প্রাচীন বিশ্বসভ্যতা, নোম, 'পের-ও', নারমার, মেনেস

পটভূমি

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার বিস্তৃতিকাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ পর্যন্ত। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশ যা আমাদের কাছে পরিচিত ইজিপ্ট বা মিশর নামে। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মিশরে প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। যার একটি ছিল উত্তর মিশর (নিম্ন মিশর) অপরটি ছিল দক্ষিণ মিশর (উচ্চ মিশর)। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত সময়ে

নীলনদের অববাহিকায় একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সে সময়টা প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলে পরিচিত। এ সময় থেকে মিশর প্রাচীন সভ্যতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে। প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ অব্দ থেকে। তখন থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের শুরু। একই সময়ে নিম্ন ও উচ্চ মিশরকে একত্রিত করে 'নারমার' বা 'মেনেস' একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি এবং পুরোহিত হন। তিনি প্রথম ফারাও-এর মর্যাদাও লাভ করেন। এরপর থেকে ফারওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে শুরু করে।

সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান

বিশ্বসভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

রাষ্ট্র ও সমাজ

প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতগুলো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে 'নোম' বলা হতো। মিশরের প্রথম রাজা বা ফারাও-এর (মেনেস বা নারমার) অধিনে ঐক্যবদ্ধ মিশরের রাজধানী ছিল দক্ষিণ মিশরের মেম্ফিস। মিশরীয় 'পের-ও' শব্দ থেকে ফারাও শব্দের জন্ম। ফারওরা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তারা নিজেদেরকে সূর্য দেবতার বংশধর মনে করতেন। ফারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। অর্থাৎ ফারাওয়ের ছেলে হতো উত্তরাধিকার সূত্রে ফারাও। পেশার উপর ভিত্তি করে মিশরের সমাজের মানুষকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমনঃ রাজপরিবার, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকার, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক ও ভূমিদাস।

মিশরের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষি নির্ভর। নীল নদের তীরে গড়ে তোলা সভ্যতার মানুষ অর্থাৎ মিশরীয়রা বন্যার সময় বাঁধ তৈরি করে ফসল রক্ষা করত। আবার শুষ্ক মৌসমে ফসলের ক্ষেতে পানি দেয়ার জন্য খাল কেটে গড়ে তুলেছিল সেচ ব্যবস্থা। মিশরেই প্রথম সরকারি ব্যবস্থায় চাষাবাদ চালু হয়। কৃষিনির্ভর মিশরের উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচ ইত্যাদি। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও মিশর ছিল অগ্রগামী। মিশরে উৎপাদিত গম, লিনেন কাপড় ও মাটির পাত্র ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় রপ্তানি হতো। বিভিন্ন দেশ থেকে মিশরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি আমদানি করতো।

নীল নদঃ

মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক 'হেরোডোটাস' যথার্থই বলেছেন– 'মিশর নীল নদের দান।' নীল নদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীন কালে প্রতিবছর নীল নদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হয়ে যেতো। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল।

মিশরীয়দের ধর্ম বিশ্বাস

সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানবসভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে। তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, সূর্যদেবতা 'রে' বা 'আমন রে' এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীলনদের দেবতা 'ওসিরিস' মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন। তবে তাদের জীবনে সূর্যদেবতা 'রে'-এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

পিরামিড

মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মৃতদেহ সংরক্ষণ করত। এই পদ্ধতিকে বলা হয় মমি। এই চিন্তা থেকে মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। ফারাওরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করতেন। তাঁরা ছিলেন প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতদেরও তাঁরা নিয়োগ করতেন।

শিল্প

মিশরের চিত্রশিল্পও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। মিশরীয়দের চিত্রকলা বিশেষভাবে বৈচিত্রপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। মিশরের চিত্রশিল্পের সূচনা হয় সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে। তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা-কালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনী ফুটে উঠেছে।

কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রূপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলঙ্কার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারু শিল্পের অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

প্রাচীন মিশরীয় শিল্পকর্ম স্ফিংকস

ভাস্কর্য

প্রাচীন বিশ্বসভ্যতায় মিশরীয়দের মতো ভাস্কর্য শিল্পে-অসাধারণ প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য, মানুষ অথবা জীবজন্তু সবই ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতদার্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। প্রতিটি শিল্পই আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গির্জার অতুলনীয় স্ফিংকস। স্ফিংকস হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহটা সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

লিখনপদ্ধতি ও কাগজ আবিষ্কার

মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফিক' বা পবিত্র অক্ষর। মিশরীয়রা নলখাগড়া জাতীয় গাছের মন্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। পরে এই কাগজের উপর তারা লিখতে শুরু করে। গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। যে শব্দ থেকে ইংরেজি 'পেপার' শব্দের উৎপত্তি। এখানে উল্লেখ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিষ্কৃত হয়, যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। এতে গ্রিক এবং 'হায়ারোগ্লিফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল; যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়।

লিখন পদ্ধতি বা হায়ারোগ্লিফিক

বিজ্ঞান

মিশরীয় সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। সে কারণে নীল নদের প্লাবন, নাব্যতা, পানি প্রবাহের মাপ জোয়ারভাটা ইত্যাদি ছাড়াও জমির মাপ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এসবের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অংক শাস্ত্রের ছিল গভীর যোগাযোগ। ফলে এ দুটি বিদ্যা তারা আয়ত্ত করেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। তারা অংক শাস্ত্রের দুটি শাখা– জ্যামিতি এবং পাটিগণিতেরও প্রচলন করে। মিশরীয় সভ্যতার মানুষ যোগ, বিয়োগ ও ভাগের ব্যবহার জানত। খ্রিস্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে তারা পৃথিবীতে প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। ৩৬৫ দিনে বছর এ হিসাবের আবিষ্কারকও তারা। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য সূর্য ঘড়ি, ছায়াঘড়ি, জলঘড়ি আবিষ্কার করে। ধর্মের কারণে মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন মিশরীয়রা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল। তারা চোখ, দাঁত, পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিদ্যাও তাদের জানা ছিল। তারা হাড় জোড়া লাগানো, হৃৎপিন্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত। চিকিৎসা শাস্ত্রে মিশরীয়রাই সর্বপ্রথম 'মেটেরিয়া মেডিকা' বা ঔষুধের তালিকা প্রণয়নে সক্ষম হয়।

মিশরীয়রা দর্শন, সাহিত্য চর্চাও করত। তাদের রচনায় দুঃখ হতাশার কোন প্রকাশ ছিল না। তারা আশাবাদী ছিল। তাদের লেখায় সব সময়ই আনন্দের প্রকাশ দেখা গেছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মানব সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদানের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন মিশরীয়রা মানব সভ্যতার ইতিহাসে গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতি তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে তাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা যায়। চিত্রকলায় আছে বিশেষ বৈচিত্রপূর্ণ অবদান। লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন, সেচ ব্যবস্থা চালু, চিকিৎসা শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র অংক শাস্ত্রসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। যে কারণে মানব জাতি এখনও মিশরীয়দের কাছে ঋণী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মিশরীয়রা ব্যঞ্জনবর্ণের কয়টি বর্ণ আবিষ্কার করে?
(ক) ১১ টি (খ) ৩৯ টি
(গ) ২৪ টি (ঘ) ২৩ টি

২। হায়ারোগ্লিফিক কী?
(ক) মিশরীয় চিত্র লিপি (খ) চীনের লিপি
(গ) গ্রিক লিপি (ঘ) রোমান লিপি

৩। মিশরীয়রা মৃতদেহ মমি করে রাখত কেন? (অনুধাবণ)
(ক) দেহকে জীবিত করার জন্য (খ) দেহকে কবর দেওয়ার জন্য
(গ) দেহ সৎকারের জন্য (ঘ) দেহকে তাজা রাখার জন্য

৪। মিশরের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হয়ে ওঠে–
i) বন্যায় বাঁধ দিয়ে ফসল রক্ষা করার মাধ্যমে ii) শুষ্ক মৌসুমে খাল কেটে সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলায়
iii) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i ও iii

পাঠ-২.২ মেসোপটেমীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাগুলোর নাম বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নগর সভ্যতা, সেচ ব্যবস্থা, উর্বরভূমি, বেদুইন, মন্দির, আইনের শাসন, মরুভূমি।

মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান

খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ অব্দে মিশরে যখন নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেই সময় আরো কিছু নগর সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই নগর সভ্যতাগুলোর আলাদা আলাদা নাম থাকলেও, একই ভূখণ্ডে গড়ে ওঠার কারণে এদেরকে একত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলা হয়। বর্তমান ইরাক রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যেই প্রাচীন মেসোপটেমীয়া অঞ্চল অবস্থিত।

মেসোপটেমীয়া একটি গ্রিক শব্দ। যার অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। মেসোপটেমীয়া বলতে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস (দজলা-ফোরাত) এই দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বোঝায়। এই উর্বর ভূখণ্ডের উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, পশ্চিম ও দক্ষিণে আরব মরুভূমি; দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর, পূর্বে এলাম পার্বত্যাঞ্চল এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত।

মেসোপটেমীয়ার অর্ন্তভুক্ত সভ্যতাসমূহ

প্রাচীন মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যেমন: সুমেরীয়, ব্যবিলনীয়, এ্যাসিরীয়, ক্যালডীয় ও আক্কাদীয় সভ্যতা।

নগর সভ্যতার উত্থান

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫,৫০০ অব্দে দক্ষিণ মেসোপটেমীয়ার অধিবাসীরা ইউফ্রেতিস নদীর পানির প্রবাহ পরিবর্তন করে এবং পানি সেচের ব্যবস্থা করতে শেখে। মেসোপটেমীয়ায় কৃষি কাজের জন্য এ ধরনের সেচ ব্যবস্থার খুবই দরকার ছিল। কারণ এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত খুবই কম হতো। আস্তে আস্তে ঐ অঞ্চলবাসীরা বুঝতে পারে যে, বৃষ্টির পানির চেয়ে, সেচের পানি চাষের জন্য বেশি উপযোগী এবং উপকারী। এতে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে প্রচুর ফসল ফলতে থাকে। ফলে কিছু মানুষের হাতে অতিরিক্ত সম্পদ জমা হতে থাকে। পরবর্তীকালে এরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং শাসক বা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার করেই নগরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান এবং কাঠামোর ভিত গড়ে উঠতে থাকে।

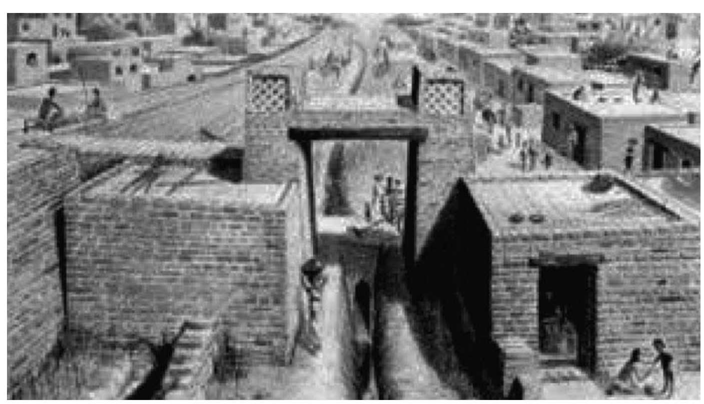

মেসোপটেমীয় সভ্যতার নিদর্শন

মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য

উর্বর ভূমি হওয়ার কারণে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির কাছে বসবাসের জন্য মেসোপটেমীয়া ছিল আকর্ষণীয় ভূ-খণ্ড। তাছাড়া ভৌগোলিকভাবে অরক্ষিত হওয়ার কারণেও বিদেশীদের আগমন এবং আক্রমণ দুইই ছিল সহজ ব্যাপার। ফলে বিভিন্ন গোষ্ঠির মানুষ মেসোপটেমীয়ার উর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেছে। আবার দক্ষিণে অবস্থিত আরব মরুভূমি থেকে মরু বেদুইনরাও মেসোপটেমীয়া আক্রমণের চেষ্টা করেছে। মেসোপটেমীয়া মিশরের মতো কোনো একজন রাজার শাসনাধীনে ছিল না। মন্দিরের প্রাচুর্য ও অবস্থান দেখে ধারণা করা হয় যে, এই অঞ্চলের মানুষ মন্দিরের বেধে দেয়া নিয়ম ও শাসন মেনে চলতে বাধ্য থাকতো। তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হতো মন্দিরের নির্দেশ মতো। এ কারণে দেখা যায় যে, মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনায় পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল প্রধান। মেসোপটেমীয়ায় আইনের শাসন যেমন ছিল কঠোর, শাস্তির বিধানও ছিল তেমন কঠিন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	মেসোপটেমীয় সভ্যতা সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন লিখুন।

সারসংক্ষেপ

মেসোপটেমীয় সভ্যতার জন্ম টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস দুই নদীর মধ্যবর্তী উর্বর সমতল অঞ্চলে। এই অঞ্চল আরো পাঁচটি সভ্যতার জন্মস্থান। যে সভ্যতাগুলো বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানামুখি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বর্তমান কোন রাষ্ট্রের সীমানায় মেসোপটেমীয়া অঞ্চল অবস্থিত ছিল?
(ক) মিশর (খ) সিরিয়া
(গ) ইরাক (ঘ) ইরান

২। মেসোপটেমীয়া কোন ভাষার শব্দ?
(ক) গ্রিক (খ) চাইনিজ
(গ) সংস্কৃত (ঘ) আরবি

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন–

ক নামক দেশটি কোন একক রাজার শাসনাধীন ছিল না। বিদেশীরা প্রায়ই আক্রমণ করতো এবং দেশটিতে প্রবেশ করতো। উপরন্তু সেখানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেধে দেওয়া নিয়ম মেনে চলতে সকলে বাধ্য ছিল।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত অবস্থায় কোন সভ্যতার চিত্র ফুটে উঠেছে?
(ক) রোমান (খ) গ্রিক
(গ) মেসোপটেমীয় (ঘ) মিশরীয়

৪। উক্ত সভ্যতায় কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেধে দেওয়া নিয়ম মানতে হতো?
(ক) মন্দির (খ) মসজিদ
(গ) গীর্জা (ঘ) প্যাগোডা

পাঠ-২.৩ সিন্ধু সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল বলতে পারবেন;
- মানব সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গনে সিন্ধু সভ্যতার অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হরপ্পা সংস্কৃতি, প্রত্নতত্ত্ববিদ, আর্যজাতি, নগরদুর্গ, মাতৃতান্ত্রিক, মাতৃপূজা, পোড়ামাটি।

পটভূমি

সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারোতে এবং দয়ারাম সাহানীর চেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারী জেলার হরপ্পায় এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরো বহু নিদর্শন আবিষ্কার করে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা উভয় অঞ্চল একই সভ্যতার অন্তর্গত। সিন্ধু সভ্যতা উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা।

ভৌগোলিক অবস্থান

উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা হলেও এর বিস্তৃতি ছিল বিশাল এলাকা জুড়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে এই সভ্যতার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই সভ্যতা শুধু সিন্ধু নদীর অববাহিকা বা ঐ দুটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

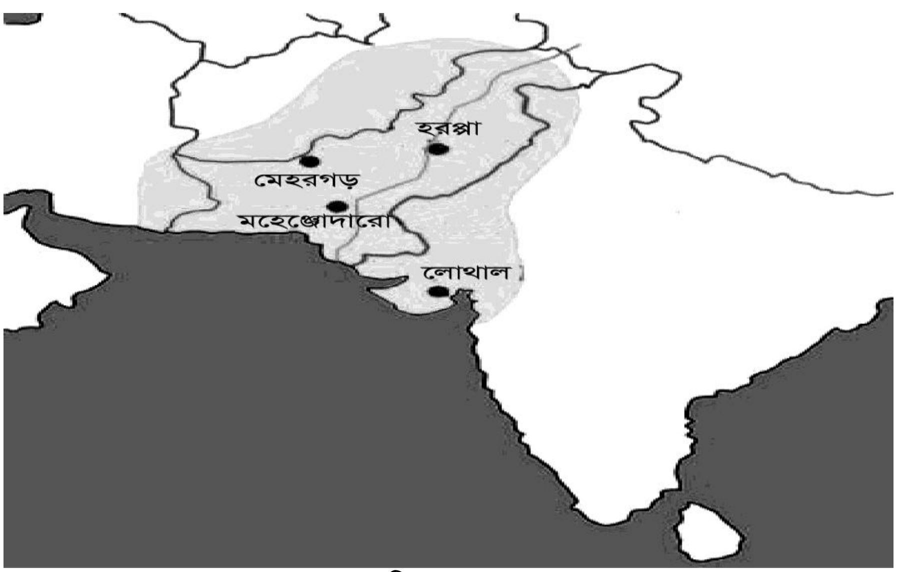

সিন্ধু সভ্যতা

সময়কাল

সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। পণ্ডিতদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতার উত্থান-পতনের কাল। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, আর্য জাতির আক্রমণের ফলে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অথবা ১৪০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার অবসান ঘটে। তবে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। এই সভ্যতার সময়কাল মর্টিমার হুইলারের মতে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রিস্টপর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত।

রাজনৈতিক ও সামজিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার জনগণের রাজনৈতিক জীবন ও শাসন প্রণালি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শহরের এক পাশে উঁচু ভিত্তির উপর নির্মিত নগর দুর্গগুলো দেখে মনে হয় নগরের শাসনকর্তারা নগর দুর্গে বসবাস করতো। চারদিক প্রাচীর দিয়ে সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে প্রশাসনিক বাড়িঘরের অবস্থাও দেখা যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো দুই নগরের নগর পরিকল্পনা ছিল প্রায় এক। নগরের ছিল প্রবেশদ্বার। দুর্গ বা বিরাট অট্টালিকা দেখে মনে হয় একই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে নগর দুটিতে প্রচলিত ছিল। এই প্রশাসন জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত।

সিন্ধু সভ্যতার যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ পরিবেশে বসবাস করত। সেখানে একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল। সব লোক সমান সুযোগ সুবিধা পেত না। সমাজ ধনি ও দরিদ্র দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কৃষকেরা গ্রামে বসবাস করত। শহরে ধনি এবং শ্রমিকদের জন্য আলাদা আলাদা বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তারা মূলত সুতা ও পশম ব্যবহার করত। সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মহিলারা খুবই সৌখিন ছিল। তাদের প্রিয় অলংকারের মধ্যে ছিল হার, বালা, আংটি, দুল, বিছা, বাজুবন্দ, চুড়ি, পায়ের মল ইত্যাদি। তারা নকশা করা দীর্ঘ পোশাক পরত। সমাজে পুরুষরাও অলংকার ব্যবহার করত।

অর্থনৈতিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। তাছাড়া অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন ও বাণিজ্য। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলংকার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্প পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সিন্ধু সভ্যতার বণিকরা বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। বণিকদের সাথে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতায় কোনো মন্দির বা মঠের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়নি। তবে, তাদের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মন্দির, উপাসনা গৃহের অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন স্থানে পোড়ামাটির অসংখ্য নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়, তারা ঐ ধরনের দেবীমূর্তির পূজা করত। সিন্ধুবাসীদের মধ্যে মাতৃপূজা খুব জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা দেব-দেবী মনে করে বৃক্ষ, পাথর, সাপ এবং পশুপাখির উপাসনাও করত। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত। যে কারণে মৃতের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলংকার তার কবরে রেখে দিত।

নগর পরিকল্পনা

সভ্যতার ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা একটি পরিকল্পিত নগরীর ধারণা দিয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগর দুটো প্রায় একই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছিল। সিন্ধু সভ্যতায় অবস্থিত এই বড় নগর দুটো ছাড়াও অন্যান্য সব শহরের ঘরবাড়ি সবই পোড়া মাটি বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজে বোঝা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতায় অভ্যস্ত ছিল। নগরির ভিতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। পানি নিষ্কাশনের জন্য ছোট ছোট নর্দমাগুলো মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য শহরগুলোতে মোতায়েন থাকত। এক বাক্যে বলা যায়, সিন্ধু সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার মতো উন্নত ছিল।

পরিমাপ পদ্ধতি

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত। দাগ কাটা স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল।

শিল্প

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মৃৎশিল্পের কথা বলতে হয়। তারা কুমারের চাকার ব্যবহার জানত এবং তার সাহায্যে সুন্দর মাটির পাত্র বানাতে পারত। পাত্রগুলোর গায়ে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা থাকত। তাঁতিরা বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল। ধাতুর সাহায্যে আসবাবপত্র, অস্ত্র এবং অলংকার তৈরি করা হতো। তারা তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল। কারিগররা রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির তৈজসপত্র তৈরি করত। তাছাড়া সোনা, রূপা, তামা ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর অলংকার তৈরিতে তারা পারদর্শী ছিল। অলংকারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্দ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা লোহার ব্যবহার জানত না। ধাতু ছাড়া দামি পাথরের সাহায্যে অলংকার নির্মাণ শিল্পেরও বিকাশ ঘটে এবং হাতির দাঁতসহ অন্যান্য হস্তশিল্পেরও দক্ষ কারিগর ছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখে গেছে। সেখানে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধানও পাওয়া গেছে। আবার কোথাও দুই তিন তলার ঘরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিলনায়তন' যে মিলনায়তনটির ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিরাট এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে বিরাট আকারের শস্যাগারও পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে একটি 'বৃহৎ স্নানাগার'-এর নিদর্শন পাওয়া গেছে, যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চাটি ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী।

বৃহৎ স্নানাগার

ভাস্কর্য শিল্পেও সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের দক্ষতা ছিল। পাথরে খোদিত ভাস্কর্যের সংখ্যা কম হলেও সেগুলোর শৈল্পিক কারিগরি দক্ষতা ছিল উল্লেখ করার মতো। এ যুগে মোট ১৩টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। চুনাপাথরের তৈরি একটি মূর্তির মাথা পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে নৃত্যরত একটি নারী মূর্তি। এছাড়া মাটির তৈরি ছোট ছোট মানুষ আর পশুমূর্তিও পাওয়া গেছে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫০০ সিল। ধর্মীয় ও ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হতো। তবে সিলগুলোর লেখা এখনও পড়ে তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। এ থেকে ধারণা করা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিরা লেখা পড়া জানতো।

সীল মোহর

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১. ভারত পাকিস্তানের যেসব অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার দেশ ভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত করুন। ২. সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসিদের কোন কোন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল?

সারসংক্ষেপ

সিন্ধু নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সিন্ধু সভ্যতার মূল অঞ্চল পাঞ্জাবের হরপ্পা এবং সিন্ধুর মহেঞ্জোদারো হলেও এর নিদর্শন পাওয়া গেছে পাকিস্তান ভারতের আরো কিছু কিছু অঞ্চলে। সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর হলেও, এরা আধুনিক কালের মতো উন্নততর নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। তবে এরা লোহার ব্যবহার জানত না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সিন্ধু সভ্যতায় সমাজ কয়টি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল? (জ্ঞান)
(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২। সিন্ধু সভ্যতার রাস্তাগুলো কেমন ছিল? (অনুধাবন)
(ক) সরু (খ) চওড়া
(গ) সোজা (ঘ) আঁকাবাঁকা

৩। Y সভ্যতার অধিবাসিরা লোহার ব্যবহার জানত না। Y সভ্যতার সাথে কোন সভ্যতার মিল লক্ষণীয়–
(ক) মেসোপটেমীয় (খ) সিন্ধু
(গ) গ্রিক (ঘ) মিশরীয়

৪। মর্টিমার হুইলারের মতে সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল কোনটি? (অনুধাবন)
(ক) খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দ (খ) খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দ
(গ) খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ থেকে ১৪০০ অব্দ (ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ১৩০০ অব্দ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাসাইল গ্রামের জোতদার লেবু মিয়া তার বাড়ির আঙিনায় গোসলের জন্য কুয়া খনন করে চারদিকটা ইট দিয়ে পাকা করে দেন। একই সাথে ধান মাপার জন্য বিশেষ ধরনের ওজন মাপার পাথর তৈরি করে দিয়েছিলেন। এতে ফসলের ওজন করা হয়েছিল সহজ, অপরদিকে আধুনিক জীবনের সন্ধানও তিনি দিয়েছিলেন।
ক. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম কী?
খ. সিন্ধু সভ্যতাকে নগর সভ্যতা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে লেবু মিয়ার তৈরি ব্যবস্থা পাঠ্য বইয়ের কোন সভ্যতার তৈরি ব্যবস্থার সাথে মিল দেখা যায়? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. 'উক্ত সভ্যতার অধিবাসীরা পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক' যাতে আধুনিকতার স্পর্শ রয়েছে – আপনি কী একমত? মতামত দিন।

পাঠ-২.৪ চিন সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- চিন সভ্যতার পরিচয় ও অবস্থানের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- চিনের আদি মানুষ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শাং রাজাদের যুগের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সভ্যতায় চৌ-যুগের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রাগৈতিহাসিক, পিকিং মানুষ, নবোপলীয়যুগ, আইডিও গ্রাফ, লৌহযুগ, এ্যানিমেল ম্যান, মহাপ্রাচীর,

চিনা সভ্যতার পরিচয় ও অবস্থান

চিনের প্রাচীন সভ্যতা একমাত্র সভ্যতা যা কোনো সময় পুরোপুরি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে আজ পর্যন্ত চিন তার সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। এককথায় চিনা সভ্যতা পৃথিবীতে বিরাজমান সবচেয়ে পুরাতন সভ্যতা। ভৌগোলিক কারণে বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ না থাকায় এ অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নিজস্ব নিয়মে, ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে। চিন পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র। দেশটির তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। একটি হোয়াং হো নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াং জেকিয়াং নদীর তীরে, তৃতীয়টি দক্ষিণ চিনের ভূখণ্ডে। এই সভ্যতা সৃষ্টি হয়েছিল- শাং ও চৌ রাজাদের আমলে।

দেশটির সীমান্ত জুড়ে বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকার কারণে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ ছিল না। চীনের উত্তর দিকে গোবি মরুভূমি, পূর্ব ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে রয়েছে তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল। নদীগুলোর প্রভাবে প্রাচীন চিনে কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। যে কারণে অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা সহজ ছিল। ধারণা করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে চিনের প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল।

চিনের আদি মানুষ

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে চিনে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে। চিনের রাজধানী পিকিং-এর (বর্তমান বেইজিং) কাছে এই খুলি পাওয়া যায়। এরাই চিনের আদিম মানুষ; যাদেরকে 'পিকিং মানুষ' বলা হয়। এ থেকে ধারণা করা হয় যে নবোপলীয় যুগ বা নতুন পাথরের যুগে চীনে মানুষের বসবাস ছিল। চিনের আদিবাসিরা হোয়াং-হো ও ইয়াংসি নদীর দুই পাড়েই বাস করত। পরে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এদের এক অংশ চাষাবাদ করতো, অপর অংশটি যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত ছিল। যে অংশটি নদীর তীরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে তারা ঘরবাড়ি তৈরি করে ধীরে ধীরে সভ্য জাতিতে পরিণত হতে থাকে। এরা কৃষিকাজের পাশাপাশি পশু পালনও করতো। এরাই প্রাচীন চীনা সভ্যতার স্রষ্টা। এই সভ্যতার স্রষ্টাদের রেশমের কাপড়, চাকাযুক্ত গাড়ি, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করার বিদ্যা জানা ছিল। তারা কৃষি কাজের জন্য লাঙ্গল ব্যবহার করত। কৃষি জমিতে পানি সেচের জন্য তারা খাল কেটে নদী থেকে জমিতে পানি সরবরাহ করত। চীনের আদি মানুষরা নগর নির্মাণ করে উঁচু দেয়াল দিয়ে তাকে সুরক্ষিত রাখত, যাতে যাযাবরদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এরা এক ধরণের দিনপঞ্জি বা ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছিল।

শাং রাজাদের যুগ (১৭৬৬-১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

ধারণা করা হয় প্রায় চার হাজার বছর আগে চিনে নগর সভ্যতা গড়ে উঠে ছিল। হুয়াংতি নামের একজন শক্তিশালী শাসক হোয়াংহো নদীর তীরে এক বড় রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এই হোয়াংহো নদী তীরেই শাং রাজারা যে সভ্যতা গড়ে তোলেন, তা অগ্রগতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। বেশ কয়েকটি রাজবংশ চিনের সভ্যতা গড়ে তুলে ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো

ছিল শাং বংশ। শাং রাজাদের যুগে ব্রোঞ্জের জিনিস পত্রের বেশি ব্যবহার হতো বলে এ যুগের সংস্কৃতি ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

সভ্যতায় শাংযুগের অবদান

শাংযুগের মানুষের মানব সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো−

অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাসস্থান

শাংযুগে অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। ফসলের মধ্যে গম, যবই বেশি চাষ হতো। কিছু কিছু জমিতে ধানেরও চাষ হতো। এ যুগের মানুষের মধ্যে পশু পালনের ব্যাপক প্রচলন ছিল। গ্রামের মানুষরা মাটির ঘরে বাস করত। প্রত্যেক পরিবারের ঘরের ছাদকে নলখাগড়ার ওপর কাদার আবরণ দিয়ে ছাওয়া হতো। সে সময়ে বেশিরভাগ মানুষ গ্রামে বসবাস করত। শহরের ঘরবাড়ি ছিল চমৎকার। ঘরগুলো হতো আয়তকার। ঘরের ছাদগুলো ছিল ত্রিকোণ আকৃতির। শাং সমাজে কারিগর বা শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। সাধারণ জনগণ অর্থাৎ ভূমিদাস এবং দাসেরা সমাজের সব অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্পাদন করত। এদের বেশিরভাগ ছিল কৃষক। কৃষি কাজের ফাঁকে ফাঁকে এরা গুটিপোকার চাষ করত। এই গুটি পোকা থেকে সূতা বের করে মসৃণ কাপড় বোনা হতো। পরবর্তিকালের সম্রাটদের সময়ে এই মসৃণ সিল্ক চিনের একটি প্রধান রপ্তানিযোগ্য পণ্যে পরিণত হয়।

ক্ষুদ্রশিল্প

বিভিন্ন সুন্দর জিনিস তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। শাং যুগের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ব্রোঞ্জের তৈরি পাত্র, ছুরি, কুঠার ইত্যাদি। শাং যুগের কারিগররা হাড়, ঝিনুক, শিং এসব দিয়েও সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করতে পারতো। তারা হাতির দাঁত দিয়ে বিলাসী দ্রব্য তৈরিতে দক্ষ ছিল। শাং যুগের নানা ধরনের মাটির পাত্র, চীনের বিখ্যাত চিনামাটির পাত্রের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। তাছাড়া তীর, ধনুক, চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি, যোদ্ধাদের জন্য তৈরি চামড়ার বর্ম, অস্ত্র-শস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র, মুখোশ প্রভৃতি তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

লিখন পদ্ধতি

চিনে ভিন্ন ধরনের একটি লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। এই লিখন পদ্ধতিকে বলা হয় আইডিও গ্রাফ। এ লেখা গুলো দেখতে অনেকটা চিত্র লিপির মতো ছিল। লেখার জন্য তৈরি হয় কালি আর তুলি। শাং লিপিকাররা রেশমি কাপড়ের উপর লিখতেন। এ লেখার পদ্ধতি উদ্ভবের পেছনে কারণ ছিল রাজার আদেশ ও পুরোহিতের বাণী প্রচার।

ধর্মীয় ক্ষেত্র

রাজকার্য ছাড়াও ধর্মীয় বিষয়ে শাংরাজাদের ভূমিকা ছিল প্রধান। রাজার নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। শাং যুগের প্রধান দেবতার নাম ছিল শাংতি। মৃত রাজাকেও কখনও কখনও পূজা করা হতো। তাই রাজার সমাধিসৌধ বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি দিয়ে সাজিয়ে রাখা হতো। শাং যুগের মানুষ মাটি, বাতাস, নদী, বিভিন্ন দিক (পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ) এবং প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মনে করতো।

চৌ রাজাদের যুগ (১০২৭-২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

শাং রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে চৌ রাজ্য গড়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে চৌ রাজারা ছিলেন শাংদের অধীনস্থ মিত্র। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব এগারো শতকে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত চৌরা শাং রাজবংশকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে।

সভ্যতায় চৌযুগের অবদান

চৌ রাজারা যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ক্ষমতা দখল করে প্রায় ৮০০ বছর গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করে। সে সময়ের মধ্যে তারা চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সাফল্যের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মানব সভ্যতায় তাদের অবদান নিম্নে উল্লেখ করা হলো−

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক

পেশার দিক থেকে প্রথম থেকেই চৌ বংশের লোকেরা ছিল কৃষক। তাদের শাসন কালেও তাদের অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। তারা খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছিল। চৌ-রা কৃষি কাজে পশু ব্যবহার করত। চৌ শাসন আমলে চীনের সভ্যতা নতুন পাথরে যুগ থেকে লৌহ যুগে প্রবেশ করে। তারা লোহার ব্যবহার শেখে। লোহার ফলাযুক্ত লাঙ্গল ব্যবহারের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। এ কারণে সে সময় প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো।

চৌ-জাতিরা ব্যবসায়-বাণিজ্যের সঙ্গেও যুক্ত ছিল। এরা বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে বড় বড় শহর গড়ে তোলে। শহরের বাসিন্দাদের জন্য খাদ্য এবং মালপত্র বহনের লক্ষ্যে যে সমস্ত রাস্তা নির্মাণ ও খাল খনন করা হয় তা ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করে। এসময় চীনা বণিকদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ হয়। বণিকরা গাধা, উটের সাহায্যে মালামাল পরিবহণ করতো। শস্য, লবণ, রেশম ইত্যাদি দ্রব্য দেশের বাইরে রপ্তানি করা হতো। তাছাড়া ধাতব মুদ্রা চালু হওয়ার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য আরো সম্প্রসারিত হয়।

সামাজিক কাঠামো

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো চৈনিক সভ্যতায়ও সামাজিক বৈষম্য ছিল। সমাজে অনেক দাস ছিল। তাদের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। সরকারিভাবে গবাদি পশু আর দাসদের একই তালিকায় রাখা হতো। চীনা পরিভাষায় এদের 'এ্যানিমেল ম্যান' বলা হতো।

সাধারণ কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থান ছিল সমাজে সবেচেয়ে নিচু স্তরে। ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে ব্যবধান ছিল আকাশ-পাতাল। সমাজ ছিল সম্পূর্ণভাবে অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থাকায় মেয়েদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান

চৌ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। এযুগের লেখা অনেক গ্রন্থ পাওয়া গেছে। চৌ আমলে হাতের লেখার প্রচলন বৃদ্ধি পায় এবং এ সময় নথিপত্র সংরক্ষণের কাজ ব্যাপকতা লাভ করে। চৌ যুগের শেষ দিকে ইতিহাস, সংগীত, আচার-অনুষ্ঠান, তোরণ নির্মাণ, কবিতা সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বহু বই পুস্তক লেখা হয়।

ধর্ম

চৌ যুগের লোকেরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করতো। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল তিয়েন। মাটিকে মনে করা হতো কৃষির দেবতা। চৌ যুগেও পূর্ব পুরুষের পূজার প্রচলন ছিল। এ যুগেই চিনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।

চিনের প্রাচীর

চিনের মহা প্রাচীর নির্মিত হয় চৌ-রাজ বংশের আমলে। রাজা শি-হুয়াং তি এই প্রাচীর তৈরি করেন। হুনদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল এখন তা বিশ্বের আশ্চর্য বস্তুর একটি। দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ এই প্রাচীরের উচ্চতা গড়ে ২৪ ফুট। এই প্রাচীরের উপর দিয়ে ৬ জন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলতে পারতো।

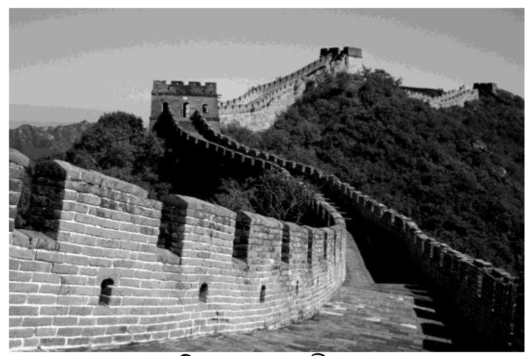

চিনের মহাপ্রাচীর

দর্শনের ক্ষেত্রে অবদান

দর্শন বিদ্যায় চিন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। চৌ-রাজাদের আমলে একটি শিক্ষিত নতুন সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। দার্শনিকরা ছিল এই শ্রেণিভুক্ত। চিনের প্রাচীন দার্শনিক ছিলেন লাওৎসে (খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪-৫১৭) তার চিন্তা চিনা জীবন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে এবং অব্যাহতভাবে প্রভাবিত করে রেখে ছিল। তিনি বিশ্বসভ্যতায় এক অবিস্মরণীয় মানবতাবাদী দর্শন উপহার দেন। কনফুসিয়াসের সময় চিনের সমাজ জীবন খুব উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তিনি চিনের যুবকদের শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিয়ে আনা এবং তাদের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য দর্শনের একটির স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। কনফুসিয়াসের দর্শন খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে চিনে ধর্মে পরিণত হয়। কোরিয়া, জাপান, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশেও তাঁর দার্শনিক চিন্তা গভীর প্রভাব বিস্তার করে। চিনের অন্যান্য খ্যতনামা দার্শনিকদের মধ্যে ছিলেন জেনসিয়াস ও মোতি।

কনফুসিয়াস

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	১. 'পিকিং মানুষ' কী? কী করে এরা সভ্যজাতিতে পরিণত হয়? লিখে দেখান। ২. কী কী বিষয় চীনা সভ্যতাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়েছে? একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

চিন সভ্যতা অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। শাং এবং চৌদের আমলে চিনের সমাজ-অর্থনীতি-সভ্যতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। কৃষি ক্ষেত্রে লাঙ্গলে লোহার ফলা ব্যবহার, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি এবং বাণিজ্য ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে অর্থনীতি এবং সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। প্রকৃতি পূজা থেকে তারা ধর্মীয় মতবাদে বিশ্বাসী হয়। কনফুসিয়াসের দর্শন ধর্মীয় মতবাদে পরিণত হয়। ঐ সময় বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে। চিনা সিল্ক, চিনা মাটির পাত্র, চিনের মহাপ্রাচীর সব কিছু চিনা সভ্যতাকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই?

ক) গ্রিক　　খ) মিশরীয়

গ) সিন্ধু　　ঘ) চিন

২। চিনে প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো–

ক) জমিতে সার প্রয়োগ করে　　খ) ট্রাক্টর ব্যবহার করে

গ) লোহার ফলাযুক্ত লাঙল ব্যবহার করে　　ঘ) বাধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে

৩। চিনে সিল্ক কেন রপ্তানিযোগ্য পণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়?

i) গুটি পোকার সূতা থেকে মসৃণ কাপড় তৈরির কারণে

ii) রেশমী সূতা তৈরির মাধ্যমে

iii) উন্নত ডিজাইন ব্যবহার করে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i　　খ) ii

গ) i ও ii　　ঘ) i ও iii

৪। চিনা যুবকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কনফুসিয়াস কী প্রতিষ্ঠা করেন?

ক) ব্যায়ামাগার　　খ) অস্ত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

গ) দর্শনের বিদ্যালয়　　ঘ) বিজ্ঞান গবেষণাগার

৫। "এ্যানিমেল ম্যান" কাদের বলা হতো?

ক) কৃষকদের　　খ) দাসদের

গ) বণিকদের　　ঘ) তাঁতীদের

পাঠ-২.৫ গ্রিক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- সভ্যতায় গ্রিসের অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মহাকাব্য, হেলাস, হেলেনীয় সংস্কৃতি, নগররাষ্ট্র, দাস, সফিস্ট, পৃথিবীর মানচিত্র, বাদ্যযন্ত্র, অলিম্পিক ক্রিড়া

মহাকবি হোমার

পটভূমি: গ্রিসের মহাকবি হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের। উনিশ শতকের শেষে হোমারের কাহিনী আর কবিতায় সীমাবদ্ধ থাকে না, বেরিয়ে আসে এর ভিতরের সত্য ইতিহাস। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কৃত হয় এক উন্নততর প্রাচীন নগর সভ্যতা। সন্ধান মেলে মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশত নগরীর ধ্বংস স্তুপের। ইউরোপ মহাদেশের এই অঞ্চলেই প্রথম সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

ভৌগোলিক অবস্থা ও সময়কাল

গ্রিস দেশটি আড্রিয়াটিক সাগর, ভূ-মধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইউরোপের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বলকান উপদ্বীপ। এর দক্ষিণাংশে একটি ছোট পাহাড়ি দেশ গ্রিস। গ্রিস মূলত একটি পর্বতময় দ্বীপ রাষ্ট্র। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০-১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক সভ্যতার সূচনা হয় যার পূর্ণ বিকাশ ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৫ম শতকে। গ্রিকরা ৩৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

সভ্যতায় গ্রিসের অবদান

গ্রিসের পূর্ব নাম ছিল হেলাস। রোমানরা পরবর্তিকালে এর নামকরণ করে গ্রিস। গ্রিক সংস্কৃতি হেলেনীয় সংস্কৃতি নামে বেশি পরিচিত। অসংখ্য নগররাষ্ট্র নিয়ে গড়ে উঠা প্রাচীন গ্রিসে সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা এবং গণতন্ত্র চর্চার মূল কেন্দ্র ছিল এথেন্স। নিম্নে প্রাচীন সভ্যতায় গ্রিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

শিক্ষা: শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয়া। স্বাধীন গ্রিসবাসির ছেলেরা সাত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া আসা করত। ধনি ব্যক্তিদের ছেলেদের ১৮ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো। কারিগর আর কৃষকের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত। মেয়েরা কোনো প্রতিষ্ঠানে যেয়ে লেখাপড়া করতে পারত না। দাসদের সন্তানের জন্যও বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। শিক্ষা সম্পর্কে গ্রিক জ্ঞানী-গুণিরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তাদের কারো কারো মতে নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া উচিত। আবার কেউ কেউ মনে করতেন– সুশিক্ষিত নাগরিকের হাতেই শাসনভার দেওয়া উচিত এবং সরকারের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুযায়ি শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা উচিত।

সাহিত্য: সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানব সমাজের মূল্যবান সম্পদ। হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়ড' এবং 'ওডিসি' মহাকাব্যের অপূর্ব নিদর্শন। সাহিত্যে ক্ষেত্রে গ্রিক প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। বিয়োগান্তক নাটক রচনায় গ্রিকরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। 'এসকাইলাস'কে এই ধরনের নাটকের জনক বলা হয়। তার রচিত বিখ্যাত দুটি নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড' ও 'আগামেমন'। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তার বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রাজা 'অয়দিপাউস', 'আন্তিগোনে' ও 'ইলেকট্রা' অন্যতম। আর এক বিখ্যাত নাট্যকারের নাম ইউরিপিদিস। এরিস্টোফেনেসের মিলনান্তক ও ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইতিহাস রচনায়ও গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছে। ইতিহাস রচনা শুরুই করে গ্রিকরা। হেরোডোটাস প্রথম ইতিহাস রচনা শুরু করেন বলে তাঁকে ইতিহাসের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত ইতিহাস সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যকার যুদ্ধ নিয়ে। থুকিডাইডিস ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক। তাঁর বইটির শিরোনাম ছিল 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়ার'।

ধর্ম: গ্রিকদের বারটি দেব-দেবী ছিল। এছাড়াও তারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও বীর যোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিলেন দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা। এখনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বার

জনের মধ্যে এই চার জন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রে মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।

দর্শন: দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শন চর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্য গ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসের যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের বলা হতো সফিস্ট। এরা বিশ্বাস করতেন যে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র এথেন্সের রাজা পেরিক্লিস এদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ চিন্তার দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল- আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।

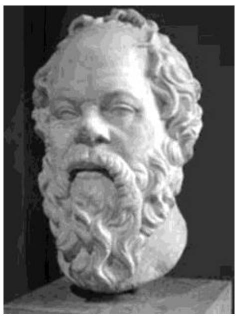
সক্রেটিস

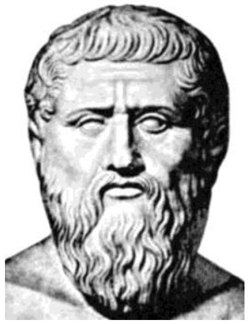
প্লেটো

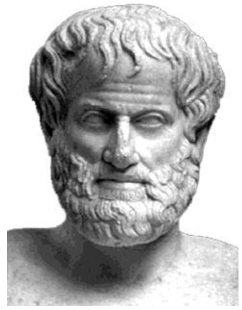
এরিস্টটল

ইউক্লিড

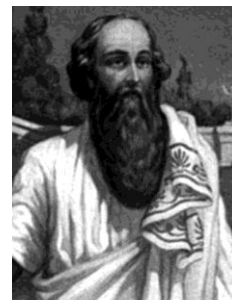
পিথাগোরস

বিজ্ঞান: গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞান চর্চা শুরু করে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অংকন করেন গ্রিক বিজ্ঞানিরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, বজ্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ক্রোধের কারণে নয় প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করেন। জ্যামিতি বিষয়ে পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য: গ্রিক শিল্পের বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গ্রিক চিত্র শিল্পের নিদর্শন মৃৎপাত্রে আঁকা চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। স্থাপত্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত। এসব প্রাসাদের স্তম্ভগুলো অপূর্ব কারুকার্যখচিত থাকত। পার্থেনন মন্দির, দেবী এথেনার মন্দির গ্রিক স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে স্থাপত্যের সুন্দর নিদর্শনের ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে। সে যুগের প্রখ্যাত ভাস্কর শিল্পী ছিলেন মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস। এদের মধ্যে খ্যাতির শীর্ষে ছিলেন ফিদিয়াস। তিনি তার অপূর্ব দক্ষতায় গড়ে তুলে ছিলেন ৭০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট দেবী এথেনার মূর্তি।
সঙ্গীত চর্চায়ও গ্রিকদের উৎসাহ ও দক্ষতার অভাব ছিল না। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে গান গাওয়ার জন্য সঙ্গীত চর্চা করতে যেয়ে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে নতুন নতুন বাধ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

খেলাধূলা: গ্রিসে শিশুদের খেলাধুলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো। বিদ্যালয়গুলো ছিল তাদের খেলাধুলা শুরুর স্থান। গ্রিকদের শরীরচর্চার প্রতিও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। উৎসবের দিনে গ্রিসে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হতো। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা। অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশ নিতো। এতে দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকা নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত। বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডাল-পাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হতো। খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে অলিম্পিক খেলা শুরু হয়। প্রতি চার বছর পর পর এ খেলায় বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিতো। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত নগর রাষ্ট্রগুলোতে তখন শান্তি বিরাজ করত। এই খেলাকে ঘিরে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শত্রুতার বদলে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠে।

অলিম্পিক খেলা

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১. গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত মণীষীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন। ২. যে দুটি মহাকাব্যের কাহিনীর কারণে গ্রিক সভ্যতার সন্ধান সে কাব্য দুটি এবং এর লেখকের নাম কি?

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক কারণে গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। এই হেলেনীয় সংস্কৃতির দাবীদাররা শুধু ইউরোপে নয়, সারা বিশ্বের দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সঙ্গীত, খেলাধূলা চর্চায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করেন কারা?
ক) মিশরীয় বিজ্ঞানীরা খ) গ্রিক বিজ্ঞানীরা গ) সিন্ধুসভ্যতার ব্যবসায়ীরা ঘ) রোমান ভূগোলবিদরা

২। এথেন্সের জনগণ–
i) সামরিক কর্মকাণ্ড দ্বারা প্রভাবিত ছিল ii) গণতান্ত্রিক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত ছিল
iii) রাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) i ও ii ঘ) i ও iii

৩। হোমারের মহাকাব্য হিসেবে সমর্থনযোগ্য (প্রয়োগমূলক)
i) দ্যা পেলোপনেসিয়ান ওয়ার ii) ইলিয়ড iii) ওডিসি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন–

জমিদার আরমান শাহ্র জমিদারিতে সমাজের ধনী ব্যক্তিদের সন্তানদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো এবং কারিগর ও কৃষকদের সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হতো। কিন্তু দাস দাসীর সন্তানদের এবং সমাজের মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারতো না।

৪। উদ্দীপকে শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা কোন সভ্যতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
ক) গ্রিক খ) মিশরীয় গ) ফিনিসীয় ঘ) সিন্ধু

৫। উক্ত সভ্যতায় কার হাতে শাসনভার অর্পণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত?
ক) ধর্মীয় গুরু/পুরোহিতের নিকট খ) দার্শনিকের হাতে
গ) সুশিক্ষিত নাগরিকের কাছে ঘ) গণিতশাস্ত্রবিদের কাছে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ ঃ ১. খ ২. খ ৩. ক ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ ঃ ১. গ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ ঃ ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ ঃ ১. ক ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. গ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও এর প্রভাব

ইউনিট ৩

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার (বার্মা)। বাকি তিন দিকের সীমানা ঘিরে আছে ভারত। অবিভক্ত বঙ্গদেশ একটি বদ্বীপ। আমরা সমগ্র বদ্বীপকে প্রধানত দুভাগে চিহ্নিত করতে পারি। প্রথমত, মৃতপ্রায় বা প্রাচীন বদ্বীপ যার অধিকাংশ পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। দ্বিতীয়ত, সক্রিয় বদ্বীপ যার প্রায় সবটাই পড়েছে পূর্ববঙ্গে বা বর্তমান বাংলাদেশে। বাংলাদেশে বদ্বীপ গঠন প্রক্রিয়া এখনও চলমান। নদীই বাংলার ইতিহাস ও সভ্যতার জন্মদাতা। বাংলাদেশের বুক জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ছোট-বড় অনেক নদ-নদী ও খাল-বিল। বাংলাদেশের প্রায় সব জনপদই সমতল। কিছু কিছু পাহাড়ি বনাঞ্চলও রয়েছে। চির সবুজে ঘেরা শস্য-শ্যামলা নাতিশীতোষ্ণ দেশটি মানুষের বসবাসের জন্যে এক চমৎকার আবাসভূমি। সামগ্রিক ভৌগোলিক প্রভাবের কারণে এদেশবাসী সাধারণত ভাবুক, শান্ত-কোমল, উদার এবং স্বাধীনচেতা। এই ইউনিটে আমরা বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, বৈশিষ্ট্য ও জনজীবনে এর প্রভাব বিষয়ে জানব।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ ঃ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি
পাঠ-৩.২ ঃ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও এর প্রভাব

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

পাঠ-৩.১ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের অবস্থান বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নদ-নদীর বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সীমারেখা, স্বাধীন সার্বভৌম, সবুজের আস্তরণ, ম্যানগ্রোভ, সমতট, ঐক্যসূত্র।

বাংলাদেশের অবস্থান ও পরিচিতি

বিশ্ব মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অবস্থান । আজকের যে বাংলাদেশ তার দক্ষিণ সীমান্তে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি। দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে মায়ানমার (বার্মা)। বাকি তিন দিকের সীমানা ঘিরে রেখেছে ভারত।

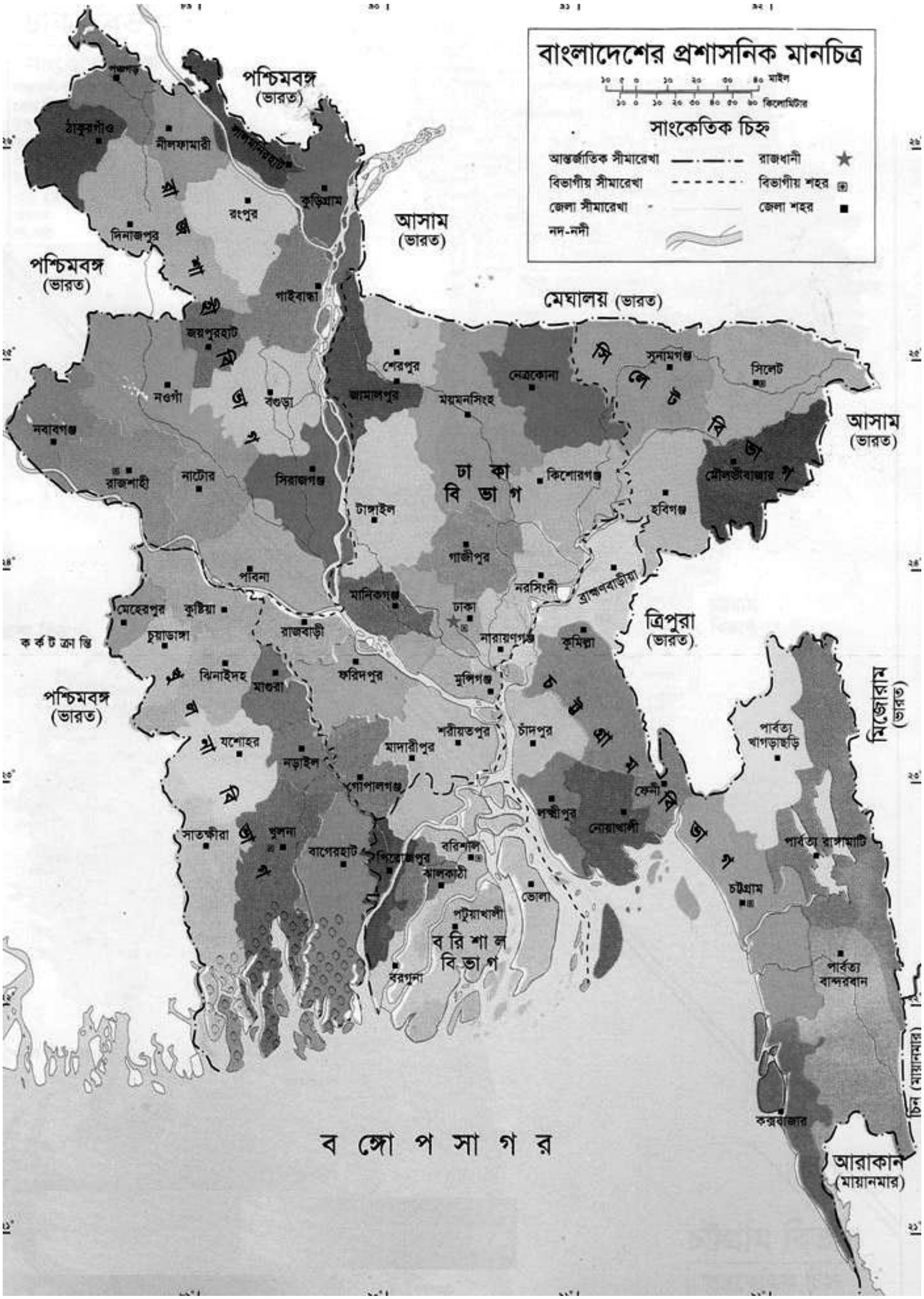

বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র
সাংকেতিক চিহ্ন
আন্তর্জাতিক সীমারেখা
বিভাগীয় সীমারেখা
জেলা সীমারেখা
নদ-নদী
রাজধানী
বিভাগীয় শহর
জেলা শহর
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
আরাকান (মায়ানমার)
চিন (মায়ানমার)
কর্কট ক্রান্তি
ব ঙ্গো প সা গ র
ঠাকুরগাঁও
নীলফামারী
দিনাজপুর
রংপুর
কুড়িগ্রাম
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
নওগাঁ
বগুড়া
নবাবগঞ্জ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
শেরপুর
জামালপুর
ময়মনসিংহ
নেত্রকোনা
কিশোরগঞ্জ
টাঙ্গাইল
ঢা কা বি ভা গ
গাজীপুর
নরসিংদী
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
মুন্সিগঞ্জ
সুনামগঞ্জ
সিলেট
মৌলভীবাজার
হবিগঞ্জ
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
মেহেরপুর
কুষ্টিয়া
চুয়াডাঙ্গা
ঝিনাইদহ
মাগুরা
রাজবাড়ী
ফরিদপুর
যশোহর
নড়াইল
সাতক্ষীরা
খুলনা
বাগেরহাট
গোপালগঞ্জ
মাদারীপুর
শরীয়তপুর
চাঁদপুর
কুমিল্লা
ফেনী
লক্ষ্মীপুর
নোয়াখালী
বরিশাল
ঝালকাঠী
পিরোজপুর
ভোলা
পটুয়াখালী
বরগুনা
ব রি শা ল বি ভা গ
চট্টগ্রাম
পার্বত্য খাগড়াছড়ি
পার্বত্য রাঙ্গামাটি
পার্বত্য বান্দরবান
কক্সবাজার

বাংলাদেশের মানচিত্র

উত্তর সীমানা

বাংলাদেশের উত্তর সীমার অদূরে রয়েছে হিমালয় পর্বত। উত্তর সীমায় আরো রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য ।

পূর্ব সীমানা

বাংলাদেশের পূর্ব সীমায় রয়েছে ছোট-বড় অনেক পাহাড়। যেমন আসাম ও গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান পর্বতশ্রেণি। পূর্ব-দক্ষিণে ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পর্বত শ্রেণি বাংলাদেশকে লুসাই জেলা ও মায়ানমার (বার্মা) থেকে পৃথক করেছে।

পশ্চিম সীমানা

বাংলাদেশের পশ্চিম সীমানায় রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও রাজমহলের পাহাড়ি এলাকা। এছাড়াও পশ্চিমের সীমারেখায় সাঁওতাল পরগনা, ঝাড়খণ্ড ও ময়ূরভঞ্জের অরণ্যময় মালভূমি রয়েছে।

দক্ষিণ

বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর এবং তার কূল বরাবর সমতট ভূমিতে গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা সবুজের আস্তরণ। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে বাংলাদেশের ফুসফুস হিসেবে পরিচিত সুন্দরবন। সুন্দরবন হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রীষ্ম-অঞ্চলীয় (ম্যানগ্রোভ) বনভূমি।

পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রধানত বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে অনেকবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে। কিন্তু, একটি ভৌগোলিক ঐক্যসূত্র রয়েছে।

নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পরিশেষে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব ও সুনির্দিষ্ট সীমারেখা গড়ে ওঠেছে। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭, ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের প্রধান নদনদী

নদী মাতৃক বাংলাদেশে জালের মতো জড়িয়ে আছে অনেক নদ-নদী । বাংলাদেশে বড় বড় নদ-নদীর উৎস দেশের বাইরে। নিচু অঞ্চল বলে বাংলাদেশের বুক চিরে নদীগুলো বয়ে চলে ক্রমে সাগরে গিয়ে মিশেছে । এখানে বাংলাদেশের প্রধান নদনদী সম্পর্কে বিবরণ দেওয়া হল।

পদ্মা: পদ্মা হচ্ছে গঙ্গা নদীর প্রধান শাখা। গঙ্গার পূর্ব-দক্ষিণবাহি প্রবাহকে বলা হয় পদ্মা। প্রাচীনকালে পদ্মা এত বড় নদী ছিল না, দেখতে খালের মতোই ছিল। তবে পদ্মা দশম শতকেরও প্রাচীন। পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) গোয়ালন্দের কাছে এসে মিলিত হয়েছে। এই মিলিত প্রবাহ চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সন্দীপের কাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। পদ্মার একটি প্রাচীনতম পথ রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া হয়ে চলন বিলের ভেতর দিয়ে ধলেশ্বরীর খাত দিয়ে ঢাকাকে পাশে রেখে মেঘনা খাড়িতে গিয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়। তাই ঢাকার পাশের এই নদীটির নাম বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গাই প্রাচীন গঙ্গা-পদ্মার খাত। মধুমতী ও আড়িয়াল খাঁ এখন পদ্মার প্রধান শাখানদী।

ব্রহ্মপুত্র: বাংলাদেশের প্রধান নদ হলো ব্রহ্মপুত্র। প্রাচীন কালে এর নাম ছিল লৌহিত্য। হিমালয়ের উত্তরে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে দেওয়ানগঞ্জের পাশ দিয়ে, শেরপুর ও জামালপুরের ভেতর দিয়ে, মধুপুর গড়ের পাশ দিয়ে ময়মনসিংহ জেলাকে দুভাগে ভাগ করে ঢাকা জেলার সোনারগাঁ পর্যন্ত প্রবাহিত। ঢাকা জেলার উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী হলো শীতলক্ষ্মা। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিক দিয়ে ব্রহ্মপুত্রেরই সমান্তরালে প্রবাহিত হয়ে শীতলক্ষ্মা বর্তমান ঢাকার দক্ষিণে নারায়ণগঞ্জের কাছে এসে ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আজ এর ধারা ক্ষীণ হলেও উনিশ শতকের গোড়াতেও লক্ষ্মা বেগবতী নদী ছিল।

যমুনা: বাংলাদেশের আরেকটি প্রধান নদী যমুনা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রহ্মপুত্রের অন্যতম শাখা যমুনা প্রবল হয়ে ওঠে। যমুনা ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি বয়ে এনে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মার প্রবাহে ঢেলে দিচ্ছে।

মেঘনা: মেঘনা বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ নদী। মেঘনার উদ্ভব খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ে। উত্তর প্রবাহে মেঘনার প্রাচীন নাম সুরমা। সুরমা সিলেট জেলার ভেতর দিয়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্বসীমা স্পর্শ করে

সিলেট বিভাগের হবিগঞ্জ জেলার আজমিরিগঞ্জ বন্দর ও অদূরবর্তী বানিয়াচঙ্গ গ্রাম বাঁ-তীরে রেখে ভৈরববাজারে এসে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। ভৈরব বাজার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের যে ধারা তার নাম মেঘনা।

করতোয়া: উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে প্রাচীন নদী করতোয়া। করতোয়া প্রাচীনকালে একটি বড় নদী ছিল। ভুটানের উত্তরে হিমালয়ে করতোয়ার জন্ম। এরপর দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির ভেতর দিয়ে নদীটি তিস্তা নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর তিস্তার তিনটি স্রোত তিনদিকে প্রবাহিত হয়েছে। পূর্ব থেকে দক্ষিণে বয়ে যাওয়া স্রোতের নাম করতোয়া। মধ্যবর্তী স্রোতের নাম আত্রাই এবং দক্ষিণ-পশ্চিম স্রোতের নাম পুনর্ভবা নদী।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১. শিক্ষার্থী বাংলাদেশের মানচিত্র এঁকে তার সীমানা পাওয়ার পয়েন্টে দেখাবে। ২. বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীর মানচিত্র এঁকে গতিপথ দেখাবে।

সারসংক্ষেপ

ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। দেশটি অবস্থানগত দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। দেশটির তিন দিকে স্থল আর এক দিকে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি একে অপরূপ সৌন্দর্য দান করেছে। ম্যানগ্রোভ বন নামে পরিচিতি সুন্দরবন, বিভিন্ন নদ-নদী, পাহাড় পর্বত বাংলাদেশকে এক পৃথক পরিচিতি প্রদান করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের ফুসফুস হিসেবে কোনটিকে আখ্যায়িত করা হয়?
ক) সুন্দরবনকে খ) বঙ্গোপসাগরকে
গ) মধুপুরের বনভূমিকে ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়সমূহকে

২। পূর্ব ভারতের বিশাল এলাকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রধানত যে জনগোষ্ঠীর বাস–
ক) উড়িয়া খ) মারাঠী
গ) বাঙালি ঘ) বিহারী

৩। কোন নদীর প্রাচীনতম পথ বুড়িগঙ্গা?
ক) মেঘনা খ) পদ্মা
গ) যমুনা ঘ) ব্রহ্মপুত্র

৪। আন্তনদের বাড়িটির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে প্রমত্তা পদ্মা নদী। পদ্মা, কোন নদীর প্রধান শাখা। (প্রয়োগ)
ক) যমুনা খ) ব্রহ্মপুত্র
গ) গঙ্গা ঘ) মেঘনা

৫। তিস্তা নদীর তিনটি স্রোতধারা হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য (উঃ দক্ষতা)
ক) বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, তুরাগ খ) সুরমা, কুশিয়ারা, সারা
গ) কর্ণফুলী, মাতামহুরী, হালদা ঘ) করতোয়া, পুনর্ভবা, আত্রাই

পাঠ-৩.২ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি এবং এর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব উল্লেখ করতে পারবেন।
- রাজনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ব-দ্বীপ, কীর্তিনাশা, সুজলা, সুফলা, সমতল, নিম্নভূমি, জনপদ, অরণ্য, ভাঙাগড়া।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

নদনদী দিয়ে বয়ে আসা পলি মাটির স্তর দিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ। উঁচু জায়গা থেকে নদীর স্রোতে যে অজস্র পলি অবিরাম ভেসে এসেছে তাই দিয়ে তৈরি হয়েছে বাংলার ব-দ্বীপের নিম্নভূমি। পশ্চিম, উত্তর এবং পূর্ব বাংলার কিছুকিছু অংশ বাদ দিলে ভূতত্ত্বের দিক থেকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রায় সবটাই নতুন পলি পড়া মাটি। এই নতুন জমির উপর দিয়ে বাংলার বিভিন্ন নদ-নদী কতবার যে খাত পরিবর্তন করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আবার এই নদী ভাঙ্গন বা খাত বদলে অনেক জনপদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। তাই বাংলার নদীকে অনেক সময় বলা হয় কীর্তিনাশা। অথচ এই নদীই বাংলাদেশকে সুজলা, সুফলা করেছে; তার দুই তীরে মানুষের বসতি, কৃষি, গ্রাম, নগর, বাজার, বন্দর, সম্পদ, সমৃদ্ধি, শিল্প, সাহিত্য, ধর্মকর্ম সবকিছুরই বিকাশ। বাঙালি তাই এসব নদীকে যেমন ভয়ভক্তি করেছে, তেমনই আদর করে তাদের নাম রেখেছে ইছামতী, ময়ূরাক্ষী, রূপনারায়ণ, মহানন্দা, মেঘনা, সুরমা, লৌহিত্য, কীর্ত্তনখোলা কিংবা কপোতাক্ষ।

ভূ-প্রকৃতি

পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লার কিছু অঞ্চল, সিলেটের পূর্বাঞ্চল, টাঙ্গাইলের মধুপুর গড় ও গাজীপুরের ভাওয়ালের গড় মিলে কিছু পাহাড় আছে। বাংলাদেশের আর সকল ভূমিই নতুনভূমি; এখানে সর্বত্র খালবিল আর বিরাট জলাভূমি। এই নবভূমির মধ্যে আবার ঢাকা বিভাগ, কুমিল্লা ও সিলেটের বহুলাংশের গঠন পুরনো। প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতির অনেক নির্দশন এসব জায়গায় পাওয়া গেছে। আর খুলনা, বাখেরগঞ্জ, সমতল-নোয়াখালি ও সমতল-চট্টগ্রামের গঠন নতুন।

উর্বর পলল ভূমি, চর ও অরণ্য

ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে সব থেকে বেশি ভাঙাগড়া হয়েছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। পদ্মা, ভাগীরথী ও তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় যে বিপুল পলিমাটি ভেসে আসে তার জন্যে নিম্নভূমি বার বার তছনছ হয়ে কখনো সেখানে সমৃদ্ধ জনপদ, কখনো গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে, কখনো তা জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে কিংবা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। ষষ্ঠ শতকে পানি সরে গিয়ে গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া অঞ্চল তখন সবেমাত্র মাথা তুলেছে; তাই তাকে বলা হতো নতুন জেগে ওঠা চর । এই জনপদ ছিল প্রায় সমুদ্রের তীরে। আজ যে সুন্দরবন অঞ্চল জনহীন অরণ্য। ছয় শতক থেকে তের শতক পর্যন্ত সেখানে ছিল মানুষের ঘনবসতিপূর্ণ জনপদ। নিম্নভূমির এই ভাঙাগড়া আজও একটানা চলছে।

নদ-নদী পরিবেষ্টিত ভূমি

বাংলার মাটিতে যুগ যুগ ধরে অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। নানান প্রাকৃতিক ওলট পালটের ফলে পুরনো মাটি বাতিল হয়ে নতুন মাটি বা নবভূমি জেগে উঠেছে, তাতে ভূ-প্রকৃতির কোনো মৌলিক বদল হয়নি। 'বাংলা' এই নামের সঙ্গে বাংলার নদ-নদী জড়িয়ে আছে। এসব নদ-নদীই বাংলার প্রাণ। এসব নদ-নদীই বাংলাকে গড়ে তুলেছে। যুগে যুগে বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে, আজও করছে। বাংলার নদ-নদীর খাত গত একশো বছরেও যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তাতে অবাক হয়ে যেতে হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ু

বাংলার জলবায়ু বরাবরই নাতিশীতোষ্ণ। তবে পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত বীরভূম-বর্ধমানের পশ্চিমাংশে এবং কতকটা মেদিনীপুরেও গ্রীষ্মের তাপ প্রখরতর; অন্যত্র গ্রীষ্মের হাওয়া উষ্ণ জলীয়। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি বেশি হয়। ভারত মহাসাগরের মৌসুমীবায়ু হিমালয়, গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে সমগ্র উত্তর-পূর্ব বাংলাকে বৃষ্টিতে ভাসিয়ে দেয়।

বসন্তকালে আরেকটি বায়ু প্রবাহ দেখা যায়; এই বায়ু প্রবাহ উত্তর-পূর্ববাহি। যেহেতু এই বাতাস মালয় পর্বত স্পর্শ করে আসে সেই জন্য কাব্যসাহিত্যে বসন্তের বাতাসকে বলে মলয় পবন। বর্ষায় অবিরল বৃষ্টিপাত পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জনজীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

কৃষি নির্ভরতা

বাংলাদেশের ভূমি খুবই উর্বর । এজন্যে বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীন কাল থেকে মূলত কৃষিজীবী। সুদূর অতীত থেকে এদেশের কৃষি প্রাচুর্যের জন্যে বিখ্যাত। বাংলাদেশে অল্প পরিশ্রমে অধিক খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়।

লোক-প্রকৃতি: শান্ত, কর্মঠ ও বিদ্যানুরাগী

উর্বর ভূমি ও মৃদু আবহাওয়া বাংলাদেশের মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে কোমল, শান্ত ও আবেগী স্বভাবের করে গড়ে তুলেছে। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ এ দেশে এসেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলার লোকেরা স্পষ্ট কথা বলে, এরা গুণবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবান। সমতটের লোকেরা কর্মঠ ও সাহসী; কর্ণসুবর্ণের লোকেরা ভদ্র, সচ্চরিত্র এবং তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী। বিদ্যাচর্চার প্রতি বাঙালির অনুরাগের খবর অনেক প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়। বাঙালিরা ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় এবং ভারতবর্ষের বাইরেও যাতায়াত করত।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী

বাংলাদেশের অবস্থানের কারণে এখানে কাল বৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা হয়। প্রকৃতি বাংলাদেশের অধিবাসীকে কিছুটা আয়েসী করে তুললেও নদী ও সমুদ্র এখানকার মানুষকে করেছে বিদ্রোহী এবং দিয়েছে প্রতিরোধ ক্ষমতা। নদীর দু-পাড় জুড়ে তাই যুগ যুগ ধরে অনবরত চলছে ভাঙা আর গড়া। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশবাসীর মানসিকতা একদিক থেকে যেমন সহনশীল, অন্যদিক থেকে চিরসংগ্রামী। তারা বিপর্যয়ের মুখে ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করে।

নৌ-কুশলী বাঙালি ও সমুদ্র বাণিজ্য

নদ-নদী ও পানিবেষ্টিত থাকার কারণে বাংলাদেশের মানুষ নৌকা নির্মাণ ও পরিচালনায় দক্ষ। নৌ-যুদ্ধে বাংলার অধিবাসীদের সুখ্যাতি ছিল। প্রাচীনকালে ও মুসলিম যুগে এদেশে সু-শৃঙ্খল নৌ-বহর গড়ে উঠেছিল । প্রাচীনকালে বাংলার মানুষের নদীপথে যেমন দেশের মধ্যে, তেমনই সমুদ্রপথে দেশের বাইরেও যাতায়াত ছিল। উত্তর আসামের রেশমজাতীয় জিনিসপত্র, পান, সুপারি, চন্দনকাঠ, বাঁশ, তেজপাতা ইত্যাদি ব্রহ্মপুত্র-সুরমা-মেঘনা নদীর জলপথ দিয়েই বাংলাদেশে আসত। প্রাচীন বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্য ও বাণিজ্যপথের যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে।

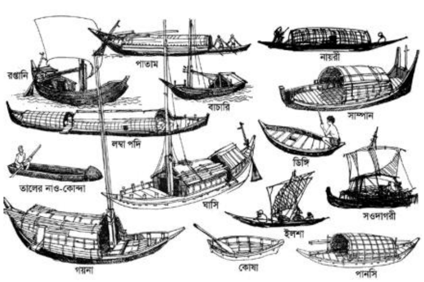

বাংলাদেশের নানা রকমের নৌকা

রাজনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

উত্তর ও পূর্বদিকে পাহাড়, টিলা এবং দক্ষিণ দিকে সমুদ্র বাংলাদেশকে প্রাচীনকাল থেকেই প্রাকৃতিকভাবে বেষ্টিত করে রেখেছে। ফলে বাংলাদেশকে খুব একটা বৈদেশিক আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়নি। বিদেশী শক্তির লোভী দৃষ্টি থেকে প্রকৃতিই বাংলাদেশকে আড়াল করে রেখেছিল এবং প্রাচীনকালে বহু বছর বাংলার নিজস্ব অস্তিত্ব বজায় ছিল। উত্তর ভারত থেকে এদেশে মাত্র দুটি পথ ধরে বাংলায় প্রবেশ করা যেত: একটি ত্রিহুত বা উত্তর বিহারের মধ্য দিয়ে এবং অন্যটি রাজমহলের নিকট তেলিয়াগড়ের সরু পাহাড়ি পথ ধরে। প্রাকৃতিক কারণে দুটি পথ ধরে বাংলায় প্রবেশ সহজসাধ্য ছিল না বলে ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তি সহজে প্রাচীনকালে সম্পদশালী বাংলাদেশকে সহজে অধিকার করতে পারেনি এবং তাদের অভিযান বেশিরভাগই বিফল হয়েছে। কখনো কখনো সাফল্য এলেও ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মৌর্য

ও গুপ্ত শাসকগণ অল্প সময়ের জন্যে বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এভাবে প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন একটি নিজস্ব ধারায় গড়ে উঠতে থাকে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্টের প্রভাব এদেশের মানুষের পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের উপরও পড়েছে। বাংলার অধিবাসীদের খাদ্য, পোশাক, ঘরবাড়ি, জীবনাচার ইত্যাদি ভৌগোলিক বৈশিষ্টের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলার ভূ-প্রকৃতি, তার নদনদীর বিস্তার ও বিপুল পলিমাটি এ দেশটিকে গড়ে তুলেছে মৃৎ শিল্প চর্চার এক আদর্শ ক্ষেত্র হিসেবে। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্যবাহী পোড়ামাটির শিল্প এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশকে আশ্রয় করেই বিকশিত হয়েছিল। বাংলাদেশে আদিমকাল থেকেই জলপথে নৌকার ব্যবহার চলে আসছে। নদীমাতৃক বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এবং আনন্দ উৎসবে নৌকা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বাঙালির মন যে নৌ-যানের তারে বাঁধা ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশ এখানকার নগর বন্দরের উত্থান-পতনের সাথেও জড়িত। নদীর গতি পরিবর্তন ও অন্যান্য ভৌগোলিক কারণে বহু প্রাচীন বন্দরের উত্থান ও বিলুপ্তি ঘটেছে। প্রাচীন যুগে পুণ্ড্রনগর, গৌড়, বিক্রমপুর, দেবপর্বত (ময়নামতি) ইত্যাদি শহর নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক মানচিত্র আঁকবেন এবং সেখানে হলুদ রং-এ পাহাড়ি অঞ্চল ও বনভূমি দেখাবেন, সবুজ রং-এ সমগ্র সমতলকে চিহ্নিত করে নীল রং দিয়ে নদনদী ও দক্ষিণের বঙ্গোপসাগরকে ফুটিয়ে তুলবেন।

সারসংক্ষেপ

নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি গড়ে উঠেছে নদ-নদীকে কেন্দ্র করে। নদী দিয়ে বয়ে আসা পলিতে গড়ে উঠেছে ভূমি, এদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ তবে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যে কারণে বাংলাদেশের নদীগুলো জনজীবনের যাবতীয় বিষয়ের উপর প্রভাব ফেলে। নদী-নদী একদিকে করে তোলে মানুষকে সংগ্রামী অপরদিকে খুলে দেয় সমৃদ্ধের দ্বার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটিকে বাংলার প্রাণ বলা হয়?
ক) এখানকার টিলা পাহাড়কে খ) বনভূমিকে গ) নদ-নদীকে ঘ) ফসলের মাঠকে

২। বিদেশী আক্রমণ থেকে বাংলা মুক্ত ছিল কেন?
ক) সুশৃংখল নৌবাহিনীর জন্য খ) সুউচ্চ পর্বতমালা থাকায়
গ) প্রাকৃতিক বেষ্টনির কারণে ঘ) রুক্ষ শুষ্ক জলবায়ুর জন্য

৩। বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য বাক্যটি?
i) বেশি পরিশ্রম কম ফলন ii) অল্প পরিশ্রম বেশি ফলন iii) বেশি পরিশ্রম বেশি ফলন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল
ক) বাণিজ্য খ) কৃষি গ) মৎস্যচাষ ঘ) পশুপালন

৫। প্রাচীন পুঁথিতে বাঙালির কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়?
ক) চরিত্রবান খ) বিদ্যানুরাগী গ) পরিশ্রমী ঘ) সাহসী

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ ঃ ১. ক ২. গ ৩. খ ৪. গ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ ঃ ১. গ ২. গ ৩. খ ৪. খ ৫. খ

প্রাচীন বাংলার জনপদ ও রাজনৈতিক ইতিহাস

ইউনিট ৪

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন খ্রিস্টপূর্ব দেড় হাজার বছর আগে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল অজয় নদীর তীরে। প্রাচীনকালে বাংলা বলতে সমগ্র দেশকে বোঝানো হতো না। এর বিভিন্ন অংশ একাধিক নামে পরিচিত ছিল এবং এই অংশগুলোর ভৌগোলিক অবস্থিতি বহুলাংশে নির্ধারিত হয়েছিল ভূ-প্রকৃতি তথা নদীর স্রোতধারার মাধ্যমে। প্রাচীনকালে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এই জনপদবাসীরাই স্ব-স্ব জনপদের নামেই পরিচিতি লাভ করে। পাল আমল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। তবে গুপ্তদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে বাংলাও ছিল একটি প্রদেশ। গুপ্ত শাসনের পর এই দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির জন্ম হয়। এ অবস্থা চলে প্রায় একশ বছর। গোপাল নামে এক নেতা এ অরাজক অবস্থার অবসান ঘটান এবং পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর প্রায় চারশ বছর পর বাংলায় পাল শাসনের অবসান হয় এবং বার শতকের মাঝামাঝি প্রতিষ্ঠিত হয় সেন শাসন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ ঃ প্রাচীন বাংলার জনপদ
পাঠ-৪.২ ঃ প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস
পাঠ-৪.৩ ঃ পাল বংশ
পাঠ-৪.৪ ঃ সেন বংশ

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

পাঠ-৪.১ প্রাচীন বাংলার জনপদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর নাম বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনপদ, পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল

প্রাচীন যুগে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এই জনপদবাসীরাই স্ব-স্ব জনপদের নামেই পরিচিতি লাভ করে। তবে ভৌগোলিক পরিবেশ একদিকে যেমন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের (নদীর ভাঙা-গড়া) সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে ঠিক একইভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তার বা হ্রাসের মাধ্যমে জনপদগুলোর আয়তনও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে এসব পৃথক পৃথক অংশগুলো এককথায় 'জনপদ' নামে পরিচিতি লাভ করেছে। জন বা জনগোষ্ঠীর অবস্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয় এই শব্দটি। অর্থাৎ এই জনপদগুলোর অধিকাংশের নামকরণ হয়েছিল প্রাচীন জনগোষ্ঠীর নামানুসারে। প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আনুমানিক ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে প্রাচীন বাংলা পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সূক্ষ্ম, তাম্রলিপি, সমতট, বঙ্গ ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত। এই জনপদগুলো স্বতন্ত্র ও পৃথক, মাঝে মাঝে বিরোধ মিলনে একের সাথে অন্যের যোগাযোগের বিষয়টি লক্ষ করা যায়। তবে প্রত্যেকেই যে স্বতন্ত্র সে বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত।

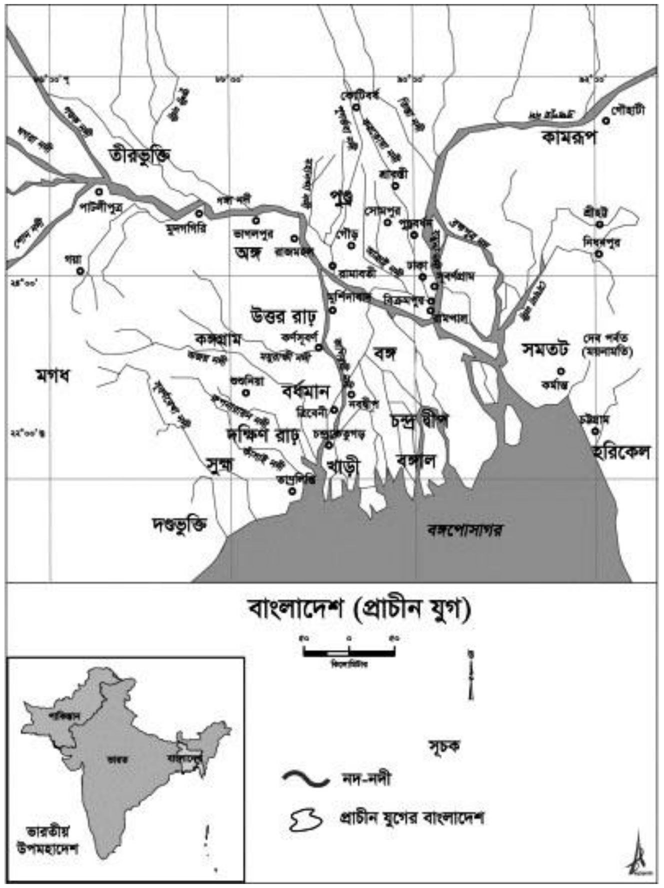

পুণ্ড্র বা বরেন্দ্রী

পুণ্ড্র ছিল পূর্বাঞ্চলের জনপদসমূহের মধ্যে খুব সম্ভবত প্রাচীনতম। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের (আনুমানিক) মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতে উল্লিখিত পুদনগল (পুণ্ড্র নগর) এবং বগুড়া যে অভিন্ন তা একাধিক উৎস থেকে প্রমাণ করা যায়। প্রাচীন এই জনপদের সীমানা চিহ্নিত করে ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থানের একটি নতুন নাম পাইতেছি দশম শতক হইতে; এ নাম বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী।" অর্থাৎ এই প্রাচীন জনপদটি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দুটো ভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। কতিপয় লিপি প্রমাণে এ কথা বলা যায় যে, বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশবিশেষ। মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিকরা বরেন্দ্রিকে বলতেন বরীন্দ্র। অবশ্য বরেন্দ্র বলতে প্রাচীন বরেন্দ্রিক মতো বিশাল এলাকাকে বুঝাতো না।

রাঢ়, তাম্রলিপ্তি

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উৎস থেকে বলা যায় যে, রাঢ় বলতে পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলকেই বুঝানো হতো। এটি গঙ্গা নদীর দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। জনপদটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি ছিল দক্ষিণ রাঢ় এবং অন্যটি ছিল উত্তর রাঢ়। এই উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ই ছিল যথাক্রমে বজ্রভূমি ও সূক্ষ্মভূমি। রাঢ়ের প্রধান নগর বা রাজধানী ছিল কোটিবর্ষ। রাঢ় বা সূক্ষ্মদেশের অন্তর্গত তাম্রলিপ্তের কথা টলেমির ভূগোলে উল্লিখিত ছিল । অনেক ঐতিহাসিক মেদিনীপুর জেলার পূর্বপ্রান্ত অবস্থিত আধুনিক তমলুককে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। শুধু বাংলা নয় এটি প্রাচীন ভারতেরও পূর্বাঞ্চলের শ্রেষ্ঠ বন্দর।

গৌড়

ধারণা করা হয় যে, গুড় উৎপাদনের কেন্দ্র বলে গৌড় নগর ও দেশের নামের উদ্ভব হয়। আর হয়ত এই গৌড়নগরকে ঘিরেই পরে গৌড় জনপদ গড়ে উঠেছিল। 'গৌড়' নামটি সুপ্রাচীন হলেও এর অবস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা কষ্টসাধ্য। বাংলার প্রাচীন জনপদগুলো যে যুগে যুগে সীমানা সম্প্রসারণ করেছে তার বড় উদাহরণ হলো গৌড়। এই জনপদের খ্যাতি এতই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, সমগ্র বাংলাকেই সময়ে সময়ে গৌড়দেশ বিবেচনা করা হতো।

পূর্ব ভারতীয় দেশসমূহের সামগ্রিক নাম হিসেবে এমনকি উত্তর ভারতের আর্যাবর্তের নাম হিসেবেও কখনো কখনো গৌড়ের ব্যবহার দেখা যায়। সেনবংশীয় রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করে গৌরববোধ করতেন। ব্যাপক অর্থে 'গৌড়' বলতে অনেক সময় বাংলা ভাষাভাষী সমগ্র অঞ্চলকে বুঝাত। আদি গৌড়ের রাজনীতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণের ফলে এর সীমানা বৃদ্ধি পেতো।

আদিকালে গৌড় বলতে বর্তমানের মুর্শিদাবাদ জেলা ও মালদা জেলার দক্ষিণাংশকে বুঝাত। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে কর্ণসুবর্ণ দেশের সম্রাট বলেছেন এবং *হর্ষচরিত* গ্রন্থে শশাঙ্ককে 'গৌড়াধিপতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কর্ণসুবর্ণ দেশ ও গৌড়দেশ অভিন্ন। গৌড়ের রাজধানী শহর ছিল কর্ণসুবর্ণ। মধ্যযুগের খ্যাতিমান মুসলিম পণ্ডিত আল বেরুনির বিবরণ অনুযায়ী পূর্বভারতের বিভিন্ন দেশের অর্থাৎ বর্তমান বাংলা, উড়িষ্যা, আসামের আদি মধ্যযুগীয় লিপির প্রকৃত রূপ হলো এই "গৌড়ীয় লিপি"। মুসলিম যুগে অঞ্চলটি কখনো 'গৌড়' আবার কখনো লক্ষণাবতী নামে পরিচিত ছিল।

বঙ্গ

বঙ্গ একটি প্রাচীন জনপদ। *ঐতরেয় আরণ্যক* গ্রন্থে একটি উপজাতির নাম হিসেবে বঙ্গের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত, রামায়ণ ও হরিবংশেও রয়েছে বঙ্গ প্রসঙ্গ। মহাভারতের আদি অন্যান্য জনপদের সাথে উচ্চারিত হয়েছে বঙ্গের নাম। মহাকবি কালীদাসের রঘুবংশ কাব্যে আছে বঙ্গের অবস্থান ও সীমানা সম্পর্কিত কিছু তথ্য। তিনি ভাগীরথী ও পদ্মার স্রোত মধ্যবর্তী এলাকায় যে ত্রিভুজাকৃতি ব-দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে তাকেই বঙ্গদের অঞ্চল বলেছেন। আর এ অঞ্চলই সম্ভবত টলেমির 'গঙ্গরিডাই'। প্রাচীন শিলালিপিতে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। একটি বিক্রমপুর বঙ্গ অন্যটি নাব্য বঙ্গ। বর্তমানে নাব্য বলে কোনো জায়গা নেই। অনুমান করা যায় ঢাকা-ফরিদপুর-বরিশাল এলাকা নাব্য বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাংলায় মুসলমান শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে 'বঙ্গ' বলে বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব অংশকেই বুঝানো হতো। সুতরাং বঙ্গের এই ভৌগোলিক পরিচিতি হিন্দু ও বৌদ্ধ যুগ পেরিয়ে মুসলিম যুগের প্রাথমিক পর্যায়েতো বটেই, সম্ভবত 'বাঙ্গালাহ' নামের বিকাশ পর্যন্তই ছিল।

মধ্যযুগের বিখ্যাত মুঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল রচিত *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশের উত্তরকালীন নাম বঙ্গাল। কারণ এ দেশের প্রাচীন রাজাগণ সারাদেশে চওড়া 'আল' নির্মাণ করতেন। সেজন্যে 'বঙ্গ' ও 'আল' শব্দ দুটির যোগে 'বঙ্গাল' নামের উৎপত্তি হয়েছে। এ থেকে ধারণা করা হয় যে পানি থেকে শস্যক্ষেত রক্ষার জন্য বড় বড় 'আল' বাঁধা হতো এবং তার ফলে এ অঞ্চলটি 'বঙ্গাল' নামে পরিচিত হয়।

সমতট, পট্টিকেরা

দক্ষিণ পূর্ব বাংলার জনপদ সমতট নামটি বর্ণনামূলক এবং এর অর্থ তটের সমান্তরাল। চতুর্থ শতকের সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ লিপিতে তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমায় সমতটের উল্লেখ রয়েছে। কালিদাসের *রঘুবংশ* কাব্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, সমতট বঙ্গের পূর্বে অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতকে সমতটে এসেছিলেন হিউয়েন সাঙ। তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিদ্যমান অবস্থার যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা থেকে বোঝা যায় যে, কুমিল্লার লালমাই অঞ্চলই সমতট। মূলত মেঘনা-পূর্ববর্তী অঞ্চলই সমতট বলে পরিচিত ছিল এবং এ অঞ্চলের কেন্দ্র ছিল কুমিল্লার নিকটবর্তী 'লালমাই' এলাকা। একেবারে সঠিকভাবে সমতটের সীমা নির্ধারণ না করা গেলেও ত্রিপুরা (কুমিল্লা) ও নোয়াখালী অঞ্চলই ছিল সম্ভবত প্রাচীন সমতট।

হরিকেল

হরিকেল জনপদের কথা প্রথম জানা যায় প্রথম শতকের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে। চন্দ্রবংশীয় লিপিতেও হরিকেল রাজ্যের কথা আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দুটি প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে হরিকোল (হরিকেল) ও বর্তমান সিলেট বিভাগ অভিন্ন উল্লিখিত হয়েছে। অনেকে ধারণা করেন যে হরিকেল জনপদ ছিল না, এটি বঙ্গের সাথে যুক্ত ছিল।

বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে এ কথা বলা যায় যে, জনপদগুলোর নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা বা যুগে যুগে তাদের সীমার বিস্তার ও সংকোচনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ কাজ। তারপরও প্রাপ্ত নানা তথ্যের মাধ্যমে আমরা জনপদগুলোর ভৌগোলিক কাঠামো সম্পূর্ণ সঠিক না হলেও আংশিক সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। রাজনৈতিক, ভৌগোলিক নানা প্রেক্ষাপটে এসব জনপদগুলোয় সবসময়েই চলেছিল ভাঙা-গড়ার খেলা। ভবিষ্যতে হয়ত আরও নানা তথ্যের আবিষ্কার আমাদের সামনে জনপদগুলোর পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরবে।

হিউয়েন সাঙ

আল বেরুনি

টলেমি

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	বৃহত্তর বঙ্গদেশের একটি প্রাকৃতিক মানচিত্রে জনপদসমূহকে আলাদা করে চিহ্নিত করবেন। পাওয়ার পয়েন্টে দেখাবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীনকালে বাংলা নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ড নয় বরং বেশ কয়েকটি জনপদে বিভক্ত ছিল। এগুলো হলো পুণ্ড্র, রাঢ়, গৌড়, বঙ্গ বা বঙ্গাল, সমতট ও হরিকেল। এই জনপদগুলো সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন বংশের শাসনে ছিল। পাল আমলের শাসনের সূচনা পর্যন্ত এ জনপদগুলোর আয়তন বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হতে দেখা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার বিবরণের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে লালমাই অঞ্চলই "সমতট" জনপদ?
ক) পাণিনী খ) কালিদাস গ) আবুল ফজল ঘ) হিউয়েন সাঙ

২। জনপদের নির্দিষ্ট সীমানা প্রদান কষ্টসাধ্য কেন?
i) পারস্পারিক সংযুক্ততা ii) ভৌগোলিক বিবরণের অপূর্ণতা iii) রাজ্যসীমা বিস্তার বা সংকোচনের ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। বঙ্গের অবস্থান বলতে বুঝায়–
i) ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যবর্তী এলাকা ii) বাংলার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাংশ iii) মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রবার্টসন একজন মুঘল শাসকের সভাকবি ছিলেন। তিনি জানান যে প্রাচীনকালে কৃষকরা জমিকে বন্যার ব্যাপকতা থেকে রক্ষার জন্য বাঁধ দিত? (উচ্চতর দক্ষতা)
উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিকের প্রদত্ত তথ্যের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঐতিহাসিকের মিল পাওয়া যায়।
ক) শামস সিরাজ আফীফ খ) জিয়াউদ্দিন বারানী গ) আবুল ফজল ঘ) মিনহাজ উস সিরাজ

সৃজনশীল

শার্লিন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের শিক্ষার্থী। 'O' লেভেল পরীক্ষা শেষে মামার বাড়ি করতোয়ার পাশে বগুড়ার মহাস্থানগড়ে যায়। মামা তাকে নিয়ে সেখানে গড়ে ওঠা প্রাচীনকালের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখায় এবং সে সময়কার উজ্জ্বল শাসনামলের ইতিহাস বর্ণনা করেন।

ক. সর্বপ্রথম বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায় কোন গ্রন্থে?
খ. জনপদ বলতে কী বুঝায়? –ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে শার্লিনের পরিদর্শনকৃত এলাকা কোন জনপদের কথা মনে করিয়ে দেয়? বিবরণ দিন।
ঘ. উক্ত জনপদের শাসকদের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল শাসনকাল – মতামত উল্লেখ করুন।

পাঠ-৪.২ প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলার অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের রাজা শশাঙ্ক সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মৌর্য, গুপ্ত, শশাঙ্ক, হর্ষবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রশাসন

মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা

গুপ্ত যুগের আগে বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় না। এ সময়ের ইতিহাস বিষয়ে কিছু উপাদান পাওয়া যায়। যেমন গ্রিক লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে, তখনকার বাংলাদেশে 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রিস্ট পূর্ব)। এলাকাটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। সমগ্র বাংলা শাসনকারী প্রথম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হলো গুপ্তরা। বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, গুপ্তদের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে বাংলাও ছিল একটি প্রদেশ।

শশাঙ্ক : বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম সার্বভৌম রাজা। তিনি বাংলার বাইরেও রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শশাঙ্ক উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও ভূমিকা পালন করেছিলেন। ড. নীহাররঞ্জনের মতে শশাঙ্ক "স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিরূপে সুবিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।"

শশাঙ্কের প্রাথমিক জীবন ও উত্থান: শশাঙ্কের বংশ বা বাল্যজীবন সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, শশাঙ্ক প্রথম জীবনে স্বাধীন রাজা ছিলেন না, গুপ্ত বংশীয় মহাসেন নামক এক রাজার সামন্ত ছিলেন। শশাঙ্ক কখন এবং কিভাবে গৌড়দেশে সার্বভৌম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তাও সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে ষষ্ঠ শতকের শেষের দিকে গৌড়ের পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়েন। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে শশাঙ্ক সপ্তম শতকের শুরুতে আনুমানিক ৬০৬ সালে গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীন গৌড়রাজ্য বাংলার উত্তর, উত্তর-পশ্চিমাংশ ও মগধে বিস্তৃত ছিল। কর্ণসুবর্ণ ছিল শশাঙ্কের রাজধানী। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত রাঙ্গামাটি নামক স্থানটিই প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ ।

রাজ্য জয় এবং পুষ্যভূতি রাজ্যের সাথে দ্বন্দ্ব: শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার পর নিজ রাজ্যের সীমা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। শশাঙ্কের রাজ্য দক্ষিণে উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদ পর্যন্ত ছিল। শশাঙ্ক পশ্চিমে তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলে প্রথমে মগধ ও পরে বারানসী রাজ্য তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করে। ফলে উভয় অঞ্চলই শশাঙ্কের রাজ্যভুক্ত হয়।

শশাঙ্ক উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও জড়িত ছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল কনৌজের মৌখরীরাজাদের আক্রমণ থেকে নিজ রাজ্যকে রক্ষা করা। উত্তর ভারতে শশাঙ্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন হর্ষবর্ধন। তাই হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্টের রচিত *হর্ষচরিত* ও তার সমসাময়িক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় শশাঙ্কের উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিবরণ রয়েছে। শশাঙ্কের সাথে রাজ্যবর্ধনের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজ্যবর্ধন নিহত হন । এরপর রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে শশাঙ্কের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং এক বিশাল বাহিনীসহ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তবে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে হর্ষবর্ধন যে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারেননি তা শশাঙ্কের গঞ্জাম তাম্রশাসন থেকেই প্রমাণিত হয়। শশাঙ্ক হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মার হাত থেকে নিজ রাজ্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

শশাঙ্কের কৃতিত্ব: শশাঙ্ক সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এ কারণেই হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী ও বৌদ্ধ ধর্মের নিগ্রহকারীরূপে চিহ্নিত করেন। শশাঙ্ক সম্পর্কে এ অভিমত সম্পূর্ণ সত্য বলে মনে হয় না। কারণ হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, রাজধানী কর্ণসুবর্ণে এবং শশাঙ্কের রাজ্যের অন্যত্র বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল।

শশাঙ্ক বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি নিজ প্রতিভা বলে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি গৌড় রাজ্যকে ভারতের বিহার ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কৌশল ও সামরিক দক্ষতার বলে তিনি তাঁর প্রধান শত্রু হর্ষবর্ধনের

মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজ ক্ষমতা ও মর্যাদা রাখতে পেরেছিলেন। শুধু বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয়, বরং সপ্তম শতকের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেও শশাঙ্ক ছিলেন একজন নামকরা রাজা।

শশাঙ্ক একজন সুশাসক ছিলেন। তিনি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্যোগ নেন। তার আমলে তাম্রলিপ্ত বন্দর গুরুত্ব লাভ করে। তিনি ৬৩৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য শাসকের অভাবে গৌড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।গোটা বাংলায় নেমে আসে অন্ধকারের যুগ। প্রায় একশ বছর বাংলার ইতিহাসে যে অরাজকতা, নেতৃত্বের শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাকে 'মাৎস্যন্যায়' বলা হয়ে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীরা শশাঙ্ক ও হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধের একটি কাল্পনিক চিত্র আঁকবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ইতিহাসে শশাঙ্ক ছিলেন প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। নিজ প্রতিভা বলে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন, তার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। গুপ্ত বংশের রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে শশাঙ্ক সপ্তম শতকের শুরুতে রাজ্য গড়ে তোলেন। তবে তার মৃত্যুর পর নেমে আসে অন্ধকারের যুগ। যোগ্য শাসকের অভাবে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কী?
ক) নদীয়া খ) কর্ণসুবর্ণ গ) বিক্রমপুর ঘ) কোটি বর্ষ

২। উত্তর ভারতে শশাঙ্কের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কে ছিলেন?
ক) রাজ্যবর্ধন খ) হর্ষবর্ধন গ) ভাস্করবর্মা ঘ) বাণভট্ট

৩। গৌড় কিসের নাম? (অনুধাবন)
ক) প্রাচীন রাজধানীর খ) প্রাচীন নগরীর গ) প্রাচীন সাহিত্যের ঘ) প্রাচীন জনপদের

উদ্দীপকটি পড়ুন ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ঢাকার ইম্পেরিয়াল কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা সফরে যাচ্ছিল। বাসের সামনের ব্যানারে লেখা ছিল 'চলো যাই বহুদূর সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ ও বরেন্দ্র।'

৪। বাসের ব্যানারে যে স্থানগুলোর নাম লেখা ছিল সেগুলো কিসের পরিচয় বহন করে?
ক) পিকনিক স্পট খ) প্রাচীন সভ্যতা গ) দর্শনীয় স্থান ঘ) প্রাচীন জনপদ

৫। উদ্দীপকে উল্লিখিত সমতট স্থানটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (উচ্চতর দক্ষতা)
i) নৌ চলাচলের জন্য উত্তম ii) মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চল iii) বঙ্গের পূর্বে অবস্থিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে দণ্ডভুক্তি থেকে চিল্কাহ্রদ পর্যন্ত এলাকাকে রাজ্যভুক্ত করেন কে?
ক) হর্ষবর্ধন খ) শশাঙ্ক গ) রাজ্যবর্ধণ ঘ) মহাসেন

সৃজনশীল

কুমিল্লার ইফতেখার সাহেব প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জানতে কিছু বই ক্রয় করেন। এর মাধ্যমে তিনি জানলেন পাল রাজাদের আমলে যে জনপদটির বেশি নাম ডাক ছিল তার নানা অজানা তথ্য। এখানে পালদের পূর্ববর্তী একজন শাসক শুধু বাংলায় নয় উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুতে বাংলায় নেমে আসে হতাশার যুগ, দেখা দেয় অরাজকতা।

ক. শশাঙ্ক কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
খ. শশাঙ্ক-কে সুশাসক বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে পালশাসকদের পূর্ববর্তী শাসকের সাফল্যের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন শাসকের মিল লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. দক্ষ শাসকের অবর্তমানে রাজ্যে সৃষ্টি হয় অরাজকতা – পাঠ্য বইয়ের আলোকে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-৪.৩ বাংলায় পাল বংশের শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মপালের শাসনকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- দেবপালের শাসনামলের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- পাল যুগের গৌরব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মাৎস্যন্যায়, গোপাল, ধর্মপাল, সোমপুর বিহার, নালন্দা, দেবপাল, মহীপাল

ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে পাল রাজবংশ দীর্ঘকাল শাসন করেছে। সুশাসন, জনকল্যাণ, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, উন্নত জীবনবোধ ইত্যাদি বাংলায় সর্বপ্রথম পালরাই প্রতিষ্ঠিত করে। পাল রাজারা বাংলা ও বিহার অঞ্চলে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় চারশ বছর শাসন করেছেন। নৈরাজ্য ও চরম অরাজকতার হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করে গোপাল নামক এক উচ্চবর্গীয় ব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ধর্মপাল, দেবপাল, মহিপাল নামে অনেক পাল রাজারা বাংলা শাসন করেছেন।

মাৎস্যন্যায় ও গোপালের উত্থান

শশাঙ্কের পর সপ্তম শতকের মাঝামাঝি থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত বাংলায় বিরাজ করছিল এক অন্ধকার যুগ। বাংলার ইতিহাসে এই সময়টি 'মাৎস্যন্যায়' নামে খ্যাত। মাৎন্যায় একটি সংস্কৃত শব্দ যার অর্থ হল অরাজক পরিস্থিতি। অরাজকতা এবং রাষ্ট্রহীনতার অবসান ঘটিয়ে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পাল বংশের শাসন। শত বছরের হানাহানির অবসান ঘটে যখন গোপাল রাজা হলেন।

মাছের রাজত্বে ছোট, দুর্বল মাছ সবসময় বড় মাছগুলোর গ্রাসে পরিণত হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলা যেন পরিণত হয়েছিল মাছের রাজ্যে। শাসকের অভাবে সবল অত্যাচার করে দুর্বলের ওপর। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কে মায়া, মমতা, সৌহার্দ্যের যে স্থান তা দখল করে নেয় হিংসা ও দ্বেষ। লামা তারানাথ লিখেছেন, সমগ্র দেশের কোনো রাজা ছিল না। এক চরম অরাজক পরিস্থিতিতে বাংলার ইতিহাসে অনেকটা ধূমকেতুর মতো গোপালের আবির্ভাব হয়। খালিমপুর তাম্রশাসনের বলা হয়েছে যে, মাৎস্যন্যায় দূর করার অভিপ্রায়ে প্রকৃতিগণ গোপালকে রাজা নির্বাচন করেছিলেন। 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ 'জনগণ' বা প্রধান 'কর্মচারী' । সম্ভবত প্রধান কর্মচারীগণ সমবেত হয়ে গোপালকে রাজা নির্বাচন করেন।

অরাজক পরস্থিতিতে গোপালের উত্থান প্রসঙ্গে তারানাথ এক রূপকথার অবতারণা করেছেন। বঙ্গ রাজ্যে উপযুক্ত শাসকের অভাবে জনগণের দুঃখের সীমা ছিল না। এ কারণে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে আইনানুগ শাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে একজন রাজা নির্বাচিত করেন। তবে নির্বাচিত রাজা সে রাতেই নিহত হন এক কুৎসিত, শক্তিশালী নাগ রমণীর হাতে। এরপর সেখানে যত রাজা নির্বাচিত হতেন প্রত্যেককে এই রাক্ষুসীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হতো। যেহেতু একজন রাজা ছাড়া জনসাধারণ তাদের রাজ্য চালাতে পারছিল না, তাই প্রতি সকালে তারা একজন রাজা নির্বাচন করত। এভাবে প্রতিদিন রাজা নির্বাচন ও নিহত হবার ঘটনা ঘটেছিল। অতঃপর চুণ্ডাদেবীর আর্শীবাদ পেয়ে এক ব্যক্তি উপস্থিত হন এমন এক বাড়িতে যে বাড়ির লোকজন দুঃখি ছিল। কারণ সেদিন রাজা হবার দায়িত্ব পড়েছিল ঐ বাড়ির এক ছেলের ওপর। অতিথি সবকিছু কথা শুনে নিজে রাজা হবার কথা বলেন। এতে সেই পরিবার খুবই খুশি হয়। তিনি যেদিন রাজা নির্বাচিত হন সেদিন

মধ্যরাতে সেই রাক্ষুসী উপস্থিত হলে অতিথির হাতে সেই রাক্ষুসীর মৃত্যু ঘটে। পরদিন সকালে লোকেরা তাকে জীবিতবস্থায় দেখে খুবই অবাক হন। তার এ যোগ্যতার জন্যে জনগণ তাকে স্থায়ী রাজারূপে নির্বাচিত করে এবং গোপাল নামে অভিহিত করে।

ধর্মপাল ও উত্তর ভারতে ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ

ধর্মপাল হচ্ছেন পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব করেন। দীর্ঘ শাসনামলে ধর্মপাল পাল রাজ্যকে একটি সাম্রাজ্যে উন্নীত করেন। ধর্মপাল যখন সিংহাসন আরোহণ করেন তার কিছু আগ থেকেই আর্যাবর্ত তথা উত্তর ভারতে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতা বিরাজমান ছিল। আর্যাবর্তের কেন্দ্রস্থল কনৌজ-এ কোনো রাজশক্তি ছিল না। এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য অষ্টম শতকের শেষ দিকে পার্শ্ববর্তী শক্তিবর্গের মধ্যে তুমুল লড়াই শুরু হয়। তৎকালীন ভারতের তিনটি প্রধান রাজশক্তি যথা রাজস্থানের প্রতীহার রাজবংশ, বাংলার পাল এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট এক ত্রিপক্ষীয় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ধর্মপাল বেশকিছু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তবে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। যাহোক, বাংলার ইতিহাসে ধর্মপালই প্রথম রাজা যিনি সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে স্বল্পকালের জন্য হলেও কিছু সাফল্য অর্জন করেন। ধর্মপালের সময়ে বাংলা নতুন শক্তি ও উদ্দীপনার প্রতীক হয়েছিল।

মহাস্থানগড়, বগুড়া

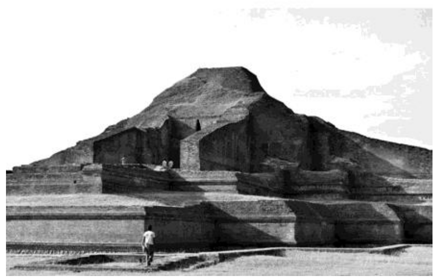

সোমপুর মহাবিহার, পাহাড়পুর

শালবন বিহার, কুমিল্লা

ধর্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি অনেক বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রাজশাহী বিভাগের বর্তমান নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন। বরেন্দ্র অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত এই বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। এই জন্যে এটি মহাবিহার নামে পরিচিত। ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হলেও তিনি অন্য ধর্ম সম্পর্কে উদার মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি হিন্দু দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ করার জন্য ভূমিদান করতেন। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।

দেবপাল ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

দেবপাল পালবংশের অন্যতম রাজা ছিলেন। তিনি আনুমানিক ৮২১ সালে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি শুধু পিতা ধর্মপালের সাম্রাজ্য রক্ষাই করেননি, বরং সীমানা বৃদ্ধিও করেন। একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, তাঁর সৈন্যবাহিনী বিন্ধ্য পর্বত ও কম্বোজে বিচরণ করেছিল এবং তিনি উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত এবং পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত ভূভাগ শাসন করেন।

দেবপাল গুর্জের রাজাকে পরাজিত করেন, উড়িষ্যাও জয় করেন। জানা যায় যে, দেবপাল দ্রাবিড় রাজার দর্প চূর্ণ করেন। কেউ কেউ দ্রাবিড় রাজ্য বলতে রাষ্ট্রকূট রাজ্যকে ধরে নেন এবং দেবপালের সাথে রাষ্ট্রকূট রাজের সংঘর্ষের কথা মনে করেন। আরব দেশীয় বণিক ও পর্যটক সুলায়মানের মতে, তখন বাংলা অধিক শক্তিশালী ছিল। দেবপাল সুমাত্রা, জাভা ও বোর্ণিও রাজ্যের রাজাদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। মালয় উপদ্বীপের শৈলবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব দেবপালের খ্যাতির কথা জানতে পেরে তাঁর নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন। বালপুত্রদেব ইতোমধ্যেই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি এর স্থায়ী ব্যয় পরিচালনার জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন।

দেবপাল বৌদ্ধ ধর্মের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর সংস্কার সাধন করেন। তিনি নালন্দায়ও কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় একটি বড় মন্দির নির্মাণ করেন। ইন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদকে তিনি নালন্দার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে তাঁর শাসনামলে উত্তর ভারতে লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধ ধর্ম পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হলেও দেবপাল অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর মন্ত্রী কেদারমিশ্র ছিলেন একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু। দেবপালই ছিলেন যথার্থভাবে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা এবং তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্য ক্ষমতা ও গৌরবের শীর্ষ-স্থানে উপনীত হয়।

পাল সাম্রাজ্যের অবনতি (৮৬১-৮৯৫ খ্রি.)

দেবপালের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে কে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেই পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে। তথ্য-প্রমাণের অভাবের কারণে সঠিক ধারণা লাভ কঠিন । সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, দেবপালের পুত্র ছিলেন মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল। তিনি প্রায় ১০ বছর রাজত্ব করেছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে। তারপর শাসন করেন নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল। তাদের সময় রাজ্যের সীমানা সংকুচিত হয়ে পড়ে।

মহীপাল (৯৯৫-১০৪৩ খ্রিস্টাব্দ) পুনরুদ্ধার, অবনতি ও পাল বংশের পতন

পাল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে দুঃসময়ে বিগ্রহপালের পর তাঁর পুত্র মহীপাল ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি কম্বোজ এবং চন্দ্রবংশের হাত থেকে ‘অনাধিকৃত বিলুপ্ত’ পিতৃরাজ্য যেমন বিহার, উত্তর বাংলা পুনরুদ্ধার করেন। তিনি বারানসী ও সারনাথ পর্যন্ত শক্তি বৃদ্ধি করেন। তবে সেই সময় দাক্ষিণাত্যের চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের আক্রমণে বাংলার স্বাধীনতা প্রায় বিপন্ন হতে বসে। তিনি পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি রাজ্য সম্প্রসারণ ও জনহিতকর কাজ এবং বৌদ্ধ তীর্থস্থানে কীর্তি স্থাপনসহ নানা কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর নামে ‘মহীপাল গীত’ প্রচলিত ছিল।

মহীপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্যে আবার অশান্তি সৃষ্টি হয়। তখন বাইরের শক্তি ক্রমাগত আক্রমণ করত। ফলে শুধু বাংলা নয় বিহারেও পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেশের ভেতরেও ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বেড়ে যায়। রামপালকেই পাল বংশের ‘শেষ মুকুট’ বলে অভিহিত করা হয়। যদিও তার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল কিছু সময় বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তারা ছিলেন দুর্বল ও অযোগ্য। ফলে বার শতকের শেষ দিকে সেন বংশের উত্থানের ফলে পাল রাজত্বের অবসান ঘটে।

পাল যুগের গৌরব

পাল যুগে বাংলার রাজনীতি যেমন নৈরাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে চরম উৎকর্ষতা অর্জন করেছিল তেমনি অর্থনৈতিক জীবনে ধ্বনিত হয়েছিল নবতর স্পন্দন। অন্যদিকে বাংলার ধর্ম, সমাজ এবং সংস্কৃতিতে যে সমন্বয়ের ঐতিহ্য তৈরি হয়েছিল তা ছিল এক শাশ্বত অর্জন। এ সময় বাংলার জনজীবনে হিন্দু-বৌদ্ধদের মধ্যে বিভাজন, হিংসা-দ্বেষ খুব একটা ছিল না। এ যুগে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়, বাংলার সংস্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে ঐ সব অঞ্চলে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিকশিত হয় এক নিজস্ব ও অনন্য রীতি। সাহিত্য ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। পালরাই প্রাচীন বাংলার প্রথম দেশজ রাজশক্তি এবং তারাই হচ্ছে আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের প্রাচীনতম সত্তা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ নওগাঁ জেলায় অবস্থিত সোমপুর মহাবিহারের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি একটি বড় আর্ট পেপারে ছবিসহ উপস্থাপন করবেন। অথবা কম্পিউটারে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ পালবংশ ও সোমপুর মহাবিহারের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় যে মাৎস্যন্যায় বা মাছের রাজত্ব চলছিল গোপাল সেই শত বছরের অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে রাজা হন এবং পাল বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। পাল রাজা ধর্মপাল উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশ নেন। পালযুগে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্ররূপে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রাচীন বাংলার প্রথম দেশজ রাজশক্তি এবং আধুনিক বাঙালি জাতি গঠনের প্রাচীনতম পাল বংশ মহীপালের সময় থেকে দুর্বল হতে থাকে। রামপালকে পাল বংশের শেষ মুকুট বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন রাজবংশ প্রায় চারশ বছর বাংলা শাসন করে?

ক) গুপ্ত খ) মৌর্য
গ) পাল ঘ) সেন

২। ধর্মপাল কোথায় বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেন?

ক) পাহাড়পুরে খ) মহাস্থানগড়ে
গ) কনৌজে ঘ) রাজশাহীতে

৩। কোন শাসককে পালদের মুকুটমনি বলা হয়?

ক) দেবপাল খ) মহীপাল
গ) রামপাল ঘ) মদনপাল

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দিন

ওমপুর অঞ্চলের রাজা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য ভূমি দান করেন। তার মন্ত্রীও ছিলেন অন্য ধর্মের অনুসারী। এমন নানা গুণের অধিকারী তিনি আমাদের কাছে আজও স্মরণীয়।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
খ. মাৎস্যন্যায় বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের রাজার ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের সাথে আপনার পঠিত কোন পাল শাসকের কাজের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত শাসকই ছিলেন “পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক” আপনি কী একমত? যুক্তি দিন।

পাঠ-৪.৪ বাংলায় সেন বংশের শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- সেন রাজবংশের পরিচয় বলতে পারবেন।
- বিজয় সেনের শাসনকালের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বল্লাল সেনের রাজত্বকালের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- লক্ষ্মণ সেনের বিবরণ দিতে পারবেন ।
- বাংলায় সেন রাজবংশের পতন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বিজয় সেন, বল্লাল সেন, কৌলিন্য প্রথা, লক্ষ্মণ সেন

ভূমিকা

বাংলার পাল যুগের অবসানের পর বার শতকের দ্বিতীয় ভাগে সেন শাসনের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় তারা এদেশে ছিলেন বহিরাগত। সেনদের পূর্বপুরুষদের আদি বাস ছিল দাক্ষিণ্যাত্যের কর্নাটে। বাংলায় সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হেমন্ত সেন । তিনি শেষ বয়সে কর্নাট থেকে এসে রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেন। ধারণা করা হয় যে, তিনি পাল রাজা রাম পালের অধীনে একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।

বিজয় সেন

বাংলাদেশে বিজয় সেনের সময়ই সেনবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন ১০৯৮ সাল থেকে ১১৬০ সাল পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেন। বিজয় সেন সম্ভবত পালরাজা রামপালের রাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলে প্রথমে সামন্তরাজা ছিলেন। বিজয় সেন পালরাজা রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন। এ সাহায্যের প্রতিদানে তিনি রাঢ়ে স্বাধীন ক্ষমতা লাভ করেন। পরবর্তীকালে বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলা জয় করে সেনদের ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে একটি বড় রাজ্যে পরিণত করেন। এভাবে বিজয় সেন তাঁর সুদীর্ঘ ৬২ বছরের রাজত্বকালে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে প্রায় সমগ্র বাংলাদেশে একক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

বিজয় সেন একজন প্রতিভাবান রাজা ছিলেন। সামান্য একজন সামন্তরাজ হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি নিজ প্রতিভা বলে বাংলার সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করেছিলেন এবং প্রায় সারা বাংলাদেশে নিজ আধিপত্য সুপতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ছাড়া পালবংশের শাসনাবসানে বাংলাদেশে যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তা থেকে তিনি বাংলা এবং এর অধিবাসীকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি একজন বীরযোদ্ধা ছিলেন যার সাহস ছিল অপরিসীম; সামরিক দূরদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। তিনি পরমেশ্বরও ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন।

বিজয় সেন শৈব ছিলেন এবং বৈদিক ধর্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাদেরকে অকাতরে দান করতেন। কবি উমাপতিধর বিজয় সেনের চারিত্রিক গুণাবলির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বল্লাল সেন

বিজয় সেনের মৃত্যুর পর আনুমানিক ১১৬০ সালে তার পুত্র বল্লাল সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্য জয়ের চেয়ে দেশের ভেতরে উন্নয়ন, নতুন প্রথা চালু ও সংস্কারের কাজে অধিকতর মনোযোগী ছিলেন। তবে তিনি গোবিন্দপালকে পরাজিত করে মগধের পূর্বাঞ্চল অধিকার করেন। কথিত আছে যে, বল্লাল সেন তাঁর পিতার রাজত্বকালে মিথিলা জয় করেন।

বল্লাল সেন বিদ্যান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তিনি ব্রতসাগর, আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর নামে পাঁচটি গ্রন্থ রচনা করেন।

কৌলিন্য প্রথা ও বল্লাল সেন

কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসেবে বল্লাল সেন ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিচিত। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা যায় যে, কৌলিন্য প্রথার সাথে বল্লাল সেনের সম্পর্কের তেমন কোনো যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই। বাংলাদেশে কৌলিন্য প্রথার বহুল প্রচলন দেখা যায় আঠারো ও উনিশ শতকে। ব্রাহ্মণগণ এ প্রথা প্রবর্তনের উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁরা তাঁদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এ প্রথার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি দেখানোর জন্য প্রচার করেন যে, সেন আমলে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। যদি বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করতেন, তাহলে তার উল্লেখ সে যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় অবশ্যই থাকত। কিন্তু সেন যুগের সাহিত্য ও লিপিমালায় বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন বিষয়ে কোনো উল্লেখ নেই।

তবে সেন রাজাদের আমলে সাধারণত সম্মানীয় ব্রাহ্মণদেরকে সমাদর করার উদ্দেশ্যে জমি দান করা হতো। এরূপ জমিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েকজনের কথাসহ তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। বল্লাল সেন তাঁর পিতার ন্যায় শৈব ছিলেন। ধর্মপ্রচারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি তাঁর পিতার অন্যান্য উপাধির সাথে 'অরিরাজ নিঃশঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি আনুমানিক ১৮ বছর রাজত্ব করার পর বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে সস্ত্রীক ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গাতীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

লক্ষ্মণ সেন

বল্লাল সেন ও রমাদেবীর পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৭৯ সালে প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। লক্ষ্মণ সেন গৌড়, কলিঙ্গ, কামরূপ ও কাশীতে বিজয় অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বখতিয়ার খিলজির আক্রমণকালে তিনি আশি বছরের বৃদ্ধ ছিলেন। গৌড় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই পুরোপুরি সেন সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। মগধকে রক্ষা করার জন্যে এবং বাংলাকে আগলে রাখার মানসে লক্ষ্মণ সেন কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা জানা যায় না।

তবে লক্ষ্মণ সেন নিজ সাম্রাজ্যকে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে খুব একটা সুরক্ষিত রাখতে পারেননি। রাজত্বের শেষের দিকে তিনি বার্ধক্যের কারণে বেশ দুর্বলও হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তখন রাজ্যের ভেতরে গোলযোগের বিষয়টি ধরা পড়েছিল।

বখতিয়ার খিল্‌জি

তের শতকের প্রথম দিকে, সম্ভবত ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি বাংলা আক্রমণ করেন। লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন, দুর্বল লক্ষ্মণ সেন কোনো প্রতিরোধ না করে নদীপথে দক্ষিণপূর্ব বাংলায় চলে যান। এর ফলে উত্তর ও উত্তর পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার অধিকার করেন এবং লক্ষ্মণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণ সেনের নদীয়া ত্যাগের মাধ্যমেই বাংলায় হিন্দুশাসনের পতন হয়েছিল বলে ধরা হলেও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় লক্ষ্মণ সেন আরও কয়েক বছর রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণ সেন একজন বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তিনি বল্লাল সেনের অসমাপ্ত *অদ্ভুতসাগর* সমাপ্ত করেছিলেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন ও তাঁর রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গিয়েছে। তাঁর রাজসভায় জ্ঞানী ব্যক্তিবগের সমাবেশ ঘটেছিল। ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হলায়ুধ তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের পিতা ও পিতামহ শৈবধর্মের অনুরাগী হলেও তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পূর্বসূরিদের 'পরম মাহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে তিনি 'পরমবৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর রাজসভায় ভারত বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের অবস্থান ছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং কৌলীন্য প্রথার জন্যে তাঁর দুর্বলতা ছিল, কৌলীন্যপ্রথা বিস্তারে তিনি ছিলেন সচেষ্ট। তাঁর এ ধরনের মনোভাব সমাজের অন্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সঞ্চার করে। তবে লক্ষ্মণ সেনের

দানশীলতা ও ঔদার্য মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজুদ্দীনকে আকর্ষণ করেছিল। মিনহাজ তাঁর দানশীলতার সুখ্যাতি ও শাসনরীতির প্রশংসা করে তাঁকে হিন্দুস্থানের 'খলিফা স্থানীয়' বলে বর্ণনা করেছেন।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল পূর্ব বাংলা শাসন করেন। সেন শাসনামলে সর্বক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সমাজে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দেখা দেয় অস্থিরতা। অনেকের মতে, ধর্ম সম্পর্কে কট্টর মনোভাব সেনদের পতন তরান্বিত করে এবং এরই সুযোগ নেয় মুসলমানেরা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ একটি বড় আর্ট পেপারে সেন বংশের রাজাদের পরিচিতিমূলক বিষয় উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় পাল যুগের অবসানের পর বার শতকের শেষের দিকে সেন বংশের শাসনের সূচনা হয়। সেন বংশের শাসনের প্রতিষ্ঠাতা হেমন্ত সেন হলেও বিজয় সেনের সময়েই বাংলাদেশে সেন বংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেন বংশের অন্যতম শাসক বল্লাল সেন যিনি কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন বলে মনে করা হলেও সাম্প্রতিক গবেষণায় অনেকটা অস্বীকার করা হয়েছে। সেন বংশের সর্বশেষ শাসক লক্ষ্মণ সেন ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে নদীয়া ত্যাগ করেন এবং বাংলায় সেন বংশের শাসনের পতন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

ক) বিজয় সেন খ) হেমন্ত সেন
গ) বল্লাল সেন ঘ) বিশ্বরূপ সেন

২। কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক হিসেবে পরিচিত কোন শাসক?

ক) হেমন্ত সেন খ) বিজয় সেন
গ) বল্লাল সেন ঘ) কেশব সেন

৩। লক্ষ্মণ সেন নদীয়া ত্যাগ করেন কেন?

ক) পর্যাপ্ত সৈন্যের অভাবে খ) বখতিয়ারের সাহসিকতায়
গ) জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখাত হওয়ায় ঘ) বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে

৪। লক্ষ্মণ সেন কেমন শাসক ছিলেন?

ক) সুদর্শন খ) সুঠামদেহী
গ) সুপণ্ডিত ঘ) সুগায়ক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বৌ বাজারের ভূইয়া বাড়ির লোকেরা শিশুদের খেলার মাঠের খেলাকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের পারিবারিক সমস্যায় প্রতিনিয়ত পারস্পরিক ঝগড়া মারামারিতে লিপ্ত ছিল এমতাবস্থায় বাড়ির বয়স্ক ব্যক্তিরা সমস্যা সমাধানকল্পে একজনকে নেতা হিসেবে মেনে নেয় এবং এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। উদ্দীপকের ঘটনাটি পাঠ্য বইয়ে প্রাচীন বাংলার কোন শাসকের মৃত্যুর পর ঘটে?
ক) দেবগুপ্ত খ) গোপাল
গ) শশাঙ্ক ঘ) হর্ষবর্ধন

৬। উক্ত ঘটনাটি প্রাচীন বাংলার যে ব্যক্তির শাসকের নির্বাচিত হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ–
ক) শশাঙ্ক খ) গোপাল
গ) ধর্মপাল ঘ) মহীপাল

৭। প্রাচীন বাংলার সেন শাসকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
i) অরাজকতা থেকে বাংলাকে রক্ষা করা
ii) রাজ্য বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখা
iii) বিদ্যা ও বিদ্বানের কদর করা

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। মুসলিম ঐতিহাসিক মিনহাজ রাজা লক্ষ্মণ সেনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এর যথার্থ কারণ–
i) তাঁর দানশীলতা
ii) তাঁর সাহসিকতা
iii) তাঁর ঔদার্য

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

সেন রাজা	রাজত্বকাল
বিজয় সেন	১০৯৮-১১৬০
বল্লাল সেন	১১৬০-১১৭৮
?	১১৭৯-১২০৬
বিশ্বরূপ সেন	১২০৩-১২০৪

৯। চিহ্নিত স্থানে কোন সেন শাসক রাজত্ব করেন?
ক) হেমন্ত খ) বিজয়
গ) লক্ষ্মণ ঘ) কেশব সেন

১০। ছকের কোন শাসক অদ্ভুত সাগর ও দানসাগর নামে ২টি গ্রন্থ রচনা করেন–
ক) বিজয় খ) বিশ্বরূপ
গ) বল্লাল ঘ) লক্ষ্মণ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ ঃ ১. ঘ ২. ঘ ৩. খ ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ ঃ ১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ ৫. গ ৬. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ ঃ ১. গ ২. ক ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ ঃ ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. গ ৫. গ ৬. খ ৭. গ ৮. খ ৯. গ ১০. গ

প্রাচীন বাংলার জীবনচর্যা

ইউনিট ৫

বাংলায় প্রাচীনকালে সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক রূপের কিছু প্রকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন যুগকে তাই রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পর্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব কয়েক শতাব্দী আগের সময় থেকে খ্রিস্টীয় তের শতকের আগ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দুই হাজার বছর সময়কে প্রাচীন যুগ বলা হয়ে থাকে। সেই সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কিছু দিক নিয়েই এ ইউনিটে আলোচনা করা হলো।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৫.১ ঃ প্রাচীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি
পাঠ-৫.২ ঃ প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৫.১ প্রাচীন বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলায় অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জনবসতি, বর্ণপ্রথা, নারী, কৃষি অর্থনীতি, ব্যবসায়, শিল্প, মুদ্রা, খনিজ সম্পদ

জনবসতি

বাংলায় জনবসতি স্থাপন শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার বছরেরও পূর্ব থেকে। নানা জাতিগোষ্ঠী যেমন, নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, অ্যালোপাইন, আর্য, মঙ্গোলীয়, শক, তুর্কি, আরব, পাঠান, হাবশ, কোচ, রাজবংশী, পর্তুগিজ ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে বাংলার জনস্রোতে মিশেছিল। অস্ট্রিকরাই এখানে কৃষি ও পশুপালনের সূচনা করেছিল বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। কোল, ভিল, সাঁওতাল, মুণ্ড ইত্যাদি জনগোষ্ঠী অস্ট্রিকদের বংশধর। দ্রাবিড়দের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকে।

প্রাচীন জনপদগুলোর সমাজব্যবস্থা

দলবদ্ধ জীবনই সমাজ। প্রাচীন বাংলায় কোম বা গোত্র হচ্ছে সংগঠিত প্রথম দলবদ্ধ সমাজ। বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কোম জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠে। কোমগুলো একের সঙ্গে অন্যের যোগাযোগ ও আদান-প্রদান তেমন ছিল না। নানা ধরনের বাধা, বিধিনিষেধ ছিল। কোমবদ্ধ সমাজে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল যা ছিল একান্তই আদিম।

আদিতে শিকার, কোম কৃষি এবং ক্ষুদ্র গৃহশিল্পই ছিল সামাজিক সম্পদের প্রধান উৎস যা কোমের সদস্যরা ভাগাভাগি করে নিত। অবশ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক আদান-প্রদান ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে ছোট-বড় কোমের সমবায়ে বৃহত্তর সমাজ যেমন পুণ্ড্র, বঙ্গ, রাঢ় ইত্যাদির উদ্ভব ঘটেছে। বাংলায় প্রাচীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমগোষ্ঠী ক্রমেই বৃহত্তর শংকর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর উদ্ভব ও বিস্তার ঘটায়। প্রাচীন জনপদগুলো ছিল কৃষিপ্রধান। তবে এগুলোতে গৃহশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উদ্ভব ঘটেছিল। জনপদগুলোতে রাষ্ট্রের কিছু দায়বদ্ধতা লক্ষ করা যায়। কারণ দুর্ভিক্ষ হলে রাজাগণ জনকল্যাণের চিন্তা থেকে রাজকীয় শস্যভাণ্ডার থেকে ফসল, শস্যবীজ বিলিয়ে দিতেন। তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকেই বাংলাদেশে কিছুটা উত্তর–ভারতীয় নগরসভ্যতার ছোঁয়া লেগেছিল।

বর্ণ-প্রথা ও প্রাচীন বাংলার সমাজ

কোনো সমাজে বর্ণপ্রথা একেবারে শুরুতে থাকে না। বাংলা তথা ভারতীয় সমাজে আর্য সংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তার হিসেবেই বর্ণপ্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শত শত বছর ধরে আর্যপূর্ব ও অনার্য সংস্কার এবং সংস্কৃতি এ বর্ণপ্রথার ভাবাদর্শে পুষ্ট হয়েছিল। বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের মতোই বাংলা ভূখণ্ড বর্ণশ্রম এবং বিভক্তির সর্বগ্রাসী ব্যবস্থায় বেড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র Ïএ চতুর্বর্ণের প্রথাকে আরো শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রন্থের লেখকরা ভূমিকা রাখেন। বিচিত্র সব বর্ণ, উপবর্ণ ও শংকর বর্ণের সামাজিক বিন্যাস এতে গুরুত্ব পায়। এভাবে বর্ণভেদ প্রথা ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারে প্রতিষ্ঠা পায়। নিম্নবর্ণের ডোমদের বাস ছিল গ্রামের বাইরে। উচ্চবর্ণের লোকেরা এঁদের ছুঁতেন না।

সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থান

তাঁত বোনা

আজও বাংলার গ্রামদেশের মেয়েদের মধ্যে যে সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও কামনা-বাসনা দেখা যায়, প্রাচীন যুগের বাংলায় মোটামুটি সেই আদর্শই পালিত হতো। পাল ও সেন আমলের লিপি দেখে মনে হয় লক্ষ্মীর মতো কল্যাণী, বসুন্ধরার মতো সর্বংসহা, পাতিব্রত্যে অচঞ্চল নারীত্বই ছিল প্রাচীন বাঙালি নারীর আদর্শ। স্ত্রী হবেন বন্ধুর মতো এবং স্বামীর ইচ্ছাস্বরূপিনী। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় নারী পুরুষের বৈষম্য একটি সাধারণ বিষয় ছিল। তবে ধনী পরিবারের নারীদের অবস্থান গরীবদের চেয়ে অনেক ভালো ছিল। বর্ণপ্রথার কারণে অসবর্ণ বিবাহ সমাদৃত ছিল না। পাল ও সেন আমলে নারীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মা ও স্ত্রীদের সম্মান বেশ উঁচুতে ছিল। সুতা কাটা, তাঁত বুনা, অন্যান্য গৃহশিল্পকর্মে নিয়োজিত হতো দরিদ্র পরিবারের নারীরা। সমাজের সাধারণ নিয়ম ছিল নারীপুরুষ নির্বিশেষে একটি মাত্র বিয়ে করা। তবে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। কিন্তু বিধবাজীবন নারীদের জন্য প্রাচীন বাংলায় অভিশাপ হিসেবে ছিল। এ কারণে সহমরণ উৎসাহিত হয়। অভিজাত পরিবারের মেয়েরা লেখাপড়া করত। রাজপরিবারেও নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত না, ঘোমটা বা অবগুণ্ঠন সেখানেও অবধারিত ছিল। কিন্তু হতদরিদ্র ঘরের মেয়েদের শারীরিক শ্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হতো, তাই তাদের মধ্যে অবগুণ্ঠনের প্রচলন ছিল না।

প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি

কৃষি অর্থনীতি

প্রাচীন বাংলার একেবারে গোড়ার দিকে সম্পদের প্রধান উৎস ছিল শিকার, কৌম কৃষি এবং ছোটখাট গৃহশিল্প। দ্বিতীয় পর্বে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত কিছুটা উন্নত ধরনের চাষবাস এবং গৃহশিল্প ছাড়াও ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। প্রাচীন যুগের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে বার শতক অবধি বাঙালিগণ মূলতই কৃষি নির্ভর ছিল। প্রাচীন বাংলায় গ্রামই ছিল অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দু। মূলত ধান, তরিতরকারি, ফলমূল, ফুল, সরিষা ও আখ চাষাবাদ করে দেশের

মানুষকে জীবিকা নির্বাহ করতে হতো। এখানে প্রচুর আখ উৎপাদিত হতো এবং আখ থেকে গুড় উৎপাদন করে বিদেশেও রপ্তানি করা হতো। কাঠ এখানকার মানুষের একটি অর্থকরী সম্পদ ছিল। সুপারি আর নারিকেল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলকে আঁকা ছবিতে কলাগাছ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে অভিজাত ও জমিদার শ্রেণির অবস্থা তুলনামূলকভাবে সচ্ছল ছিল। জমির কর্তৃত্ব ছিল রাজাদের হাতে। বিভিন্ন ধরনের কর প্রদানের মাধ্যমে এসব জমি ইজারা নেওয়া হতো। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানি ঘটলে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিত। প্রাচীন বাংলার মানুষ ভাত, মাছ, তরিতরকারি, দুধ, দই, ঘি, খির, মাংস, ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। তখন রানাবান্নায় প্রচুর মসলা ব্যবহার করা হতো। গ্রামেগঞ্জে উৎসবে পিঠা, মুড়ির প্রচলন ছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প

প্রাচীন বাংলায় শুধু দেশের ভেতরে ব্যবসায়-বাণিজ্য হতো তা নয়, বিদেশের হাটেবাজারেও জিনিসপত্র রফতানি হতো। গ্রামাঞ্চলের হাটে নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসের কেনাবেচা চলত। দেশের ভেতরে নৌযোগে বেচাকেনা হতো। ফলে গড়ে ওঠে হাট-বাজার, গঞ্জ ও নতুন নতুন শহর। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে গঙ্গা নদীর মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দর ছিল বলে জানা যায়। তৎকালীন সুবর্ণভূমি (ব্রহ্মদেশ), মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রায় সুতি কাপড় ও মুক্তা রফতানি করা হতো। স্থলপথে আসাম, মায়ানমার, চীন, ভূটান, নেপালসহ বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বাণিজ্যের কারণে বাংলার সম্পদ প্রাচীন যুগে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন যুগেই বাংলার বস্ত্রশিল্পের খ্যাতি দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কার্পাস ও অন্যান্য বস্ত্রশিল্পই ছিল সবচেয়ে বড় শিল্প এবং অর্থাগমের অন্যতম প্রধান উপায়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য চার প্রকারের বস্ত্রের কথা লিখেছেন। মৃৎশিল্পের প্রচলন ছিল। কারণ পাহাড়পুরে ও ময়নামতিতে পোড়ামাটির থালা, পানির পাত্র, দোয়াত ও প্রদীপ পাওয়া গেছে। স্বর্ণ ও মণিমুক্তার প্রচলন ছিল। কাঠ ও নৌকা শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে মাঝি, স্বর্ণকার, সূত্রধর, মণিকার, কর্মকার ইত্যাদি পেশা ও সংঘের সৃষ্টি হয়। হাতির দাঁতের শিল্পও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলায় কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ি, মন্দির, পালকি, রথ, গরুর গাড়ি, নৌকা ও জাহাজ তৈরি হতো। মৌলভীবাজার জেলার ভাটেরা তাম্রশাসনে গোবিন্দ নামে এক কাঁসারির উল্লেখ থেকে কাঁসাশিল্পের প্রমাণ পাওয়া যায়। অসংখ্য ব্রোঞ্জ ও ধাতুর তৈরি মূর্তি পাওয়া গেছে। লোকজন নৌকা এবং সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ শিল্প ও ব্যবসায় জড়িত ছিল। যাতায়াত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও নৌবহরের উপর সামরিক শক্তি নির্ভর করত।

প্রাচীন মুদ্রা ও খনিজ সম্পদ

বাংলায় খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে ছাপকাটা মুদ্রা প্রচলিত ছিল। মৌর্য যুগেও মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। কুষাণ যুগের কয়েকটি মুদ্রাও পাওয়া গেছে। গুপ্তযুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ছিল। দীর্ঘদিন এখানে কড়িরও প্রচলন ছিল। প্রাচীন যুগে বিনিময় প্রথার প্রচলন ছিল। প্রাচীন পৌন্ড্রদেশ একসময় হিরার জন্য বিখ্যাত ছিল। কৌটিল্য বাংলায় হিরার খনির কথা উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত সোনারগাও, সুবর্ণবীথি, সোনাপুর প্রভৃতি নামের সঙ্গে সোনার ইতিহাস জড়িত। ত্রিপুরার যে সব বণিক ঢাকায় বাণিজ্য করতে আসত, তারা টুকরো টুকরো সোনার বদলে নিয়ে যেত প্রবাল, চুম্বক পাথর ও সামুদ্রিক শঙ্কের মালা। সমুদ্রে প্রচুর মুক্তা পাওয়া যেত। গৌড়দেশে তখন রূপাও পাওয়া যেত। একটি পুথিতে রাঢ়দেশে লৌহখনির কথা আছে। লোহা দিয়ে দা, কুড়াল, লাঙল, তীর, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি তৈরি হতো। তের শতকের গোড়ার দিকে জনৈক চৈনিক পরিব্রাজক বাংলাদেশে এসে এখানকার দুমুখো ধারালো তলোয়ারের খুব তারিফ করেছেন।

প্রাচীন যুগের মুদ্রা

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	প্রাচীন বাংলার সমাজে বর্ণপ্রথাসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের উপর শিক্ষার্থীগণ একটি ছোট নাটিকা তৈরি করে ক্লাসে প্রদর্শন করবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় প্রথমদিকে অস্টিক, দাবিড় সহ নানা জাতিগোষ্ঠী বাস করত। এসব জাতিগোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা ছিল কোম বা গোত্র। প্রাচীন জনপদগুলো ছিল কৃষিপ্রধান। এ সমাজে যেমন ছিল উচুঁ-নিচু শ্রেণি, তেমনি ছিল নারী-পুরুষের বৈষম্য। তবে মা ও স্ত্রীদের সম্মান করা হতো। প্রাচীন বাংলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর ও গ্রামভিত্তিক হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের কথাও জানা যায়। বিভিন্ন যুগে মুদ্রার পাশাপাশি খনিজ সম্পদের কথাও জানা যায় যেমন, সোনা, রূপা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রাচীন বাংলায় গ্রাম্য উৎসবে কিসের প্রচলন ছিল?
- ক) দুধ ও মুড়ি খ) পিঠা ও পায়েস
- গ) আম ও চিড়া ঘ) পিঠা ও মুড়ি

২। গঙ্গা নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দরটির নাম কী?
- ক) গঙ্গে খ) তাম্রলিপ্তি
- গ) মংলা ঘ) নারায়ণগঞ্জ

৩। প্রাচীন বাংলায় আর্য সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ ছিল–
- ক) দাসপ্রথা খ) জাতিভেদ প্রথা
- গ) সতীদাহ প্রথা ঘ) বর্ণভেদ প্রথা

৪। প্রাচীন বাংলার যে শিল্প দেশ ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে– (অনুধাবন মূলক)
- ক) মৃৎ শিল্প খ) বস্ত্র শিল্প
- গ) কারু শিল্প ঘ) স্বর্ণ শিল্প

৫। প্রাচীন পুঁথিতে লোহার খনির উল্লেখ পাওয়া যায়–

i) রাঢ় ii) বঙ্গ iii) সমতট

নিচের কোনটি সঠিক?
- ক) i খ) ii
- গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। প্রাচীনকালে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে কোনটি প্রচলিত ছিল?
- ক) দাস প্রথা খ) কর প্রথা
- গ) বিনিময় প্রথা ঘ) মালজামিনী প্রথা

৭। বাংলার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির কারণ কোনটিকে বলা যায়?
- ক) বাণিজ্যিক প্রসার খ) কৃষির উন্নতি
- গ) জীবন মাত্রার মান বৃদ্ধি ঘ) শিল্পের উৎকর্ষতা

পাঠ-৫.২ প্রাচীন বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রাচীন বাংলার ধর্ম সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, শিল্পকর্ম, ওয়ারী-বটেশ্বর, টেরাকোটা ফলক

বাংলার আদিবাসী মানুষের ধর্মকর্মের ছবি ফুটিয়ে তোলা কঠিন। তার ওপর একেক বর্ণ, একেক শ্রেণি, একেক কোম, একেক জনপদে ভয়ভক্তি পূজোঅর্চনার একেক রকম রূপ। একের ধারণা আর অভ্যাস কখনও অবিকলভাবে, কখনও বা তাতে রং লাগিয়ে অপরে গ্রহণ করে। এই দেয়া-নেয়ার কাজটা চলে লোকচক্ষুর আড়ালে। অবিরাম এই দেয়া-নেয়ার ফলেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন বাংলার ধর্মকর্ম। হিন্দু জন্মান্তরবাদ, পরলোকে বিশ্বাস, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির অনেক কিছুরই মূলে আছে আদিবাসীদের ধ্যান-ধারণা। গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের আদিমতম ভয়, বিস্ময়, বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদি বাঙালির ধর্মের পুরো ছবি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন যুগের এসব বিশ্বাস ও আচারে বাঙালির ধর্মের জগৎ সমৃদ্ধ হয়েছে।

প্রাচীন বাংলার ধর্ম

খ্রিস্টপূর্ব বার শতকের আগে বাংলার লোকালয়ের বাইরে গ্রাম-দেবতার অবস্থিতি ছিল, নানা ধরনের পূজো প্রচলিত ছিল। এ সবই কোম সমাজের পূজো। চাষাবাদের সাথেও নানা ধরণের দেবদেবীর পূজো জড়িত ছিল। রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, দোলযাত্রা ইত্যাদি আদি যুগেরই অবদান। প্রাক-বৈদিক যুগে কোমদের ধর্মোৎসব ছিল ব্রত যা শিবপূজা যা মধুসংক্রান্তি নামেও পরিচিত। কোমদের দেবতা ছিলেন ধর্মঠাকুর। বাংলার কৃষি সমাজে ভাল ফসলের আশায় হোলি উৎসব পালন করা হতো। এ ছাড়া মনসা পূজা, জাঙ্গুলী দেবীর পূজা, পর্ণশবরী শারবোৎসব, ঘটলক্ষ্মী, ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি আর্যপূর্ব কৌম সমাজের অবদান। তবে প্রাক-গুপ্ত যুগে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে বাংলায়। পাল যুগে বৌদ্ধ এবং সেন যুগে ব্রাহ্মণ ধর্মের জয়জয়কার অবস্থা বিরাজ করেছিল। এছাড়া পৌরাণিক ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম (হিন্দু ধর্মের বিশেষ শাখা) ও সহজিয়া ধর্মের প্রভাবও বাংলায় ঘটেছিল।

ব্রাহ্মণ্যবাদ ও হিন্দুধর্ম

আর্যদের বিভিন্ন বিশ্বাস, পূজা-অর্চনাকে কেন্দ্র করেই ব্রাহ্মণধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা দেব-দেবীদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রপাঠ করত, বিভিন্ন ফল, দুধ, ঘি, শস্য, রস, মাংস আহুতি দিত। মূলত দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। পরে বলিদান অনুষ্ঠান পালনের জন্য পুরোহিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে এবং সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা বড় হয়ে ওঠেন। সেন আমলেই বাংলায় বৈদিক শ্রেণির ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়। এই রাজবংশের রাজারা মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণদের আনিয়ে তাদের জমি দান করে পূজোঅর্চনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আর্যদের ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে বেদ। এটি লিখিত ছিল না। বহুকাল মানুষ মুখে মুখে যা বহন করে আনে। পরে তা ঋগ্বেদ গ্রন্থ লেখা হয়। বেদ মানে হচ্ছে 'জ্ঞান'। পুরোহিতরা অনেকেই বিশ্বাসের দিক থেকে দেবতার চেয়েও বেশি ক্ষমতার আসন লাভ করে। ব্রাহ্মণদের পবিত্র দায়িত্বকে সমাজে মানুষের জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসে স্থান দেয়ার নামই হচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। এটি একটি ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সমাজে চারটি শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শ্রেণীভেদ প্রথার ফলে ব্রাহ্মণরা বৈশ্য ও শূদ্রদের হেয় জ্ঞান করে। এর থেকেই এক সময় নিম্ন বর্ণের মানুষেরা জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেন যুগে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের স্থান দখল করে নেয়। তবে হিন্দু ধর্ম কোনো একক ধর্ম নয়, এটি অসংখ্য বিশ্বাস, আচার ও আনুষ্ঠানিকতার সমন্বয়ে গঠিত সনাতন ধর্ম। তবে এতে তিনটি বিষয়ে মিল লক্ষ করা যায়- (১) গাভী ভক্তি, (২) আত্মার

পুনর্জন্ম এবং (৩) ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব । হিন্দুধর্ম তিনভাবে দেবত্ব বিশ্বাস করে– (১) স্রষ্টা হচ্ছেন ব্রহ্মা, (২) সংরক্ষক হচ্ছে বিষ্ণু ও (৩) শিব হচ্ছেন ধ্বংসকারী। মানুষ এবং প্রাণির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই বলে বিশ্বাস করা হয়। কেননা, উভয়েরই আত্মা আছে। এ কারণেই গরু, হাতি ও কুমির ইত্যাদি প্রাণিকে হিন্দুধর্মের অনুসারীরা দেবত্বের সম্মান দেন। সেন বংশের রাজত্বকালের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী। বর্মণ বংশের রাজারা ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। নানা বিশ্বাস, বিভাজন, আচার, পূজা, দেবদেবী, লৌকিকতা মিলিয়ে বাংলায় হিন্দুধর্ম ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে যথেষ্ট স্বকীয়তা নিয়ে প্রাচীন যুগের শেষ বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার হিন্দু সমাজের কাছে দুর্গাপূজা সার্বজনীন পূজোৎসব হয়ে আছে।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর-বাংলায় জৈন ধর্মের প্রসার হয়েছিল। আর মৌর্য সম্রাট অশোকের বৌদ্ধধর্ম প্রচার বাংলাদেশের হৃদয় জয় করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি বৌদ্ধ শ্রমণেরা বাংলাদেশ ভ্রমণ করেন। পঞ্চম শতকের গোড়ায় চীনের বৌদ্ধ শ্রমণ ফা-হিয়েন বাংলায় এসেছিলেন। হিউয়েন সাঙ বাংলায় এসেছিলেন আনুমানিক ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তিনি দেখেছেন, সমতটের ত্রিশটি বিহারে দু-হাজার শ্রমণের বাস। অষ্টম শতকে পাল যুগে বাংলাদেশের বৌদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বহুখ্যাত বৌদ্ধবিহারগুলো ঐ পর্বের বৌদ্ধধর্ম ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে। আচার্যগণ জ্ঞান-সাধনা এবং গ্রন্থ রচনা করেছেন যার অধিকাংশই তিব্বতি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্মেরও রূপ বদলে সহজিয়া পরিচয় লাভ করেছে। বাংলার আউল-বাউলরা বাংলার সেই সহজিয়া ধর্মেরই ধারক-বাহক। সেন-বর্মণ পর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনেক দিনের। ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের বলেছেন 'পাষণ্ড' যা সংঘর্ষের প্রমাণ। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছিল। বৌদ্ধ বিহারে এর পরেও যা অবশিষ্ট ছিল, বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে তুর্কি আক্রমণের মুখে তাও ধুয়ে মুছে গেল।

শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতি

প্রাচীন বাংলার শিল্পকর্ম

বাংলার শিল্পকলার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত। বাংলার শিল্পরীতির প্রাচীন ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে। ধর্মীয় স্থাপত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিহার। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত বিহারগুলো ছিল মূলত ভিক্ষুসংঘের বাসগৃহ। প্রত্ন-খননের ফলে মুর্শিদাবাদের রাঙ্গামাটির নিকটে, উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে এবং কুমিল্লার ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলে কতকগুলো বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে বাংলার অন্যতম প্রাচীন নগর পুণ্ড্রনগর। এখানে বাংলার প্রাচীন যুগের জীবনযাত্রার নানা নিদর্শন মেলে। প্রাচীনযুগের ভাস্কর্য, পোড়ামাটির ফলক ও স্থাপত্য নিদর্শন উৎঘাটিত হয়েছে।

আট শতকে ধর্মপাল বরেন্দ্রীতে এক বিশাল ও সুউচ্চ মন্দির স্থাপনের লক্ষ্যে সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন বলে অনুমান করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ এই বৌদ্ধ বিহারের স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নির্মাণশৈলীতে এ যুগের শৈল্পিক উৎকর্ষের প্রমাণ পাওয়া যায়। পাহাড়পুর বর্তমান নওগাঁ জেলার বদলগাছি থানায় অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাংশের সবচেয়ে বড় প্রত্নস্থল ময়নামতি। সাত থেকে এগারো শতকের মধ্যে লালমাই পাহাড়কে ঘিরে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বৌদ্ধ সভ্যতার কেন্দ্র। এখানে রয়েছে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার ও ভোজবিহার। খড়্গ, দেব ও চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কীর্তি আমাদের ইতিহাসে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। দেব রাজাদের রাজধানী দেবপর্বত লালমাই এলাকাতেই অবস্থিত ছিল। ময়নামতির প্রত্নসামগ্রী দক্ষিণ পূর্ব বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে নতুন তথ্য সরবরাহ করেছে।

মেদিনীপুর জেলার তমলুকের প্রত্ননিদর্শনাদি প্রাচীন বন্দরনগরী তাম্রলিপ্তি বলে সনাক্ত হয়েছে। তাম্রলিপ্তিকে অনেকেই গ্রিক, লাটিন বিবরণীর "গাঙ্গে" বন্দর বলে মনে করেন। মুর্শিদাবাদ জেলার রাজবাড়িডাঙ্গায় আবিষ্কৃত হয়েছে রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ, আর এই ধ্বংসাবশেষের পাশেই ছিল শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ। পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বানগড় বহন করছে অধিষ্ঠান কোটিবর্ষ নগরের চিহ্ন।

তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা : ওয়ারী-বটেশ্বরের আবিষ্কার

ওয়ারী-বটেশ্বর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক বীরভূম ও বর্ধমান জেলার অজয়, কুনুর ও কোপাই বঙ্গেশ্বর নদীর তীরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ অঞ্চলে তাম্র যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহ থেকে বলা যায় যে, প্রায় ৩০০০ বছর আগে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও মধ্য অঞ্চলে যে সভ্য জাতির বাস ছিল তার সমসাময়িক কালে বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলেও উন্নত সভ্যতা ছিল।

বাংলাদেশের নতুন প্রত্নস্থলের নাম ওয়ারী-বটেশ্বর। ঢাকা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলায় ওয়ারী বটেশ্বরের অবস্থান। প্রত্নতত্ত্ববিদ দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর ভাষ্য অনুসারে সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তী কিছু নিদর্শন এখানে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরীর মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায় ওয়ারী বটেশ্বরকে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে মতভেদ থাকলেও সবাই মনে করছেন প্রাচীন সভ্যতার নতুন দিক উন্মোচিত হতে চলেছে। খনন ও গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস হয়ত ভবিষ্যতে নতুন করে লিখতে হবে।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মন্দির ও টেরাকোটা ফলক

বাংলাদেশের শিল্পকলার ঐতিহ্য প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো। স্থাপত্য বা স্তুপ হলো বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। বৌদ্ধগণই স্তূপ-নির্মাণের রীতিকে গ্রহণ করে পূজা-অর্চনায় এবং ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে এ রীতিকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেছেন। বৌদ্ধ-প্রধান অঞ্চল ময়নামতিতে দশ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত স্তূপ পাওয়া গেছে। বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট রীতির স্থাপত্য-নিদর্শন হল মন্দির। ময়নামতিতে মন্দিরের জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যাচ্ছে। শালবন বিহারের কেন্দ্রিয় মন্দিরটির প্রত্যেক বাহু ১৭০ ফুট দীর্ঘ। প্রাচীন যুগের কয়েকটি মন্দিরই জীর্ণ ও ভগ্ন শরীরে বিদ্যমান।

পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলক

প্রাচীন বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি ভাস্কর্য শিল্পের চর্চাও হতো। মহাস্থান, তমলুক ইত্যাদি স্থানে গুপ্ত যুগের আগের কিছু মূর্তি পাওয়া গেছে। পাহাড়পুরের ভাস্কর্যে রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহিনী খোদিত আছে। প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটির কাজ জনপ্রিয় ছিল। কাদামাটি দিয়ে নির্দশন তৈরি করে রোদে শুকিয়ে পোড়ালে পরিবর্তিত যে রূপ তাকে আমরা সাধারণত পোড়ামাটির কাজ বলি। নাগরিক জীবনে এ পোড়ামাটির ল্যাটিন প্রতিশব্দ 'টেরাকোটা' শব্দটি ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে ওঠছে। প্রচলিত অর্থে টেরাকোটা বলতে মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির পুতুল ও ক্ষুদ্রাকার অস্থাবর ফলক এবং দেয়ালগাত্রে অলংকরণের জন্য পোড়ামাটির ফলককে বুঝানো হয়। ময়নামতি, পাহাড়পুর ও ভাসুবিহারের মতো ধর্মীয় চেতনায় নির্মিত স্থাপত্য দেয়ালের টেরাকোটা ফলককে লোকায়ত জীবনের উপস্থাপনা, মানবিক কল্পনা ও অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ ওয়ারী-বটেশ্বর এর উপর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট সংগ্রহ করবে এবং নিজেদের মধ্যে এসব বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বাংলায় নানা ধরনের ধর্ম প্রচলিত ছিল। প্রাক-বৈদিক যুগে কোমদের ধর্মোৎসব ছিল শিবপূজা। প্রাক গুপ্ত যুগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার ঘটে। পাল যুগে বৌদ্ধ এবং সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার দেখা যায়। এ সময়ের বাংলার শিল্পকর্মে যেমন ভাস্কর্য, টেরাকোটার সন্ধান পাওয়া যায়। তেমন এর মাধ্যমে লোকায়ত জীবনের উপস্থাপনা, কল্পনা, ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। শিল্পকর্মের সবচেয়ে বড় নিদর্শন মহাস্থানগর। ওয়ারী বটেশ্বরে পাওয়া গেছে আরো প্রাচীন নিদর্শন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পাল যুগে কোন ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে?
ক) ব্রাহ্মণধর্ম খ) বৌদ্ধধর্ম
গ) জৈনধর্ম ঘ) খ্রিষ্টানধর্ম

২। দেব পর্বত কোথায় অবস্থিত?
ক) পুন্ড্রনগরে খ) চন্দ্রদ্বীপে
গ) পাহাড়পুরে ঘ) ময়নামতিতে

৩। ওয়ারী বটেশ্বর আবিষ্কার, প্রমাণ করে–
i) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল গ্রাম কেন্দ্রীক
ii) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল নগর ভিত্তিক
iii) প্রাচীন বাংলার সভ্যতা ছিল উন্নত সভ্যতার ধারক

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। কুমিল্লা জেলার কোথায় ব্রোঞ্জ নির্মিত স্তূপ পাওয়া গেছে?
ক) মোহনপুরে খ) মুরাদনগরে
গ) রামচন্দ্রপুরে ঘ) ময়নামতিতে

৫। হিউয়েন সাঙ বাংলায় এসেছিলেন কবে?
ক) ৬০৬ খ্রিঃ খ) ৬১৯ খ্রিঃ
গ) ৬৩৭ খ্রিঃ ঘ) ৬৩৯ খ্রিঃ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ ৪. খ ৫. ক ৬. গ ৭. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ ঃ ১. খ ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ঘ

মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

ইউনিট ৬

ভূমিকা

তের শতক থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলায় যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল তা ছিল রাজতান্ত্রিক। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী । যার ফলে বাংলায় মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমাগতভাবে মুসলিম সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে থাকে। তবে তখন সুলতানি বা নবাবি শাসন ইত্যাদি যে নামে বাংলাকে পরিচিত করা হোক না কেন দেশটা চলত একজন শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। এখানে সরকার বলতে সুলতান বা রাজাকে বুঝানো হতো। তাদের ছিল একক কর্তৃত্ব। আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার তুলনায় মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বৈরতান্ত্রিক, এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক, অগণতান্ত্রিকও। রাষ্ট্র শাসনে ধর্মীয় প্রভাব একচ্ছত্র ছিল। তবে পৃথিবীর সব দেশ বা জাতি মধ্যযুগীয় সামন্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পার হয়েই আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পৌঁছেছে। বাংলাকেও আমরা তের শতক থেকে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাই নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠতে দেখেছি। এই ইউনিটে মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ বখতিয়ার খলজি ও বাংলায় তুর্কি শাসন
পাঠ-৬.২ ঃ ইলিয়াস শাহ্ ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন
পাঠ-৬.৩ ঃ হোসেন শাহী বংশের অধীনে বাংলা
পাঠ-৬.৪ ঃ বাংলায় মোগল শাসন ও বার ভূঁইয়া

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৬.১ বখতিয়ার খলজি ও বাংলায় তুর্কি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বখতিয়ার খলজির জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয় সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- বখতিয়ার পরবর্তী খলজি ও তুর্কি শাসন সম্পর্কে বর্ণনা পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বখতিয়ার খলজি, নদীয়া, লখনৌতি, ইওয়াজ খলজি, গিয়াসউদ্দিন বলবন, তুগ্রিল খান।

বখতিয়ার খলজির জীবন সংগ্রাম ও উত্থান

ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি তের শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশের একাংশে (প্রধানত নদীয়ায়) মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম ধর্মের মোড়কে বাংলায় মুসলিম সভ্যতার আগমন এ দেশের ঐতিহ্যবাহী সমাজ, সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক জীবনধারায় গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। সূচিত হয় এক গভীরতর সাংস্কৃতিক সমন্বয়-সংঘাতের ধারা।

বাংলাদেশ (মধ্য যুগ)

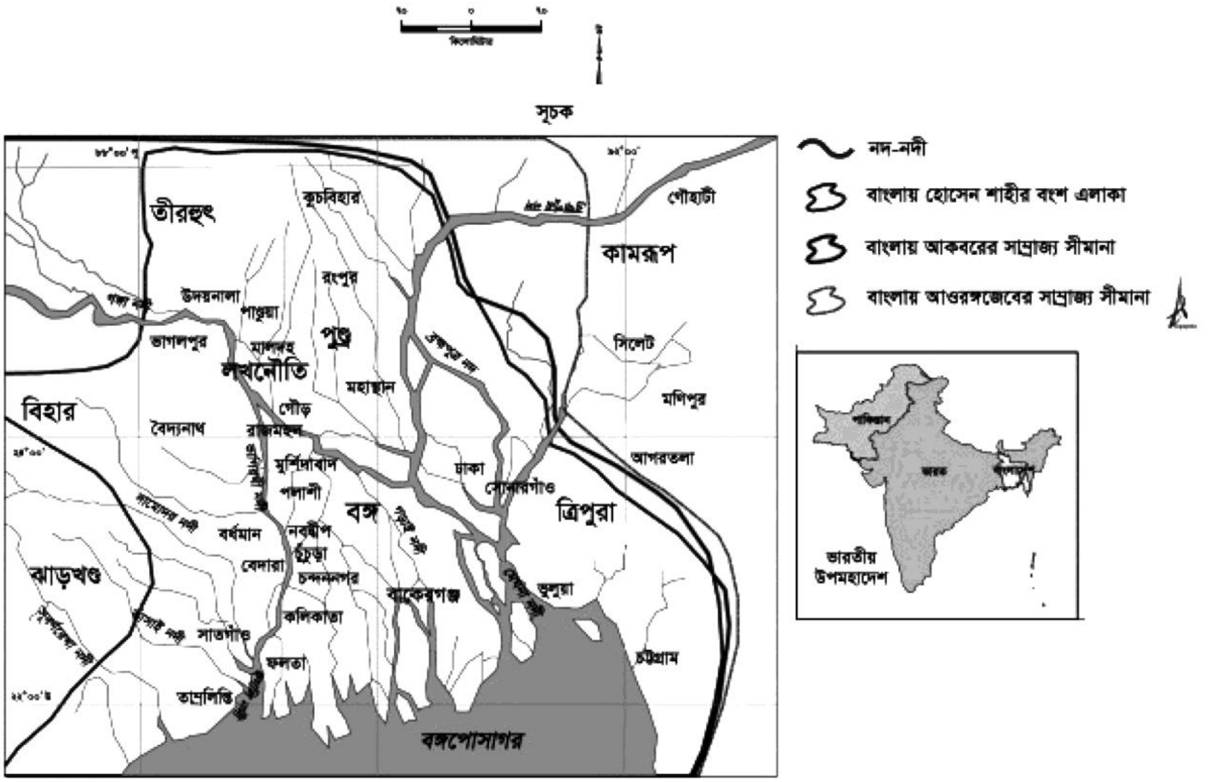

বখতিয়ার খলজি আফগানিস্তানের গরমশীরের (দস্ত-ই-মার্গ) অধিবাসী ছিলেন। প্রথমে তিনি গজনিতে উপস্থিত হয়ে শিহাবউদ্দীন ঘুরীর অধীনে সৈন্যবিভাগে চাকুরি প্রার্থী হন। তবে শারীরিক কারণে তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়। গজনিতে বিফল হয়ে তিনি দিল্লিতে চলে যান এবং সেখানকার শাসনকর্তা কুতবউদ্দীন আইবেকের কাছে চাকুরি প্রার্থী হন। কিন্তু কুতবউদ্দীন আইবেকও তাঁর কদাকার চেহারার জন্য তাঁকে সৈন্যবিভাগে চাকুরি দিলেন না। অতঃপর বখতিয়ার বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দীন তাঁকে নগদ বেতনে একটি ছোট চাকুরি দেন। তবে অল্প বেতনের এ ছোট চাকুরিতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই তিনি চলে গেলেন অযোধ্যায়। অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসামউদ্দীন বখতিয়ার খলজিকে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করেন এবং তাঁকে বিউলী ও ভাগওয়াত নামে দুটি পরগনার জায়গির প্রদান করে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় পাঠিয়ে দেন। মির্জাপুরে জায়গির প্রাপ্তির ফলে বখতিয়ার খলজির জীবনের মোড় ঘুরে যায়। কারণ, এ অঞ্চলই তাঁর শক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠে। এই সময়ে তাঁর সাহস আর উদ্যমের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে চারদিক থেকে ভাগ্যান্বেষণকারী মুসলমানগণ বখতিয়ার খলজির সাথে যোগ দিতে থাকে ও তাঁর সৈন্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

বিহার আক্রমণ ও নদীয়া বিজয়

বখতিয়ার খলজি শক্তি সঞ্চয় করে আনুমানিক ১২০৩ সালে বৌদ্ধদের একটি আশ্রম ওদন্তপুরি বিহার আক্রমণ করেন। এটি ছিল বৌদ্ধদের বিহার বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত থাকায় বখতিয়ার খলজি আশ্রমটিকে দুর্গ মনে করে অবরোধ করেন এবং বিনা পরিশ্রমেই এটি অধিকার করেন। এ বিহারের নামানুসারেই মুসলমানগণ এ অঞ্চলের নাম দেন বিহার। আজও এ অঞ্চল বিহার নামেই পরিচিত।

বখতিয়ার খলজি বিহার দখল করার পর বাংলার দৃষ্টি দেন। এ সময় বাংলার রাজা ছিলেন সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন। তিনি তখন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। মতভেদের প্রধান কারণ হলো যে, সমসাময়িক সূত্রে নদীয়া আক্রমণের তারিখ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকগণ সবদিক বিচার করে বলছেন বখতিয়ার খলজির ১২০৪-০৫ সালে শীতকালীন সময়ে নদীয়া আক্রমণ করেছিলেন।

বখতিয়ার খলজি যখন বাংলা বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তখন বাংলাদেশে প্রবেশ সহজ সাধ্য ছিল না। তখন বাংলাদেশে প্রবেশের তিনটি পথ ছিল যথা : ত্রিহুতের পথ, তেলিয়াগার্হির পথ ও ঝাড়খণ্ডের পথ। ত্রিহুতের পথে কয়েকটি খরস্রোতা নদী থাকায় এ পথে কোনো অভিযান পরিচালনা করা খুবই কঠিন ছিল। তেলিয়াগার্হির পথও ছিল বেশ সংকীর্ণ। তবে এ পথেই তখন সাধারণত উত্তর ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশে প্রবেশ করত। তৃতীয় পথটি ছিল ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়ে এবং সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল। বাংলাদেশে প্রবেশের পথসমূহের বৈশিষ্টাবলি বিবেচনা করে বাংলাদেশের রাজাগণ তেলিয়াগার্হির পথকেই বিশেষভাবে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করতেন। বখতিয়ার খলজি শুধু দুর্ধর্ষ যোদ্ধাই ছিলেন না, তিনি একজন কৌশলী সমরবিদও ছিলেন। তাই তিনি তেলিয়াগার্হির পথে না এসে ঝাড়খণ্ডের দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। তিনি বিরাট বাহিনীকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে নিজে একটি ছোট দলের অগ্রভাগে ছিলেন। কথিত আছে যে, বখতিয়ার খলজি এতই ক্ষিপ্রতার সাথে অগ্রসর হয়েছিলেন যে, তাঁর সাথে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক তাল রেখে আসতে পেরেছিলেন। ফলে তিনি যখন নদীয়া পৌঁছলেন, তখন লোকেরা ভাবল যে, কিছু ঘোড়াব্যবসায়ী হয়ত রাজ দরবারে যাচ্ছে। বখতিয়ার খলজি কোথাও কোনো বাধা না পেয়ে সোজা রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে গিয়ে উপস্থিত হন। ফলে প্রাসাদ-রক্ষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল এবং যে যেদিকে পারল ছুটে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করতে লাগল। ইতোমধ্যে বখতিয়ার খলজির মূল সৈন্যবাহিনীও শহরের ভেতরে পৌঁছে যায়। এ সময় রাজা লক্ষ্মণ সেন মধ্যাহ্ন ভোজনে বসেছিলেন। খবর পেয়ে তিনি ধরে নেন যে, তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছে। তাই তিনি খালি পায়ে পেছনের দরজা দিয়ে বের হয়ে নদীপথে পূর্ব-বাংলার বিক্রমপুরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। লক্ষ্মণ সেনের বিপুল ধন-সম্পদ বখতিয়ার খলজি লাভ করেন। এভাবে নদীয়া অধিকারে করেন বখতিয়ার খলজি।

লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন ও তিব্বত আক্রমণ

নদীয়া দখলের পর বখতিয়ার খলজি গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর দিকে যাত্রা করেন। তিনি লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন । এটি মুসলমান আমলে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। বাংলাদেশে বখতিয়ার খলজি রাজ্য পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী ও উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হয়ে রংপুর শহর অবধি ছিল। বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ কাজ তিব্বত আক্রমণ। তবে এ অভিযান সফল হয়নি।

বখতিয়ার খলজির একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি ছিলেন। অতি সাধারণ অবস্থা থেকেই তিনি অল্প সময়ের মধ্যে নিজ প্রতিভাবলে লখনৌতিতে মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ মুসলিম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর জীবনের বড় কৃতিত্ব। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের মতে, তিনি কর্মঠ, নির্ভীক, সাহসী, বুদ্ধিমান, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিজিত এলাকায় খুতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন এবং সমগ্র এলাকাকে তাঁর সহকর্মী তুর্কি খলজি আমীরদের মধ্যে ভাগ করে দেন।

পরবর্তী খলজি শাসন

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর খলজি মালিকদের মধ্যে কলহ শুরু হয় । এরপর তিনজন শাসক স্বল্প সময়ের জন্য বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১২-১২২৭ খ্রি.) বাংলার শাসন, প্রশাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখেন। তিনি বাংলার মুসলিম রাজ্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এই নবগঠিত রাজ্যের সীমানা বিস্তারে অবদান রাখেন। নদীমাতৃক বাংলায় যুদ্ধ জয়ের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাঙালি নাবিকদের সহায়তায় যুদ্ধ জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি সুশাসক হিসেবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি দিনাজপুরের দেবকোট থেকে লখনৌতিতে আবার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, একই সঙ্গে একটি দুর্গ স্থাপন করে রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি পূর্ববাংলা আক্রমণ করে সেখানে তার আধিপত্য বিস্তৃত করেন। বলা চলে বাংলায় তিনি দিল্লির সমান্তরাল আর একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন যা দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের পছন্দ হয়নি। ইলতুতমিশ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদকে ইওয়াজ খলজির বিরুদ্ধে লখনৌতিতে

প্রেরণ করেন। যুদ্ধে ইওয়াজ খলজি পরাজিত ও পরে নিহত হন। তখন ইলতুতমিশ নাসির উদ্দিন মাহমুদকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এর ফলে ১২২৭ সালে বাংলা দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বাংলায় তুর্কি শাসন

এ সময় থেকে বাংলার শাসনকর্তারা দিল্লির সুলতানদের কাছ থেকে নিয়োগ লাভ করে এখানকার শাসক হতেন। তাদের মধ্যে অধিকাংশই জাতিগত পরিচয়ে তুর্কি ছিলেন। ১২২৭ থেকে ১২৮১ সাল পর্যন্ত তেমন ১৫ জন তুর্কি শাসক বাংলা শাসন করেছিলেন। তবে বাংলায় দিল্লির অনুগত কোনো শাসনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং দিল্লির মনোনীত তুর্কি শাসকরাই একের পর এক বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। দিল্লির শাসকরা যেমন, ইলতুতমিশ, বলবন, গিয়াসউদ্দিন তুঘলক ও মুহাম্মদ বিন তুঘলক বাংলার শাসকদেরকে প্রতিহত করতে একের এর এক অভিযান চালিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। এর ফলে দিল্লির শাসনকালে বাংলায় বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ লেগেই ছিল। দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাংলার তৎকালীন স্বাধীন শাসক তুগ্রিল খানকে দমনের জন্য নিজেই আক্রমণ (১২৮০-৮১ খ্রি.) করেন। যুদ্ধে তুগ্রিল খান নিহত হন। ফলে বাংলা দিল্লির শাসনাধীন হয়।

১২৮৭ সালে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মারা গেলে বঘরা খান নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে ১২৯০ সাল পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন সুলতান হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৩২৫ সালে দিল্লির শাসক গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা অধিকার করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ বখতিয়ার খলজির সংগ্রামমুখর জীবন এবং তার বাংলা বিজয়ের উপর একটি সচিত্র গল্প রচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে প্রথম মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি। যদিও তার জীবনে অনেক প্রতিকূল পথ পেরিয়ে সফল হন। নদীয়া দখল করে লখনৌতিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর খলজি বংশের শাসন দুর্বল হতে শুরু করলে ১২২৭ সাল থেকে বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। (কোন তুর্কি বীর) বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন কে?

ক) বখতিয়ার খলজি খ) আলী মর্দান খলজি
গ) শিরান খলজি ঘ) ইওয়াজ খলজি

২। বখতিয়ার কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?

ক) পাকিস্তান খ) আফগানিস্তান
গ) ইরান ঘ) তুরস্ক

৩। বখতিয়ার কুতুবউদ্দিনের সৈন্য বিভাগে চাকুরি লাভে ব্যর্থ হন কোন অবস্থার জন্য?

ক) শারীরিক খ) মানসিক
গ) অর্থনৈতিক ঘ) সামাজিক

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আজ ২২ নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস, এদিন চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এলাকায় বেশ কিছু সমরাস্ত্রসহ যুদ্ধ জাহাজ জনগণের জন্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়। আয়েশা দাদুর সাথে নৌবাহিনীর কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ ঘুরে ঘুরে দেখে। এসময় তার মধ্য যুগের এক খলজি শাসকের কথা মনে পড়ে যিনি নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছিলেন।

৪। উদ্দীপকের আয়শার কোন খলজি শাসকের কথা মনে পড়ে?

ক) বখতিয়ার খলজ খ) শিরান খলজ
গ) গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজ ঘ) আলী মর্দান খলজ

৫। উক্ত শাসকের নীতি ছিল–

i) রাজ্য সম্প্রসারণ
ii) রাজ্যের নিরাপত্তা
iii) ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

হোমারের ইলিয়ড মহাকাব্য থেকে নেওয়া গল্পে নির্মিত চলচিত্রে, ট্রয় নগরীর ধ্বংস দেখছিল আকরাম, এক পর্যায়ে দেখা গেল যুদ্ধের কৌশল হিসেবে একজন সেনাপতি তাঁর যোদ্ধাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছেন। অতঃপর নিজে ১টি ছোট দল নিয়ে জঙ্গলপথে অগ্রসর হয়ে বিপক্ষ দলের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ও দখল করে নেয় যদিও বাকি দলগুলো পেছনেই ছিল।

ক. কোন অভিযান ছিল বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ সমর অভিযান?
খ. ইওয়াজ খলজি তার রাজধানী লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন কেন?
গ. উদ্দীপকের সেনাপতির যে কৌশল গ্রহণ করেছেন তা পাঠ্য বইয়ের কোন সেনাপতির কর্মের প্রতিফলন? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আপনি কী মনে করেন, উক্ত সেনাপতি প্রথম জীবনে ব্যর্থ হলেও ভাগ্য নয় কর্মগুণই তাকে সাফল্য এনে দেয়? যুক্তি দেখান।

পাঠ-৬.২ ইলিয়াস শাহ্ ও বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহ্ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইলিয়াস শাহের রাজ্য জয়, সুশাসন ও ধর্মীয়ক্ষেত্রে উদারনীতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সিকান্দর শাহ্, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্ ও রাজা গনেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইলিয়াস শাহ্, ফিরুজ শাহ তুঘলুক, রাজমালা, বাঙালা, সিকান্দর শাহ, গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, রাজা গণেশ

ইলিয়াস শাহী সুলতানগণ বাংলাদেশে প্রায় ১২২ বছর শাসন করেন। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ সর্বপ্রথম বাংলার বিভিন্ন অংশ একত্রো করেন। এর আগে কোন মুসলমান সুলতান সমগ্র বাংলাদেশকে একত্রো করতে পারেননি। তাই এ আমল থেকেই সমগ্র বাংলাদেশ 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয় এবং অধিবাসীরা পরিচিত হয় 'বাঙালি' নামে। ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ স্থানীয় জনগণের মন জয় করার জন্য উদারনৈতিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁরা জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে যোগ্যতার ভিত্তিতে সবাইকে শাসনকার্যে ও সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করেন। তাঁরা দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের সমাদর এবং দেশীয় কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁদের উদার নীতির ফলে বাংলাদেশে সামাজিক জীবনে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী সুলতানগণ আরবদেশ, চীন ও পারস্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইলিয়াসশাহী আমলে বাংলার কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল।

অবশ্য ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন সূচনার কিছু সময় আগে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগ শুরু হয়। ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৬৩৮ সালে পূর্ব বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী হয় সোনারগাও। একই সময় আলাউদ্দীন আলী শাহ পশ্চিম বাংলায় স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৫২ সালে ইলিয়াস শাহ সোনারগাও দখলের মাধ্যমে দুই বাংলা একত্র করেন।

ইলিয়াস শাহের সিংহাসন লাভ ও রাজ্য বিস্তার

ইলিয়াস শাহ ইরানের অধিবাসী ছিলেন। ইলিয়াস শাহ কীভাবে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। ইলিয়াস লখনৌতির শাসনকর্তা আলী মুবারকের ধাত্রীমাতার পুত্র ছিলেন। পরে আলী মুবারক বাংলাদেশে চলে আসেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খানের প্রধান সেনাপতি হন। কদর খান নিহত হওয়ার পর আলী মুবারক লখনৌতিতে ক্ষমতা দখল করেন এবং ইলিয়াস বাংলাদেশে এসে আলী মুবারকের অধীনে উচ্চ পদে কাজ করেন। কিছুদিন পর ১৩৪২ খ্রিস্টাব্দে ইলিয়াস আলী মুবারককে হত্যা করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইলিয়াস শাহ যখন সিংহাসনে বসেন তখন পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ তার রাজ্যের বাইরে ছিল। তিনি প্রথমে সাতগাও দখল করেন। এরপর ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করেন ও প্রচুর ধন-সম্পদ লাভ করেন। ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে সোনারগাও অধিকার করে সারা বাংলাদেশের সুলতান হন। তাঁর পূর্বে আর কোনো সুলতান এ গৌরব অর্জন করতে পারেননি। তাই ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ তাঁকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' ও 'সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরে ইলিয়াসশাহ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন এবং ৪৪টি হাতিসহ অনেক ধনসম্পদ লাভ করেন। এরপর তিনি বিহার আক্রমণ করেন এবং আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে চম্পারণ, গোরক্ষপুর ও কাশী জয় করে তাঁর রাজ্যভুক্ত করেন।

ফিরুজ শাহ তুঘলকের সাথে দ্বন্দ্ব

ইলিয়াস শাহের সামরিক সাফল্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ দিল্লির সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ সালে বাংলাদেশের দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। ইলিয়াস শাহের নৌবাহিনী দিল্লির বাহিনীকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে। তবে সুলতান ফিরুজ শাহ অন্যপথে অগ্রসর হয়ে কুশী নদী অতিক্রম করেন। এ খবর পেয়ে ইলিয়াস শাহ রাজধানী পাণ্ডুয়ায় ফিরে

একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এ দুর্গটি যেমন ছিল দুর্ভেদ্য তেমনি ছিল দুর্গম। এর তিনদিকে ছিল নদী এবং অন্যদিকে ছিল ঘন জঙ্গল। তাই ইলিয়াস শাহ বুঝেছিলেন যে, দিল্লি বাহিনীর পক্ষে একডালা দুর্গ জয় করা সম্ভব হবে না। ফিরুজ শাহ একডালা দুর্গ আক্রমণ করেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেও দুর্গটি অধিকার করতে পারেননি। অবশেষে ফিরুজ শাহ ইলিয়াস শাহের সাথে সন্ধি স্থাপন করে ফিরে যান। সন্ধির শর্তানুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে পরবর্তিকালে প্রতিবছর দূত ও উপহার বিনিময় হতো। এর ফলে ইলিয়াস শাহের রাজনৈতিক গৌরব বৃদ্ধি পায়।

ত্রিপুরা ও কামরূপ অভিযান

ফিরুজ শাহের প্রত্যাবর্তনের পর ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে মনোনিবেশ করেন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত *রাজমালা* থেকে জানা যায় যে, ত্রিপুরার রাজা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রত্ন-ফাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করেন। কিন্তু, রাজার মৃত্যুর পর অন্যান্য ভাই রত্ন-ফাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাড়িয়ে দেন। রত্ন-ফা বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ইলিয়াস শাহ তাকে পুনরায় ত্রিপুরার সিংহাসন বসান এবং রত্ন-ফাকে মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন। ইলিয়াস শাহ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কামরূপের কিছু অংশ জয় করেন।

সুশাসন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উদার নীতি

ইলিয়াস শাহ সম্ভবত প্রথম সুলতান যিনি স্থানীয় লোকদেরকে অধিক সংখ্যায় সৈন্যবাহিনীতে নিয়োগ করেন। তাঁর রাজত্বকালে হিন্দুরা উচ্চপদে নিয়োগ লাভ করে। তিনি মুসলমান সুফি এবং দরবেশদের মতো হিন্দু সন্ন্যাসীদেরকেও বৃত্তি প্রদান করতেন। শাসনব্যবস্থায় সুলতান সর্বেসর্বা হলেও তাঁর কয়েকজন উপদেষ্টা ছিল। তাঁরা প্রয়োজনে সুলতানকে পরামর্শ দিতেন। তিনিই প্রথম বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল একত্র করে সারা বাংলাদেশের একচ্ছত্র স্বাধীন সুলতান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, ইলিয়াস শাহের রাজত্বকাল থেকেই সারা বাংলাদেশের নামকরণ হয় বাঙালা এবং এর অধিবাসীরা পরিচিতি হয় বাঙালি নামে। ইলিয়াস শাহ একজন অভিজ্ঞ কূটনীতিবিদও ছিলেন। ইলিয়াস শাহ্ যখন দিল্লির বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছে তখন তিনি বীরের মতো যুদ্ধ করেছেন। আবার সুলতান যখন সন্ধির প্রস্তাব করেছেন তখন তিনি তা উপেক্ষাও করেননি। সন্ধি স্থাপনের পর ইলিয়াস শাহ দূত ও উপঢৌকন প্রেরণ করে দিল্লির সুলতানের সাথে মিত্রতা রক্ষা করেন।

সিকান্দর শাহ ও গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ

ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দর শাহ ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রায় ৩৪ বছর রাজত্ব করেন। তাঁর এ সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলাদেশে মুসলিম শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সিকান্দর শাহ সুশাসক ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন । তিনি সুফি ও দরবেশদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। সুফি শেখ আলাউল হক ও শেখ শরফউদ্দীন ইয়াহিয়ার সাথে সিকান্দর শাহের সৌহার্দ্য ও পত্রালাপ ছিল। তাঁর রাজত্বকালে স্থাপত্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয় এবং তার সময় তৈরি আদিনা মসজিদ মধ্যযুগের বাংলার স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

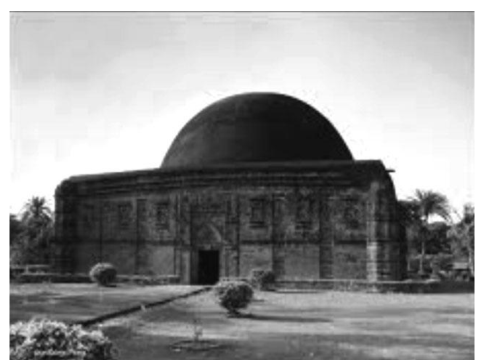
আদিনা মসজিদ

গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ ১৩৯০–৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাংলার ইতিহাসে তাঁর রাজত্বকাল নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্যাতি ও সাফল্যের বিচারে তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ নিজে বিদ্বান ছিলেন। তিনি বিদ্বান, কবি ও সাহিত্যিকদের সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি ফার্সি ভাষায় কবিতা লিখতেন। ইরানের কবি হাফিজের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি হাফিজকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেই প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর কাব্য *ইউসুফ জোলেখা* রচনা করেন। গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ তাঁর পিতা ও পিতামহের মতই মুসলমান সুফি ও দরবেশদেরকে ভক্তি করতেন। তাঁর সমসাময়িক সুফিদের মধ্যে শেখ

নূর কুতব আলম প্রসিদ্ধ ছিলেন। চৈনিকসূত্র থেকে জানা যায় যে, গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ চীন সম্রাটের নিকট দূত ও উপহার পাঠিয়েছিলেন। চীন সম্রাটও বাংলাদেশের সুলতান ও তাঁর স্ত্রীর জন্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

রাজা গণেশ ও ইলিয়াসশাহী বংশের শাসন (দ্বিতীয় পর্ব ১৪৩৬-১৪৮৭)

ইলিয়াসশাহী বংশের প্রথম পর্বের শাসনের পর বাংলার সিংহাসনে রাজা গণেশের উত্থান ছিল আকস্মিক ও বিস্ময়কর। একজন জমিদার হিসেবে বাংলার সুলতানের দরবারে তাঁর প্রভাব ও আসা-যাওয়া ছিল। তিনি সুলতানের একজন ঘনিষ্ঠ আমাত্য ছিলেন। শিহাবুদ্দিন নিহত হলে সৃষ্ট শূন্যতার সুযোগে তিনি বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। গণেশের শাসনের শুরুতেই মুসলিম দরবেশদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। দরবেশদের নেতা নূর কুতুব-উল-আলমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করেন। রাজা গণেশ নতি স্বীকার করে কুতুব-উল-আলমের সঙ্গে আপস করেন। এরফলে গণেশের পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দিন মাহমুদ শাহ নাম ধারণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি পণ্ডুয়া থেকে রাজধানী গৌড়ে নিয়ে যান। ১৪৩১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার ছেলে শামসুদ্দিন আহমদ শাহ ক্ষমতায় বসেন। তার ৫ বছর শাসনের ফলে সকলে তার প্রতি হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় ১৪৩৬ সালে সাদী খান ও নাসির খান নামক সুলতানের দুজন ক্রীতদাস তাকে হত্যা করেন। তারা ক্ষমতা দখল করলে অভিজাত ব্যক্তিরা বিদ্রোহ করেন। সাদী খান ও নাসির খানকেও হত্যা করা হয়। এর ফলে গণেশের বংশধরদের শাসনের ইতি ঘটে। অভিজাতদের গৃহযুদ্ধের এই সংকটকালে ১৪৩৬ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের প্রপৌত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। শুরু হয় ইলিয়াসশাহী বংশের দ্বিতীয় পর্বের শাসন যা ১৪৮৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ প্রথম বাঙালি মুসলিম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীরের কবিতাংশ সংগ্রহ করবেন এবং এর উপর দলবেঁধে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

এই দেশে শাহ-ই-বাঙ্গালাহ খ্যাত সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলাকে একত্র করেন। তার সময় থেকে বাঙালা ও জনগণ বাঙালি হিসেবে পরিচিত হয়। তিনি ছিলেন উদার, সব ধর্মের মানুষের প্রতি তার সম্মান দৃষ্টি ছিল। তার মৃত্যুর পর সিকান্দার শাহ ও গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ সিংহাসনে বসেন। এই সময় বাংলায় রাজা গণেশ নামক এক জমিদার ও আমাত্য স্বল্প সময়ের জন্যে বাংলার শাসক হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন ঐতিহাসিক ইলিয়াস শাহকে “শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্” উপাধিতে ভূষিত করেন

ক) মিনহাজ উস সিরাজ খ) জিয়াউদ্দিন বারানি

গ) শামস সিরাজ আফীফ ঘ) আবুল ফজল

২। শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ কেমন ছিলেন?

ক) জ্ঞানী খ) অদক্ষ

গ) অযোগ্য ঘ) বিচক্ষণ

৩। “গিয়াস উদ্দিন” এই উপাধি গ্রহণ নিচের কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথার্থ?

ক) ইলিয়াস শাহ খ) আজম শাহ

গ) ফিরোজ শাহ ঘ) মোবারক শাহ

পাঠ-৬.৩ হোসেন শাহী বংশের অধীনে বাংলা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- হোসেন শাহী বংশের সময় কেন বাংলার স্বর্ণ যুগ ছিল সে বিষয়ে বলতে পারবেন।
- বাংলায় আফগান শাসন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, হাবশি, স্বর্ণযুগ, নৃপতি তিলক, শ্রী চৈতন্য

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ

বাংলাদেশের ইতিহাসে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এক উজ্জল অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি সামান্য অবস্থা থেকে নিজ যোগ্যতায় বাংলাদেশে হাবশি শাসনের অবসান ঘটিয়ে হোসেন শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জনপ্রিয় সুলতান ছিলেন এবং তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশের জনস্মৃতিতে বহুকাল ছিল। তিনি আরবদেশীয় ও সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। তিনি মক্কা থেকে বাংলাদেশে এসে নিজ প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা গুণে হাবশি সুলতান মুজাফফর শাহের রাজত্বকালে উজীর পদ লাভ করেন। মুজাফফর শাহের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে প্রধান প্রধান অমাত্য ও সৈন্যরা তাঁকে হত্যা করে সবাই মিলিত হয়ে হোসেন শাহকে সুলতান মনোনীত করেন। ১৪৯৩ সালে হোসেন শাহ 'আলাউদ্দীন হোসেন শাহ' উপাধি গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। একারণে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে মধ্যযুগের 'গোপাল' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য জয়

সিংহাসনে আরোহণ করার পর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি হাবশিদের প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাদের পরিবর্তে সৈয়দ, আফগান, মোঙ্গল ও হিন্দুদেরকে উচ্চ রাজ পদে নিযুক্ত করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তিনি অভিজ্ঞ রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং তাদেরকে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদান করেন। তিনি রাজধানী দিনাজপুর জেলার একডালায় নিয়ে আসেন।

জৌনপুরের বিতাড়িত সুলতান হোসেন শর্কীকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে দিল্লির সুলতান সিকান্দর লোদী ক্রুদ্ধ হয়ে ১৪৯৫ সালে হোসেন শাহের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তবে শেষ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধ হয়নি। দুপক্ষই সন্ধি স্থাপন করে। সন্ধিতে উভয়পক্ষই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, কেউ কারো শত্রুকে আশ্রয় দিবে না। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সমগ্র উত্তর বিহার এবং দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। তিনি ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে কামতা রাজ্য আক্রমণ করে দখল করেন। এরপর তিনি কামরূপ আক্রমণ করেন। কিন্তু তাঁর এ অভিযান ব্যর্থ হয়। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ উড়িষ্যায় অভিযান পরিচালনা করেন। ত্রিপুরার রাজামালা থেকে জানা যায় যে, তিনি ত্রিপুরার কিছু অংশ অর্থাৎ বর্তমান কুমিল্লা জেলা অধিকার করেছিলেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ আরাকান অভিযানেও তিনি সাফল্য লাভ করেন। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অধিকার করেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ও বাংলার স্বর্ণযুগ

সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ প্রজাদের কল্যাণের জন্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতেন। তিনি গরিব-দুঃখীদের জন্যে দেশে অনেক লঙ্গরখানা স্থাপন ও পানির কূপ খনন করেন। শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে তিনি উদার নীতি গ্রহণ করেন।

তিনি মুসলমান ও হিন্দুদেরকে সমান চোখে দেখতেন এবং যোগ্যতানুসারেই সব সম্প্রদায়ের লোককে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করতেন। হিন্দু রাজকর্মচারীদের মধ্যে উজীর পুরন্দর খান, মন্ত্রী রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী, সেনাপতি গৌর মল্লিক, রাজচিকিৎসক মুকন্দ দাস, দেহরক্ষী কেশবছত্রী, টাকশালের অধ্যক্ষ অনুপ-এর নাম জানা যায়। হিন্দু লেখকগণ আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সুশাসনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'নৃপতি তিলক', 'জগৎভূষণ', 'কৃষ্ণাবতার' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করেন।

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি বহু মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খানকাহ নির্মাণ করেন। তিনি সুফি ও দরবেশদেরকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি পাণ্ডুয়াতে শেখ নূর কুতব আলমের দরগাতে বহু অর্থ দান করেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যদেবকে সম্মান করতেন এবং তাঁকে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে সুবিধা দিয়েছিলেন। হোসেন শাহ বাংলা সাহিত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করে বাংলা ভাষাকে রাজদরবারে স্থান দেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বহু আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

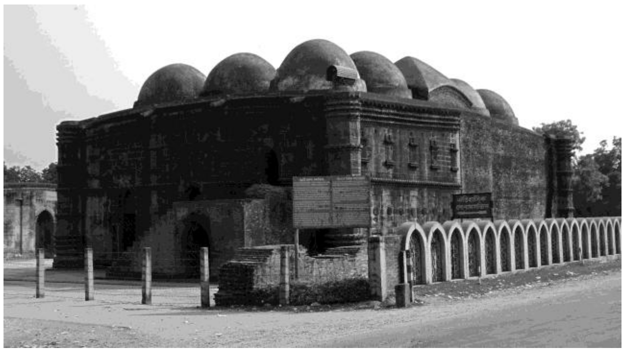

বড় সোনা মসজিদ, গৌড়

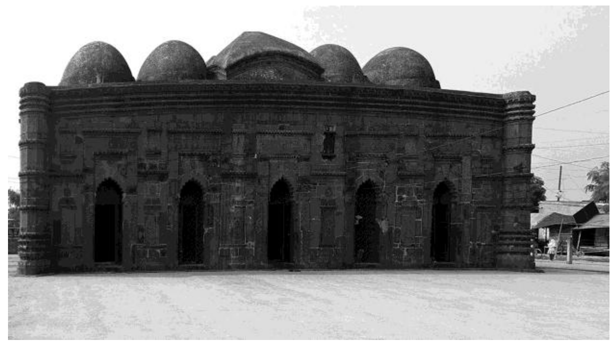

ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়

বাংলাভাষায়ও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। যেমন রূপ গোস্বামী সুলতানের উৎসাহে বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নামে দুটি বই লেখেন। এ সময়ে বিজয়গুপ্ত পদ্মপুরাণ বা মনসা মঙ্গল, বিপ্রদাস মনসা বিজয় এবং যশোরাজ খান শ্রীকৃষ্ণ বিজয় কাব্য রচনা করেন। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ বিজয় নামে আর একটি কাব্যও রচনা করেন। তাঁর রাজত্বকালে নির্মিত মসজিদসমূহের মধ্যে গৌড়ের 'ছোট সোনা' মসজিদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

ড. আবু মুহাম্মদ হবিবুল্লাহ-এর মতে মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিহাসে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। দীর্ঘ ২৬ বছর রাজত্ব করার পর আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলায় আফগান শাসন

১৫৩৮ সালে শেরখান গৌড় জয় করে বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। আফগানরা ৩৮ বৎসর বাংলায় শাসন করে, এর মধ্যে মাত্র নয় মাস মোগল সম্রাট হুমায়ুন গৌড় অধিকার করেন। তবে শেরখান (শেরশাহ) যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসনও অধিকার করেন। অতএব শেরশাহ ও তাঁর ছেলের সময়ে বাংলাদেশ দিল্লির একটি প্রদেশে পরিণত হয় । তবে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহের ছেলে ইসলাম শাহের (সলীম শাহ নামেও পরিচিত) মৃত্যুর পর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায় এবং সেই থেকে মোগল বিজয় পর্যন্ত স্বাধীন থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণের আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে নির্মিত গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের একটি ছবি আঁকতে হবে

সারসংক্ষেপ

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বাংলায় হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আরাকান ও চট্টগ্রাম দখল করেন। তার সময়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হতো। তিনি বাংলাকে রাজদরবারের ভাষা হিসেবে স্থান দেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজও করেন। যে কারণে তাকে নৃপতি তিলক, জগৎভূষণ, কৃষ্ণাবতার বলা হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোন শাসককে নৃপতি তিলক উপাধিতে ভূষিত করা হয়?

ক) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ খ) আলাউদ্দিন আলী শাহ

গ) ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ঘ) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ

২। হোসেন শাহ কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন কেন? (অনুধাবন)

ক) সুনামের জন্য খ) খ্যাতি লাভের জন্য

গ) উৎসাহ প্রদানের জন্য ঘ) সম্মান প্রদর্শনের জন্য

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

পুকুর পাড় গ্রামের মাতবর মোশাররফ সাহেব নিজ কাজের জন্য সকলের নিকট প্রিয়। উক্ত গ্রামে হিন্দু মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা থাকে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানে। মাতবর সাহেব নিজে মুসলমান হলেও যোগ্যতা অনুসারে হিন্দু ধর্মবলম্বীদেরও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। তার এ ধরনের উদ্যোগের ফলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সুবাতাস বইছিল।

৩। উদ্দীপকের মোশারফ সাহেবের কাজে মধ্যযুগের কোন সুলতানের কাজের প্রতিফলন দেখা যায়–

ক) আলাউদ্দিন হোসেন শাহ খ) সিকান্দর শাহ

গ) গিয়াসউদ্দিন আজম ঘ) আলাউদ্দিন ফিরুজ শাহ

৪। উক্ত সুলতানের কর্মকান্ডের ফলে–

i) বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে

ii) অদূরদর্শী রাজনীতির প্রতিফলন ঘটে

iii) দক্ষতার সাথে রাজকার্য পরিচালিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৪ বাংলায় মোগল শাসন ও বার ভূঁইয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় মোগল আক্রমণের সময় এদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- বাংলার বার ভূঁইয়াদের সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- ইসলাম খান চিশতী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মোগল, সম্রাট আকবর, বার ভূঁইয়া, ঈসা খান, মানসিংহ, ইসলাম খান চিশতী, নবাবী আমল, বাংলার মোগল সুবেদার শায়েস্তা খান ও মুর্শিদকুলী খান

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাংলায় মোগল অভিযান

আকবরের সেনাপতি খান জাহান রাজমহলের যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজধানী তাঁড়া অধিকার করেন। তবে সমগ্র বাংলা তখনো মোগল অধিকারের বাইরে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অনেক যুদ্ধ করেও আকবর বাংলাদেশ জয় করতে পারেননি। সমগ্র বাংলায় অধিকার প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক আফগান এবং হিন্দু জমিদার এবং ভূঁইয়া ইত্যাদি স্বাধীন হয়ে যায় এবং কেন্দ্রীয় শক্তির শাসন অস্বীকার করে। মোগলদের পক্ষে সহজে তাদের দমন করা সম্ভব হয়নি। একই সময়ে যেহেতু মোগল শক্তি সারা বাংলায় কর্তৃত্ব স্থাপনে ব্যর্থ হয়, সেহেতু এই আমলকে ভূঁইয়াদের আমলও বলা যেতে পারে। ভূঁইয়াদের মধ্যে আবার বার ভূঁইয়া অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মোগল আক্রমণের সময় বাংলার রাজনৈতিক চালচিত্র

মোগল সেনাপতি খান জাহান দাউদ কররানিকে পরাজিত করে মালদহ শহরের প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ-পূর্বে তাঁড়ায় নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। যেটি বর্তমানে ভাগীরথী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তবে প্রথমদিকে বাংলায় মোগল অধিকার মালদহ-দিনাজপুর হয়ে উত্তরে ঘোড়াঘাট এবং পূর্বে করতোয়া পর্যন্ত সীমিত ছিল। বাংলায় মোগলদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বড় বাধা ছিল ভাটি এলাকা। ভাটি মানে পূর্ববঙ্গের নিচু এলাকা। এটি পশ্চিমে ইছামতি নদী, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তরে ময়মনসিংহ এবং উত্তর-পূর্বে সিলেটের বানিয়াচং।

ঈশা খাঁ

মানসিংহ

অর্থাৎ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেটের নিম্নাঞ্চল নিয়ে ভাটি গঠিত। ভাটির জমিদারদের মধ্যে চাঁদ রায় ও কেদার রায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত করেন এবং যুদ্ধে আহত কেদার রায় প্রাণত্যাগ করেন। এরপর তার জমিদারি চলে যায় ঈসা খানদের দখলে। ভাটির জমিদারদের মধ্যে ঈসা খান ও তাঁর পুত্র মুসা খান ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তারা উভয়ে মোগলদের দীর্ঘদিন প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। ঈসা খান বর্তমান বাক্ষ্মণবাড়িয়ার সরাইলের জমিদার ছিলেন। ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ত্রিপুরার রাজার পক্ষ অবলম্বন করে তিনি বর্তমান সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার তরফের জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ঈসা খান ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধির পর ঈসা খান দিওয়ান ও মসনদ-ই-আলী উপাধি নেন। ঈসা খান জীবনের শেষ পর্যন্তও মোগলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি। ঈসা খানের রাজধানী ছিল কতরাব। এটা বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার মাসুমাবাদ গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন। সোনারগাঁয়েও ঈসা খানের আরেকটি রাজধানী ছিল। কতরাব থেকে সোনারগাঁয়ের দূরত্ব খুব বেশি নয়। মনে হয়, উভয় স্থানেই তিনি ঘাঁটি এবং রাজধানী স্থাপন করেন।

বাংলায় আকবরের শেষ সুবাদার ছিলেন রাজা মানসিংহ। তিনি ছিলেন রাজপুত এবং একজন দক্ষ সেনাপতি। মানসিংহ তাঁর ছেলে দুর্জন সিংহকে বিশাল বাহিনী নিয়ে ভাটি আক্রমণ করতে পাঠান। ব্রহ্মপুত্র তীরে এগারসিন্ধুতে ঈসা খান দুর্জন সিংহকে পরাজিত ও নিহত করেন। কথিত আছে যে, ঈসা খানের সাথে মানসিংহের একক যুদ্ধ হয়। জনশ্রুতি হচ্ছে যে, ঈসা খান মানসিংহকে একক যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধে জয়ী যিনি হবেন তিনিই বাংলার কর্তৃত্ব লাভ করবেন। মানসিংহ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। মানসিংহ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আসেন এবং ঈসা খানের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এক পর্যায়ে মানসিংহের তরবারি ভেঙ্গে গেলে ঈসা খান তাঁকে আঘাত না করে নিজের তরবারি মানসিংহকে দেন। কিন্তু, মানসিংহ তরবারি না নিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে আসেন। ঈসা খান তখন মানসিংহকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করলে তিনি তা গ্রহণ না করে ঈসা খানকে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর সাহস ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। মানসিংহ শিবিরে ফিরে গেলে তাঁর রাণী তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, মানসিংহের কাপুরুষতার জন্য সম্রাট মানসিংহকে হত্যা করবেন এবং রাণী বিধবা হয়ে যাবেন। ঈসা খান নিজে এই সমস্যার সমাধান করেন। তিনি মানসিংহের সাথে সম্রাটের দরবারে যেতে রাজি হন। সেখানে সম্রাট ঈসা খানকে বন্দী করেন। কিন্তু, মানসিংহের কাছে সকল কথা শুনে সম্রাট আকবর ঈসা খানকে উপাধি ও জায়গীর দিয়ে স্বদেশে ফেরৎ পাঠান।

ইসলাম খান চিশতী ও বারভূঁইয়াদের দমন

মোগল সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তার পিতার নিযুক্ত সুবাদার মানসিংহকে বাংলার সুবাদারি পদে বহাল রাখেন। তবে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দুধ-ভাই কুতব-উদ-দীন খান কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। কতুব-উদ-দীন বর্ধমানের ফৌজদার আলীকুলীকে দমন করার জন্য বর্ধমানে গেলে সেখানে আলী কুলী ও কুতব-উদ-দীন উভয়েই নিহত হন। এই আলী কুলীর পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিলেন মেহের-উন-নিসা। আর এই মেহের-উন-নিসাই পরে জাহাঙ্গীরের স্ত্রীরূপে নূরজাহান উপাধি লাভ করেন। এরপর সম্রাট ইসলাম খান চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। ইসলাম খান চিশতীর মূল কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে এবং প্রতিবেশী কামরূপ এবং কাছাড়ে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বার ভূঁইয়াদের দমন করেন এবং সকল ভূঁইয়া বা জমিদারকে পরাজিত করলে বাংলা মোগল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা প্রদেশে পরিণত হয়। ইসলাম খান চিশতী ছিলেন ফতেহপুর সিক্রির শয়খ সলীম চিশতীর পৌত্র, তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমবয়সী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

সম্রাট আকবর

সম্রাট জাহাঙ্গীর

নূরজাহান

ইসলাম খান বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা পর্যালোচনা করে উপলব্ধি করেন যে, রাজধানী রাজমহল থেকে সারা বাংলাদেশের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রাজধানী স্থানান্তর করা প্রয়োজন। তিনি বুঝতে পারেন যে, নদীমাতৃক বাংলাদেশে সাফল্য লাভ করার জন্য নৌবহরকে শক্তিশালী করা দরকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলাম খান রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন। ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং এর নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। তিনি ইহতিমাম খানের অধীনে শক্তিশালী নৌবহর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং স্থল ও নৌপথে বিভিন্ন ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনীর সাথে মুসা খান ও তার মিত্রবাহিনীর নৌযুদ্ধ শুরু হয়। মোগল বাহিনী রাতে অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে মুসা খান একাধিকবার পরাজিত হন। তার রাজধানী সোনারগাঁও মোগল বাহিনী দখল করে। এ অবস্থায় মুসা খানও অনন্যোপায় হয়ে সুবাদার ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এরপর চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ, যশোহরের জমিদার প্রতাপাদিত্য নিহত হন। অতঃপর ইসলাম খান ভুলুয়া বা নোয়াখালি রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বুকাইনগরের আফগান জমিদার উসমান খান লোহানী মোগলদের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু ছিলেন। মুসা খান কর্তৃক মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করার পরও তিনি মোগলদের আধিপত্য মেনে নেননি। সিলেট বিভাগের মৌলভীবাজার জেলার হাইল হাওরের সন্নিকটে দৌলম্বপুর (বর্তমান লম্বোদপুর) নামক স্থানে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মোগল বাহিনীর সাথে উসমান খানের ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে উসমান খান পরাজিত ও নিহত হন। ফলে সিলেট মোগল বাহিনীর দখলে আসে। এভাবে ইসলাম খান বাংলার জমিদারদেরকে দমন করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণরূপে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

সুবাদার ইসলাম খান

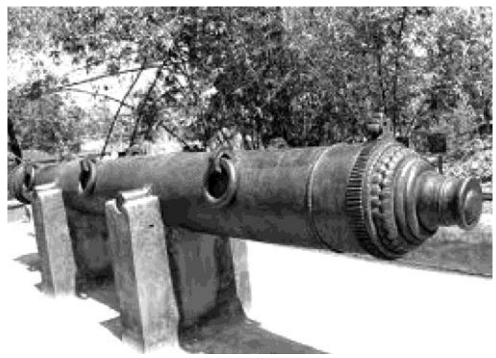

মোগলদের কামান, ওসমানী উদ্যান

সুবেদার মীর জুমলা

১৬১৩ সালে সুবেদার ইসলাম খানের মৃত্যুর পর বেশ ক'জন সুবেদার বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তবে সুবেদার মীর জুমলার ক্ষমতা গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত কোন প্রশাসকই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। শাহ সুজাকে দমন করার জন্যে আওরঙ্গজেবের অন্যতম সেনাপতি মীর জুমলা বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর পর্যন্ত এসেছিলেন। ফলে দিল্লীর সিংহাসনে বসে আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করেন। মাত্র তিন বছর শাসনকালে মীর জুমলা আসাম ও কুচবিহার বিজয় করেন। তিনি সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার জন্যে সে সময়কার বাংলাদেশে সুখ্যাতি অর্জন করেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলীর খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবেদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। অবশেষে সম্রাট আওরঙ্গজেব তার মামা শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবেদার করে পাঠান।

সুবেদার শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খানের সুবাদারি আমল দুঅধ্যায়ে বিভক্ত ছিল। তিনি প্রথম অধ্যায়ে ১৬৬৪ খ্রিঃ থেকে ১৬৭৮ খ্রিঃ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৬৮০ খ্রিঃ থেকে ১৬৮৮ খ্রিঃ পর্যন্ত বাংলাদেশের সুবাদার ছিলেন। তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ও জনপ্রিয় সুবেদার ছিলেন। তার সময়ে আরাকানের মগ ও পর্তুগীজ (ফিরিঙ্গি) জলদস্যুরা মিলিত হয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এলাকায় লুটতরাজ করে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। তারা মানুষকে ধরে নিয়ে ইউরোপীয় বণিকদের নিকট বিক্রি করত। মগরা আবার অনেককে আরাকানে নিয়ে যেত এবং পুরুষদেরকে মজুরের কাজে লাগাত ও মেয়েদেরকে দাসী করে রাখত। তিনি মগ জলদস্যুদের বিতাড়িত করার জন্য বহু রণতরী নির্মাণ করেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে রণতরী সংগ্রহ করেন। চট্টগ্রাম থেকে মগদের বিতাড়ন ও চট্টগ্রাম জয় শায়েস্তা খানের সুবাদারির কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইচ্ছানুযায়ী চট্টগ্রামের নাম রাখা হয় ইসলামাবাদ।

আওরঙ্গজেব

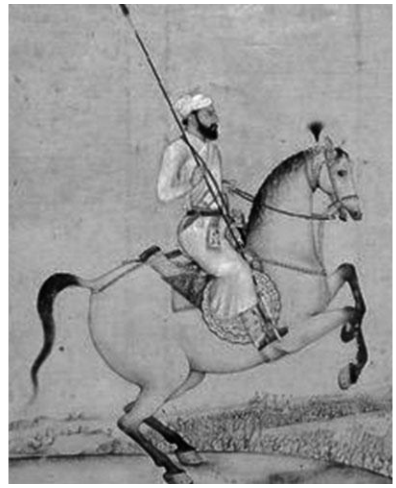

শায়েস্তা খান

শুল্ক ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করলে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে শায়েস্তা খানের প্রথম সংঘর্ষ ঘটে এবং ইংরেজরা বাংলাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। এভাবে তিনি ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দেন। শায়েস্তা খান রাজস্ব সংস্কারে বড় ধরনের অবদান রাখেন। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। তখন বাংলাদেশে জিনিসপত্রের দাম খুব কম ছিল। কথিত আছে যে, তখন এক টাকায় আট মণ চাল বিক্রি হতো। তবে এটা ঠিক নয় যে, সাধারণ মানুষ ও কৃষকরা ভালো অবস্থায় ছিল। টাকার মান বেশি ছিল তাই চাল ছিল অনেক সস্তা। সাধারণ মানুষ টাকা ব্যবহার করত না। তারা ব্যবহার করত কড়ি। আর টাকা কড়ির ব্যবধান ছিল অনেক অনেক বেশি। শায়েস্তা খান ঢাকায় ছোট কাটরা, হুসায়েনী দালান, লালবাগ দুর্গের একাংশ এবং আরও বহু অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ করেন।

মুর্শিদকুলী খান ও নবাবী আমলের সূচনা

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর কোনো কোনো সুবা স্বাধীন হয়ে যায়। বাংলাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষ করে মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে বাংলায় নবাবী আমলের সূচনা হয়। মুর্শিদকুলী খানের প্রাথমিক জীবন খুবই চমকপ্রদ। তিনি ছিলেন একজন বাহ্মণ সন্তান। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁকে করতলব খান উপাধি দিয়ে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করেন। পরে তিনি সুবেদার হন। মুর্শিদকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল যুগোপযোগী। তিনি অতিরিক্ত রাজস্ব ধার্য না করে সঠিক ব্যবস্থাপনার দ্বারা রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

সরফরাজ খান

মুর্শিদকুলী খান

আলীবর্দী খান

মুর্শিদকুলী খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর উত্তরাধিকার হিসেবে কন্যা জিনাত-উন-নেসার স্বামী সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে বসেন। সুজাউদ্দীন খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র সরফরাজ খান নবাব নিযুক্ত হন। কিন্তু সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে বিহারের নায়েব আলীবর্দী খান বিদ্রোহ করেন। সরফরাজ খান এতে পরাজিত ও নিহত হন। মোগলদের অনুমোদন ছাড়াই আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। নিজের নবাবীর উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর আপন কন্যাই তাঁর মনোনীত নবাব পৌত্র সিরাজকে গ্রহণ করেনি। নবাব পরিবারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাই শুধু নয়, গোটা ভারতেরই স্বাধীনতা হারানোর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ মোগল সেনাপতি মানসিংহ ও ঈসা খানের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের একটি কল্পিত ছবি এঁকে দেখান।

সারসংক্ষেপ

বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বেশ কয়েকজন দক্ষ নেতা বাধার সম্মুখীন হন। আকবরের সময় মানসিংহকে নিয়োগ দেয়া হলেও তিনি ঈসা খানের কাছে পরাজিত হলে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম খান চিশতী সমগ্র বাংলাদেশে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। সুবেদার শায়েস্তা খান আওরঙ্গজেবের সময় বাংলা শাসনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানসিংহ কোন ভাটির জমিদারকে পরাজিত করেন–
ক) চাঁদ রায় খ) কেদার রায়
গ) ঈসা খান ঘ) মুসা খান

২। বাংলায় আকবরের শেষ সুবাদার কে ছিলেন?
ক) মানসিংহ খ) দুর্জন সিংহ
গ) ইসলাম খান ঘ) শায়েস্তা খান

৩। কোন সুবাদারের সময় রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় আনা হয়?
ক) শায়েস্তা খান খ) ইসলাম খান
গ) মুর্শিদকুলী খান ঘ) সুজাউদ্দিন

৪। এগারসিন্ধুতে দুর্জনসিংহকে পরাজিত করার ক্ষেত্রে কোন নামটি অধিক উপযোগী?
ক) ইসলাম খান খ) সুমা খান
গ) ঈসা খান ঘ) ইহতিমাম খান

৫। জাহাঙ্গীর নগর নামটির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে– (প্রয়োগমূলক)
ক) ঢাকার খ) চট্টগ্রামের
গ) বরিশালের ঘ) কুমিল্লার

সৃজনশীল প্রশ্ন

মোগল শাসনামলে কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী গোলযোগপূর্ণ এলাকার সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল জনাব x এর উপর। তিনি তার রাজধানী স্থানান্তর, নৌবহর গঠন কাজের সুবিধার্থে করেছিলেন। এমনকি নৌযুদ্ধে এলাকার বৃহৎ ভূস্বামীদেরও পরাজিত করেন।

ক. জাহাঙ্গীর কত সালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন?
খ. শায়েস্তা খানকে অমরত্ব দিয়েছে তার স্থাপত্য কীর্তি-ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের জনাব x এর কর্মকাণ্ড পাঠ্য বইয়ের পঠিত সুবাদারের কাজের যে দিকটির প্রতিফলন ঘটেছে তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত সুবাদার জমিদারকে পরাভূত করে বাংলা সম্পূর্ণরূপে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন আপনি কী একমত? মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ ঃ ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. গ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ ঃ ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. ক

মধ্যযুগে বাংলার জীবনচর্যা

ইউনিট ৭

ভূমিকা

তের শতকে মুসলমানরা বাংলাদেশ জয় করে মুসলিম সমাজ নির্মাণ করে এবং মুসলিম সভ্যতা গড়ে তোলে। সেই থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলা মুসলিম শাসনের অধীন ছিল। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির প্রভাবে মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মিত হয়েছিল। বাংলার মধ্যযুগের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হচ্ছে বহির্দেশ থেকে আগত মুসলিম প্রভাব। শুধু শাসন ক্ষেত্রেই নয় সমাজজীবনেও যা স্থায়ী আসন লাভ করেছিল। মুসলিম শাসন নিয়ে যেমন সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হয়নি, আবার মুসলিম শাসকগণও হিন্দু ও বৌদ্ধদের স্বাধীনতা দানে কার্পণ্য করেনি। সামন্ত সমাজের নিয়ম অনুযায়ী হিন্দুদের মধ্যে যারা লেখাপড়া ও আর্থিকভাবে অগ্রসর (ব্রাক্ষণ, ক্ষৈত্রিয়) ছিলেন তারাই অভিজাত শ্রেণি হিসেবে সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে গ্রহণ ও ভোগ করেছেন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ ঃ মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি
পাঠ-৭.২ ঃ মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৭.১ মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার সমাজ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মধ্যযুগে বাঙালি জাতিসত্ত্বায় সংমিশ্রণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- মধ্যযুগের অর্থনৈতিক আবস্থা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মুসলিম শাসন, বাঙালি জাতিসত্ত্বা, কৃষি অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, নগরায়ন, মুদ্রা

মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার সমাজ

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নতুন উপাদান যুক্ত হয় ও বড় পরিবর্তনের সূচনা হয়। এতদিন পর্যন্ত বাংলার লোকজন ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু। মুসলমানরা নিয়ে আসে একটি নতুন ধর্ম, ইসলাম – যার সঙ্গে বৌদ্ধ বা হিন্দুদের মিলের চেয়ে গরমিলই ছিল বেশি। প্রথম বিজয়ীরা ছিল তুর্কি। তুর্কিরা প্রায় তিনশ বছর ধরে শাসকের মর্যাদা লাভ করে। ইলিয়াস শাহীরাও তুর্কিই ছিল, তার পরে হাবশী এবং হাবশীদের পরে সৈয়দ বংশের সুলতানরা

শাসনক্ষমতা দখল করে। এরপর বাংলায় চলে আফগান ও মুঘল শাসন। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসকদের সহযোগী লোকেরাও যেমন বিদ্বান, পেশাজীবী, স্থপতি, প্রকৌশলি, প্রশাসক এবং কারিগরও এদেশে আসে। মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যও অনেকে দিল্লি বা বাংলাদেশে আসে। অনেক আরব ধর্ম প্রচারের জন্যও আসেন। পারস্য থেকে আগত মুসলমানরা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল, তাঁদের ফার্সি ভাষাই মুসলমান আমলে সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণ করা হয়। সুফিদের মধ্যে অনেকেই পারস্য থেকে আসেন ।

সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আর্থিক ও শিক্ষা সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া মানুষকে অধিকতর শোষিত ও অবহেলিত করে রাখা। বাংলাদেশও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক শোষিত হতো, অপেক্ষাকৃত অসচ্ছলভাবে জীবনযাপন করত। তবে মধ্যযুগে বাংলাদেশে খাদ্য, পুকুরে মাছ, গোয়াল ভরা গরু থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুলতানি আমলে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। দাসরাও শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত হয়ে অভিজাতশ্রেণিতে স্থান পেতেন।

জাতিগত পরিচয় ও বাংলার সামন্ত সমাজ

বাংলায় বসবাসকারী বিভিন্ন জনপদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রাজশাসনের ফলে মধ্যযুগের আগেই সংগঠিত হতে থাকে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নৈকট্য সৃষ্টি হতে থাকে। তবে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক বাঙালি জাতিসত্তার ভিত্তিই সবচেয়ে সংগঠিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, যা অন্য উপজাতিগুলো পারেনি। মধ্যযুগের মাঝামাঝি ও শেষের দিকে চাকমাসহ বিভিন্ন পাহাড়ি উপজাতি পূর্ব ও উত্তর দিক থেকে এসে পার্বত্যঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে বৃহত্তর বাঙালি জাতিগোষ্ঠীর যোগাযোগ তেমন ছিল না। উত্তরাঞ্চলের সাঁওতাল, রাজবংশী, গারো জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে বাঙালির যোগাযোগ ছিল এবং সম্পর্ক প্রীতিমূলক ছিল। সুফিসাধক এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রভাবে তের শতকে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে । তখন থেকে নিম্নবর্ণের শোষিত মানুষের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে বাঙালি মুসলিম বলে একটি সম্প্রদায়ের সংযোজন ঘটে। মধ্য যুগে তুর্কি, আফগান, মুঘল, ইরানি, আরব, হাবশিসহ মধ্য প্রাচ্যের আরো কিছু জাতিগোষ্ঠীরও আগমন ঘটে। এর আগে এখানে জৈন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর বসবাস ছিল। ষোল শতকে বাংলায় পর্তুগিজ এবং আর্মেনীয়গণেরও বসতি স্থাপিত হয়। চট্টগ্রামে আরাকানি জাতিগোষ্ঠীর বসতি স্থাপিত হয়। ফলে মধ্যযুগে বাঙালি জাতিসত্ত্বায় অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর আরো মিশ্রণ ঘটেছিল।

দীর্ঘ যে সব রাজশাসন ব্যবস্থা বাংলায় কার্যকর ছিল তাতে ইসলাম ধর্ম, সুফিবাদ, হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম, বিদেশী শাসক, বণিক ও সাধারণ মানুষের আগমন বাংলার সমাজ ব্যবস্থার ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। মুঘল আমলে ঢাকা রাজধানী হওয়ার কারণে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বেড়ে যায়। ফলে বাংলার পূর্বাঞ্চলে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি বেশি ঘটেছিল। কিন্তু অভিজাত সমাজের ভেতরে টিকে থাকা বর্ণ ও শ্রেণি বৈষম্যের কারণে বাংলার মধ্যযুগীয় সমাজ থেকে শ্রেণি বিভেদ মুছে যায়নি। আভিজাত্যের ভিত্তিতে স্বয়ং মুসলিম সমাজই আশরাফ ও আতরাফ নামে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দেশীয় ও বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল হচ্ছিল না। হিন্দুদের মধ্যেও জাতি বা বর্ণভেদ প্রথা প্রবল ছিল। সমাজে প্রশাসন, জমি বণ্টন, বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে যারা জড়িত ছিলেন তারা অভিজাত বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন। অপেক্ষাকৃত কম দামের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন সমাজের নিম্নবর্ণ, আতরাফ, ক্রীতদাস, চাকরবাকর ইত্যাদি নামে পরিচিত হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিভাজন সৃষ্টি করে রেখেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান প্রদানের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন হিন্দু প্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে। হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণদের মতোই মুসলমান সমাজে শেখ ও সৈয়দরা কৌলীন্য দাবি করে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেন। হিন্দুদের অনুকরণে মুসলমানরা তাদের বিবাহ অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ করে তোলে। কুসংস্কার ও যাদুটোনার বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল প্রায় একই রকমের। হিন্দু-মুসলমান উভয়ই উভয়ের সামাজিক বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগদান করত। সুলতানি আমলে হিন্দু ও মুসলমান সাহিত্যে উদারপন্থী ধারা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সমন্বয় প্রচেষ্টার নিদর্শন বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। এ আমলে মুসলমান লেখক হিন্দু পুরাণ, গাঁথা এবং ঐতিহ্যকে সাহিত্যের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

মধ্যযুগে মুসলিম আমলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

মুসলিম আমলে বাংলায় এক ধরনের মধ্যযুগীয় অর্থনেতিক ব্যবস্থা চালু ছিল। ইবনে বতুতা, বারবোসা, আবুল ফজলসহ বিভিন্নজনের লেখায় বাংলাদেশের তৎকালীন অর্থনীতির সমৃদ্ধির প্রশংসা করা হয়েছে।

সুলতানি যুগে বাংলা স্বাধীন থাকার কারণে কৃষি, কুটিরশিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটার ফলে বাংলার অর্থনীতিতে সমৃদ্ধি ঘটেছিল। মুঘল যুগে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হয়ে শান্তি স্থাপন ও উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থার ফলে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতির ব্যাপক উন্নতি হয়। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতিIইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ প্রভৃতি বাংলাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করায় বহু অর্থাগম হতো। ১৬৮০–১৬৮৪ সময়ে কেবল ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ষোল লাখ টাকার জিনিস ক্রয় করে। ওলন্দাজরাও এর চেয়ে বেশি জিনিস ক্রয় করত। সুতরাং এই দুই কোম্পানির কাছ থেকে প্রতি বছর আট লাখ রূপার টাকা বাংলায় আসত। বর্তমান মূল্যে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকা এই দুটি ইউরোপীয় কোম্পানি দিত। অন্য দেশের সাথে বাণিজ্যতো ছিলই।

ইবনে বতুতা

কৃষি অর্থনীতি

চৌদ্দ শতকে ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, বাংলাদেশে প্রচুর ধান হতো। সতের শতকে বার্ণিয়ার লিখেছেন যে, অনেকে বলেন পৃথিবীর মধ্যে মিশর দেশই সর্বাপেক্ষা শস্যময় ; কিন্তু এ খ্যাতি বাংলারই প্রাপ্য। মুসলিম আমলে দীর্ঘ সময়ে কৃষি অর্থনীতিই প্রধান ছিল। তবে ব্যবসায়-বাণিজ্য, কুটিরশিল্পও ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছিল। মধ্যযুগের সকল রাজবংশের শাসনামলে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বাংলাদেশ চিরকালই শস্য-শ্যামলা চিরসুন্দর নয়নাভিরাম বলে দেশী-বিদেশীদের হৃদয় জুড়িয়েছে। এতে কৃষিপ্রধান বাংলাদেশেরই পরিচয় ফুটে উঠেছে। বছরে তিনবার ফসল উৎপাদন করত বলেই মধ্যযুগে বাংলার দেড় কোটি মানুষকে তিন বেলা ভাত খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল বাংলাদেশ। ধানের পাশাপাশি পাট, গম, আম, যব, লাক্ষা, তেলবীজ, রসুন, মরিচ, মসলা, রেশম, রবিশস্য, ইক্ষু ইত্যাদি ফসল উৎপাদিত হতো। বাংলা থেকে প্রচুর চাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রপ্তানি করা হতো।

শিল্প

বাংলার শিল্পের মধ্যে বয়ন শিল্প ছিল অন্যতম। সবচেয়ে সূক্ষ্ম ও উন্নতমানের বস্ত্রের নাম ছিল ‘মসলিন’। মসলিন ও রেশম শিল্প মুসলিম শাসক, অভিজাত ও ধনী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রসার লাভ করে। বাংলায় ইক্ষুর উৎপাদন ছিল ব্যাপক। এই ইক্ষু থেকে চিনি উৎপাদিত হতো। মুসলমান আমলে চিনি উৎপাদন একটি প্রধান শিল্পে উন্নীত হয়। চিনির মতো লবণ ছিল আরেকটি প্রধান শিল্প। সমুদ্রের পানি এবং লবণাক্ত মাটি থেকে লবণ উৎপাদিত হতো। মধ্যযুগের বিভিন্ন শাসনামলে কৃষিভিত্তিক কিছু কুটির শিল্প যেমন বস্ত্র ও রেশম শিল্প বিশ্বজোড়া বাংলার খ্যাতি নিয়ে এসেছিল। বাংলার বেশ কিছু জায়গায় লোহাজাত জিনিসপত্র তৈরি হতো। বাংলায় কাঠের আসবাবপত্র তখন বিশেষ গুরুত্ব পায়। নদ-নদীর দেশে নৌকা ছাড়া চলাফেরা করা যেত না। ফলে এখানে নৌকা ও জাহাজ শিল্প প্রসার লাভ করে। দেশবিদেশে বাণিজ্যের জন্য বড় বড় নৌকা ও জাহাজ তৈরি করা হতো। বাংলার ‘মসলিন’ কাপড়ের চাহিদা দেশের বাইরে তুরস্ক, খোরাসান, পারস্যসহ বিভিন্ন দেশে ছিল। তখনকার অর্থনীতিতে এর প্রভাবও ব্যাপক ছিল। ইউরোপের বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্যের জায়গা হিসেবে বাংলার গুরুত্ব ছিল। এর নানা রকমের কাঁচামাল, মসলিন, তাঁতের কাপড় ইত্যাদির প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল।

বাণিজ্য, নগরায়ণ এবং মুদ্রা

মধ্যযুগের বাঙালি সওদাগররা ‘সপ্তডিঙ্গা-মধুকর’ ভাসিয়ে বিদেশে পাড়ি দিতেন বলে অনেক গল্প চালু আছে। তখন বাঙালিরা সাগর পাড়ি দিয়ে ব্রক্ষ্মদেশ (মায়ানমার), মালয়, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীনে পাড়ি দিত। বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে চট্টগ্রামের নাম তখন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্যযুগে গৌড়, পাভুয়া, সোনারগাঁও, হুগলি, ঢাকাসহ বেশ কিছু শহর গড়ে উঠেছিল। মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতিতে মুদ্রার প্রবর্তন একটি বড় বিষয়। কারণ এর ফলে বিনিময় প্রথার পরিবর্তন ঘটে। শেরশাহ রৌপ্যমুদ্রা চালু করেন। আকবর স্বর্ণ নির্মিত ‘মোহর’ ও রূপা নির্মিত ‘জালালা’ এক সঙ্গে চালু করেন। খুচরা বাজারে ‘কড়ি’ চলত। সরকার এগুলোর মূল্যমান নির্ধারণ করত। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার হয়। অর্থনীতির এসব সংস্কার বাংলায় নগর সভ্যতা চাঙ্গা করে, বেনিয়া ইংরেজদের আকৃষ্ট করে, মজুরিভিত্তিক কর্মচারী, চাকরিজীবী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। মুসলমান যুগে প্রত্যেক স্বাধীন সুলতানই নিজ নামে মুদ্রা অঙ্কিত করতেন। মুদ্রাই তখন স্বাধীনতার প্রধান

প্রতীক ছিল। বাংলার মুসলমান সুলতানরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেই নিজের নামে মুদ্রা চালু করতেন। এই সব মুদ্রায় তারিখ থাকত। সতের শতকের পর থেকে মুঘল সম্রাটগণের মুদ্রাই বাংলায় প্রচলিত ছিল। রূপার মুদ্রার নাম ছিল টঙ্ক।এই টঙ্ক থেকেই টাকা শব্দের উৎপত্তি। সাধারণ কেনাবেচায় কড়ি ব্যবহৃত হত।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুন বাংলার জীবনযাত্রার মান দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তিনি 'বঙ্গদেশের আনাচে কানাচে বেহেস্ত' বিরাজ করছে বলে তার স্মৃতি কথায় লিখেছেন। বস্তুত মুঘলদের আগের মামলুক বংশ, ইলিয়াসশাহী বংশ, হুসেনশাহী বংশ, শূর বংশের রাজত্বকালে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধির ধারায় চলেছিল। মুঘলরা ক্ষমতা দখলের পর রাজস্বনীতি, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর সরকারি নীতি-নিয়ম আরোপ করায় অর্থনীতি কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিতে পরিচালিত হতে থাকে। সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত সুবা-বাংলার সঙ্গে ভারতসহ বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে মুঘল যুগে আধুনিক বাংলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনারই প্রবর্তন ঘটেছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ 'মসলিন' কাপড়ের একটি চিত্র অংকন করবেন এবং কয়েকটি গ্রুপ করে মুসলিন বিষয়ক আলোচনায় অংশ নিবেন।

সারসংক্ষেপ

বৌদ্ধ ও হিন্দু অধ্যুষিত বাংলায় তের শতক থেকে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। সামন্ত সমাজের বৈষম্যের কারণে ইসলাম ধর্ম সম্প্রসারিত হয়। তবে মুসলিম সমাজ ও আশরাফ ও আতরাফ নামে ভাগ হয়েছে। তা সত্ত্বেও মধ্যযুগে বাংলার অর্থনীতির ব্যাপক সমৃদ্ধি হয়। কৃষিতে ধান শিল্পে মসলিন এবং বাণিজ্যে নানা অঞ্চল যেমন ব্রহ্মদেশ, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ও ইন্দোচীনের সাথে বাণিজ্য হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনামলে সরকারী ভাষা ছিল– (জ্ঞান)

ক) আরবি খ) উর্দু

গ) ফার্সি ঘ) ইংরেজি

২। কৃষিই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কেননা–

i) নদনদীর সমাহার ii) পলি গঠিত সমভূমি iii) রপ্তানিজাত পণ্যের উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

৩। হাফিজুর রহমান স্যার মধ্যযুগের অর্থনীতির উপর বক্তব্য রাখার সময় বলেন যে বর্তমান সময়ের তৈরি পোষাক শিল্পের মতো মধ্যযুগে বস্ত্রশিল্পে বাংলার অগ্রগতি, দেশে বিদেশে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এছাড়া ব্যবসায়-বাণিজ্যর অধিকাংশ ছিল রপ্তানি নির্ভর।

ক. সম্রাট আকবর প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রার নাম কী?

খ. সুলতানি যুগে বাংলার সমৃদ্ধ অর্থনীতির কারণ কী? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে মধ্যযুগের অর্থনীতির যে চিত্র দেখা যায় তা পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. বর্তমানে পোষাক শিল্পের মতো মধ্যযুগের বয়ন শিল্প বাংলাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেয়, আপনি কী একমত? মতামত দিন।

পাঠ-৭.২ মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুসলিম আমলে ধর্মীয় বিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলায় ইসলাম ধর্ম বিস্তারে সুফিবাদের প্রভাব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষা-সাহিত্য, স্থাপত্য ও শিল্পকলার বিকাশের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ধর্ম, সুফিবাদ, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, শিক্ষা, স্থাপত্য, শিল্পকলা

সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল। আর এ কারণে মুসলিম যুগের সাহিত্যে সমাজের যে প্রতিফলন ঘটেছে তাতে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে ইসলাম প্রচার, আত্মার উৎকর্ষ সাধন, মানব কল্যাণে কাজ করা ইত্যাদি আদর্শ নিয়ে সুফিসাধকগণ বাংলাদেশে আসেন। বাংলার অনেক জায়গায় তাদের প্রতিষ্ঠিত 'খানকা' গুলো আধ্যাত্মিক, মানব কল্যাণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার প্রসারে বড় অবদান রাখে। ক্রমে তারা বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতিকে সমন্বিত করে সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মরমী চিন্তাধারাকে আত্মস্থ করায় সুফিবাদের প্রতি হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও আকৃষ্ট হয়। ফলে বাংলার সুফিবাদ ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অধিকতর উদার ও মানবকেন্দ্রিক চরিত্র অর্জন করে। সুফিবাদের কারণে বাংলার সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত লোপ পায়। মরমী বাউলরা হিন্দু-মুসলিম মিলনের আদর্শই প্রচার করে।

বহিরাগত মুসলিম শাসকরা বাংলার সমাজজীবনের সাথে তাদের শাসন আত্মীকরণ করার ফলে ধর্মীয়ভাবে ইসলাম বৃহত্তর বাঙালি সমাজে ব্যাপক প্রভাব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী শাসনের সূচনাকাল থেকেই বাঙালি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ সমাজ সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করেছিল। মুঘল আমলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনের প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠে। ঐ সময়ে লেখা 'মনসামঙ্গল' ধর্ম সহিষ্ণুতার উজ্জ্বল উদাহরণ। ধর্মীয় পরিচয় বাঙালি হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধের মধ্যে তেমন কোনো বিরোধ বা সংকট সৃষ্টি করেনি।

ইসলাম ধর্মের বিস্তারে সুফিবাদের প্রভাব

চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাংলাদেশে সুফি প্রভাব বিস্তার লাভ করে। শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজির নাম *শেখশুভোদয়ার* (শেখের শুভ উদয়) সঙ্গে জড়িত। এ গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সচিব ছিলেন। *শেখশুভোদয়া* সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস, শেখ জালালউদ্দীন তাবরিজি লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনৌতিতে বাস করতেন। বগুড়ার মহাস্থানগড়ের শাহ সুলতান মাহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙ্গজেবের সনদসূত্রেও মিলে। ইনি সম্ভবত চৌদ্দ শতকের লোক। মনে হয় মাহি আসোয়ার (মৎসাকৃতির নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দ শতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোলো শতকে পর্তুগিজরা নৌপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। শাহজালাল নামে বিখ্যাত এই সাধুপুরুষ উত্তর পূর্ব বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারে অবদান রাখেন। তার উদ্যম ও নিঃস্বার্থ সেবার ফলে ঐ অঞ্চলে মুসলিম সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করে। আদর্শ জীবন ও দুঃস্থ মানুষের প্রতি সেবার জন্য তিনি অমুসলিমদেরও ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। আজও তিনি সাধারণ লোকপ্রবাদে অমর এবং শত শত লোক সংগীতে তাঁর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। শেখ আঁখি সিরাজুদ্দিন উসমান নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। তিনি চৌদ্দ-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাংলাদেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের

বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হতো। আলাউল হকের পুত্র ছিলেন নূর কুতুব-আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানি শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। তাঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানি জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শরকির সমসাময়িক ছিলেন।

শাহজালাল (রা:)-এর মাজার, সিলেট

সুফিদের দ্বারা দীক্ষিত অধিকাংশ নিম্নবর্গীয় সাধারণ মানুষ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধানের কারণে অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে, তারা ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ও লিখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায়, প্রায় পুরোপুরি বাঙালিই রয়ে গেল। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির উন্মেষ হয়। পীর, দরবেশ ছাড়াও বাংলার মুসলমানদের কিছুসংখ্যক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পৌরাণিক নায়কের প্রতি বিশেষ আসক্তি ছিল। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলেন খাজা খিজির।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। এই সময়ে বাংলা ভাষা সাহিত্যের মর্যাদা পায় এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সুলতানদের দরবারে প্রবেশ করে। প্রথমে সুলতানরা ও তাঁদের আমাত্যেরা হিন্দু কবিদের উৎসাহ দেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। অর্থাৎ মুসলিম সুলতানরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশে সহায়তা দান করেন। পরে মুসলিম কবিরাও বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেন। শাহ মুহাম্মদ সগীর একমাত্র মুসলিম কবি যিনি সুলতানি আমলে কাব্য রচনা করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের আগে বাংলা ভাষার লিপি রচনার গতি বেশ ধীর ছিল। পাল ও সেন যুগে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি থাকায় বাংলা ভাষার তেমন উন্নতি হয়নি। বাংলা ভাষার সবচেয়ে পুরোনো নমুনা হল চর্যাপদ। চর্যাপদের ভাষা পুরোপুরি বাংলা নয়, বলা চলে এটি বাংলা-পূর্ববর্তী ভাষা। কিন্তু তারপরও চর্যাপদকে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ কেউ একে চর্যাগীতি বলেন। কেননা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মুখে মুখে এগুলো গান হিসেবে প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষা নতুন গতি লাভ করে সুলতানি যুগে। ফারসি ও আরবির সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দ্রুত বিকাশ ঘটে। সুলতানি যুগে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার প্রসার ঘটে। ইলিয়াসশাহী আমলে মহাকাব্য ও পৌরাণিক কাহিনী, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা বাংলায় ভাবপ্রবণ ও মানবতাবাদী সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। বাংলার সুলতান রুকনউদ্দিন-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করেন। চট্টগ্রামের শাসক পরাগল খার সহযোগিতায় কবি পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন। আরো অনেক গ্রন্থই তখন রচিত হয়। মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় লৌকিক কাব্যের সাহিত্য রচনা হয়। ষোড়শ শতকে সারিবদ্ধ খাঁ নামক একজন মুসলমান 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করেন। হুসেনশাহী যুগে (১৪৯৩-১৫৩৮) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করে। বাংলার শাসকগণ এ সময়ে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি সকল প্রকার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থা

সুফি-দরবেশ এবং আলেম-উলামাগণ মুসলমানদের মধ্যে আর পণ্ডিতগণ হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মুসলিম যুগে বাংলায় অসংখ্য মাদরাসা গড়ে ওঠে। মুসলমানদের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রকে বলা হতো 'মকতব'। সাধারণত গ্রামের মসজিদে এ সব মকতব বসত। প্রাথমিক পর্বে আরবি, ফার্সি ও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হতো। অন্যদিকে হিন্দুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছিল পাঠশালা। সাধারণত গ্রামের কোনো শিক্ষিত যুবক এসব পাঠশালা চালাত।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র ছিল যথাক্রমে টোল ও মাদরাসা। সাধারণত প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের থাকা-খাওয়া সবকিছু বিনামূল্যে পরিচালিত হতো। অন্যদিকে হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র টোলে সংস্কৃত বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হতো। এখানে বেদ, পুরাণ ইত্যাদি পড়ানো হতো। নবদ্বীপ ছিল হিন্দুদের উচ্চ শিক্ষার বিখ্যাত কেন্দ্র। এখানে বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে আগত হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

মধ্যযুগের বাংলার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসকরা শিক্ষাদীক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সুফিসাধকগণ 'খানকাহ'গুলোকে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। দেশে মসজিদগুলোকে কেন্দ্র করে মাদরাসা গড়ে তোলা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মশিক্ষার গুরুত্ব বেশি ছিল। সম্রাট আকবরের শিক্ষানীতিতে পাঠ্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন করা হয়। মকতবেও গদ্য-পদ্য পড়ালেখা ছাড়াও কবিতা মুখস্থ করা ও অংক আবশ্যক করা হয়। ফার্সি শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজ যথেষ্ট এগিয়ে আসেন। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়াও যুক্তিবিদ্যা, অংকশাস্ত্র, রসায়ন ইত্যাদি পড়ানো হতো। তবে মধ্যযুগে বাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের উচ্চ শিক্ষা তেমন গড়ে উঠেনি। নারীদের শিক্ষা ছিল সীমিত আকারের এবং তা প্রধানত প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা ছিল।

স্থাপত্য ও শিল্পকলা

মধ্যযুগে যে সব দেশ থেকে শাসকশ্রেণি বাংলার রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ দেশের স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন বহন করে এনেছিলেন। এগুলো তাদের ব্যক্তিত্বের এবং প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তবে পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্যের উপকরণ বাংলায় বেশি লক্ষ করা গেছে। মসজিদ নির্মাণে বাংলার আঞ্চলিক স্থাপত্যকেও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। চিত্রকলার ক্ষেত্রেও মুঘলরা যতখানি যত্নবান ছিলেন সুলতানি যুগে এই শিল্পের তেমন কদর ছিল না। ফলে বাংলায় চিত্র শিল্প ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ততটা বিকশিত হতে পারেনি। তবে মুঘল আমলে ঢাকাসহ কিছু কিছু জায়গায় মসজিদ, সমাধি, প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন স্থাপিত হয়েছিল। এই ধারা সুবাদারদের আমলেও অব্যাহত ছিল। ঢাকায় নবাবী আমলে জিনজিরা প্রাসাদসহ নির্মিত ইমারতসমূহ এখন দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	শিক্ষার্থীগণ সুফি সাধকদের বিশেষ করে হযরত শাহজালালের উপর রচিত বিভিন্ন লোকগান সংগ্রহ করবেন এবং কোনো একটি গান শিখে নিজেদের মধ্যে পরিবেশন করবেন।

সারসংক্ষেপ

মধ্যযুগে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে সুফিদের অবদান ছিল অনেক। মধ্যযুগে বাংলার ধর্ম এবং সংস্কৃতিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্রভাব ছিল। এসময় এ দুই সম্প্রদায়ের নানান গ্রন্থ ও সাহিত্য রচিত হয়। মুসলিম শাসকগণ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব বেশি থাকায় বাংলা ভাষার তেমন উন্নতি হয়নি। শিক্ষা কাজে মুসলমানদের জন্য মাদরাসা ও মকতব হিন্দুদের জন্য টোল ও পাঠশালা ব্যবহার হতো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সুফিদের প্রতিষ্ঠিত খানকাগুলো ছিল–

i) বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার প্রসার স্থল ii) আধ্যাত্মিক কর্ম সাধনার স্থান iii) সামাজিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন স্থান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) ii খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। একমাত্র কোন মুসলিম কবি সুলতানি আমলে বাংলায় কাব্য রচনা করেন?

ক) শাহ মুহাম্মদ সগীর খ) শেখ আলাউল হক গ) সারিবদ্ধ খা ঘ) সৈয়দ আশরাফ সিমনানী

৩। সুলতানি যুগে কোন শিল্পের কদর ছিল না?

ক) স্থাপত্য শিল্প খ) চিত্র শিল্প গ) বয়ন শিল্প ঘ) কুটির শিল্প

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ ঃ ১. খ ২. ক ৩. খ

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

ইউনিট
৮

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ-বিশেষ করে বাংলা অঞ্চল ছিল ধন সম্পদে পূর্ণ রূপকথার মতো একটি দেশ। এ অঞ্চলের স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুই তখন এসব গ্রামগুলোতে পাওয়া যেত। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামের কৃষকদের ক্ষেত ভরা ফসল, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ থাকত। কুটির শিল্পেও এই গ্রামগুলো ছিল সমৃদ্ধ। তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নতমানের ছিল। এর মধ্যে জগৎ বিখ্যাত ছিল মসলিন কাপড়। তাছাড়া উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও নানা ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব পণ্যের আকর্ষণেই অনেকে এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসেছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও উপমহাদেশে এসেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে। পরবর্তী সময়ে তারা এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের আগত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে পরাজিত করে এবং স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে নানা মুখী ষড়যন্ত্র করে কীভাবে এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূচনা করে বর্তমান ইউনিটে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আরো আলোকপাত করা হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন কীভাবে আনা হয়েছে তার উপর।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ ঃ বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন
পাঠ-৮.২ ঃ বাংলায় ইংরেজ ক্ষমতা দখল
পাঠ-৮.৩ ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৮.১ বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় ইংরেজ শাসনের পটভূমি বলতে পারবেন;
- পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি ও ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, কুটির শিল্প, মসলিন কাপড়, অটোমান তুর্কি, বাণিজ্য কুঠি, ম্যাগনাকার্টা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ভাস্কো-ডা-গামা

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন: সাত শতক থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে আরব বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। তারা বাণিজ্য করতো মূলত সমুদ্রপথে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনপোল অটোমান তুর্কিরা দখল করে নেয়। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে জলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলত একারণেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমুদ্র পথে উপমহাদেশে আসার অভিযান শুরু করে।

পর্তুগীজ

পর্তুগীজদের মধ্যে যে দুঃসাহসী নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে ভারতের পশ্চিম-উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন, তিনি ভাস্কো-ডা-গামা। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে তার এ উপমহাদেশে আগমন ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। পর্তুগিজরা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে মূলধন করে এদেশে এলেও ক্রমে ক্রমে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি অঞ্চলে কুঠি স্থাপন এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে শুল্কঘাটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। উড়িষ্যা ও বাংলার কিছু অঞ্চলেও তারা বসতি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। প্রথম আগত ইউরোপীয়ান বাণিজ্যিক দল হলেও তাদের অপকর্ম ও দস্যুতার কারণে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের ঘাঁটি দখল করে, তাদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। তাছাড়া পর্তুগিজরা এদেশে আগত ইউরোপীয় অন্যান্য শক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজ ও দিনেমার

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ বলা হয়। তারা 'ডাচ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে বাণিজ্যের উদ্দেশে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে আসে। তারা কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুড়া, বাকুড়া, বলাসোর, কাশিমবাজার এবং বরানগরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু অপর ইউরোপীয় শক্তি ইংরেজদের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ শুরু হয় এবং একই সঙ্গে তারা বাংলার শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা বিদরার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে শেষ পর্যন্ত সকল বাণিজ্যকেন্দ্র গুটিয়ে তারা এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজদের মতোই দিনেমার বা ডেনমার্কের অধিবাসী একদল বণিক বাণিজ্য করার জন্য 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে তারা দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর এবং ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু এদেশে লাভজনক ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়ে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই দিনেমাররা এদেশ ত্যাগ করে।

ইংরেজ

প্রাচ্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের মতো ইংরেজ বণিকদেরকেও এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করে; ইংল্যান্ডের একদল বণিক 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বণিক সংঘ গঠন করে। এই সংঘটি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদপত্র লাভ করে। প্রাচ্যে বাণিজ্য করার সনদপত্রটি নিয়ে বাণিজ্যিক সুবিধা পাবার আশায় প্রথমে সম্রাট আকবর এবং পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে উপস্থিত হয়। জাহাঙ্গীরের অনুমতি লাভ করে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, মসলিপট্টমে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এদেশে তাদের ভিত্তি মজবুত করে ফেলে। এরপর তারা বাংলার বালাসোরে বাণিজ্য কুঠি এবং করমন্ডল (মাদ্রাজ) উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। বাংলার সুবেদার শাহ সুজার অনুমতি নিয়ে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাশিমবাজার, ঢাকা, মালদহেও তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের যৌতুক হিসেবে লাভ করা বোম্বাই শহরটিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডে কিনে নেয়। পরবর্তিকালে এই বোম্বাই শহরই কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আরেক জন ইংরেজ জব চার্ণক ১২০০ টাকার বিনিময়ে কোলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ত্ব লাভ করে। ভাগীরথী নদীর তীরের এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই পরবর্তিকালে কোলকাতা নগরীর জন্ম হয়। এখানেই কোম্পানি ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নাম অনুসারে নির্মাণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। ধীরে ধীরে এটি ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দিল্লীর সম্রাট ফারুখশিয়ার তাদের বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। এই সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও তারা লাভ করে। সম্রাটের এই ফরমানকে ইংরেজ ঐতিহাসিক ওরমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনা-কার্টা বলে উল্লেখ করেন। এই অধিকার লাভ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরুধ্য গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

ফরাসি

ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে আগত সর্বশেষ ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক কোম্পানিটি সর্বপ্রথম সুরাটে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে এবং পরের বছর মুসলিপট্টমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিচেরীতে গড়ে তোলে ফরাসি উপনিবেশ।

১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ফরাসিরা তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলায় সম্প্রসারিত করে। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে কোম্পানি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত চন্দননগর নামক স্থানটি কিনে নেয়। কয়েক বছরের মধ্যে চন্দননগর একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত ফরাসি বাণিজ্য কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী দুর্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া এর আগেই ফরাসি কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। পরবর্তিকালে তারা কাশিমবাজার ও বালাসোরে কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ফরাসি বণিকরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে ইংরেজ বণিকরা তখন ব্যবসায় বাণিজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ অবস্থায় ফরাসিদের ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইংরেজদের মতো ফরাসিরাও এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে এই দুই ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, উন্নত রণ কৌশলের কাছে শেষ পর্যন্ত ফরাসিরা পরাজিত হয়। তাছাড়া বাংলার নবাবের পক্ষ অবলম্বন করায় এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য তাদেরকে আরও পর্যুদস্ত করে ফেলে। স্বাভাবিকভাবে বাংলায় অবস্থিত ফরাসি কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের যুদ্ধসমূহে ফরাসি কোম্পানির পরাজয় তাদের এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। প্রথমে পর্তুগীজ পরে ওলন্দাজ শক্তির পতন, সর্বশেষে ফরাসিদের পরাজয় ভারতে ইংরেজ শক্তির উত্থানের পথ সুগম হয় এবং এ অঞ্চলে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। একশ বছর অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এদেশে কোম্পানির শাসন চলে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• উপমহাদেশে পর্তুগিজদের স্থাপিত বাণিজ্য কুঠিগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। • যে তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে কোলকাতার জন্ম তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

সারসংক্ষেপ

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনপোল অটমান তুর্কিদের দখলে চলে গেলে, উপমহাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভারতবর্ষে আসার ভিন্ন পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই পথ আবিষ্কারে প্রথম সফল হন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। সর্ব প্রথম পর্তুগিজরাই ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আসে। তাদের পথে আসে হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংরেজ এবং ফরাসিরা। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে, প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে যায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানি স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে বাংলা পরে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়। একশ বছর অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত চলে এদেশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন এবং চরম শোষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওলন্দাজরা কোন দেশের অধিবাসী–
ক) ইংল্যান্ড খ) হল্যান্ড গ) নিউজিল্যান্ড ঘ) আইসল্যান্ড

২। ইউরোপ থেকে ভারত আসার জলপথ আবিষ্কার করেন কে?
ক) কলম্বাস খ) বার্থালোমা দিউজ গ) ভাস্কো-ডা-গামা ঘ) আমিরিগো ভেসপুচি

৩। ইউরোপীয়দের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক) ধর্মীয় খ) রাজনৈতিক গ) বাণিজ্যিক ঘ) সাংস্কৃতিক

৪। উপমহাদেশের শাসকবর্গের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজ্য দখলে আগ্রহী হয়ে উঠে–
i) ইংরেজ কোম্পানি ii) ফরাসি কোম্পানি iii) স্পেনীশ কোম্পানি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.২ বাংলায় ইংরেজ ক্ষমতা দখল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পলাশী যুদ্ধের কারণ ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নবাবের পতনের কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখলের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পলাশীযুদ্ধ, আলীবর্দী খান, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, আলীনগর সন্ধি, রবার্ট ক্লাইভ, সিন ফ্রে

পলাশী যুদ্ধের কারণ

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে তার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। এসময় তাকে নানামুখি ষড়যন্ত্র ও সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এর মধ্যে একটি পরিবারিক ষড়যন্ত্র। যা নবাব কৌশলে দমন করতে সক্ষম হন। কিন্তু পরিবারের বাইরেও ষড়যন্ত্রের আরেক জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এর সঙ্গে জড়িত হয় দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি, নবাবের সেনাপতি মীর জাফরসহ আরো অনেকে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশী যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে থাকে। নিম্নে পলাশী যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করা হলো–

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজরা সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসার পর নতুন নবাবকে কোনো উপঢৌকন পাঠায়নি এবং কোন সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেনি। ইংরেজদের এই ব্যবহারে নবাব ক্ষুব্ধ হন।
- নবাবের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত রাখে।
- ইংরেজরা বাণিজ্যিক শর্ত ভঙ্গ করে নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে দস্তকের (অনুমতি) অপব্যবহার করে।
- আলীবর্দী খানের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ইংরেজরা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাছাড়া জনগণকে নির্যাতন করার মতো ধৃষ্টতাও তারা দেখাতে থাকে।
- রাজা রাজবল্লভের পুত্র প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নেয়। নবাবের দূত তাকে ফেরত চাইতে গলে আপমানিত হন।

ইংরেজ কোম্পানির একের পর এক ধৃষ্টতার জন্য উচিত শিক্ষা দিতে নবাব কোলকাতা ও ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে নেয়। নবাব অতর্কিতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজরা ভয়ে দুর্গ ত্যাগ করে। কিন্তু এ সময় একটি ছোট ঘরের মধ্যে বন্দি অবস্থায় শাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জনের মতো ইংরেজের মৃত্যুর গুজব মাদ্রাজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে কোলকাতা পুনরায় দখল করে। এ সময়ে নবাব তাঁর চারিদিকে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে এক অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। যে সন্ধিকে বলা হয় আলীনগর সন্ধি।

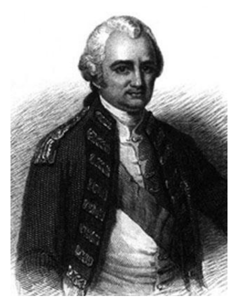

রবার্ট ক্লাইভ

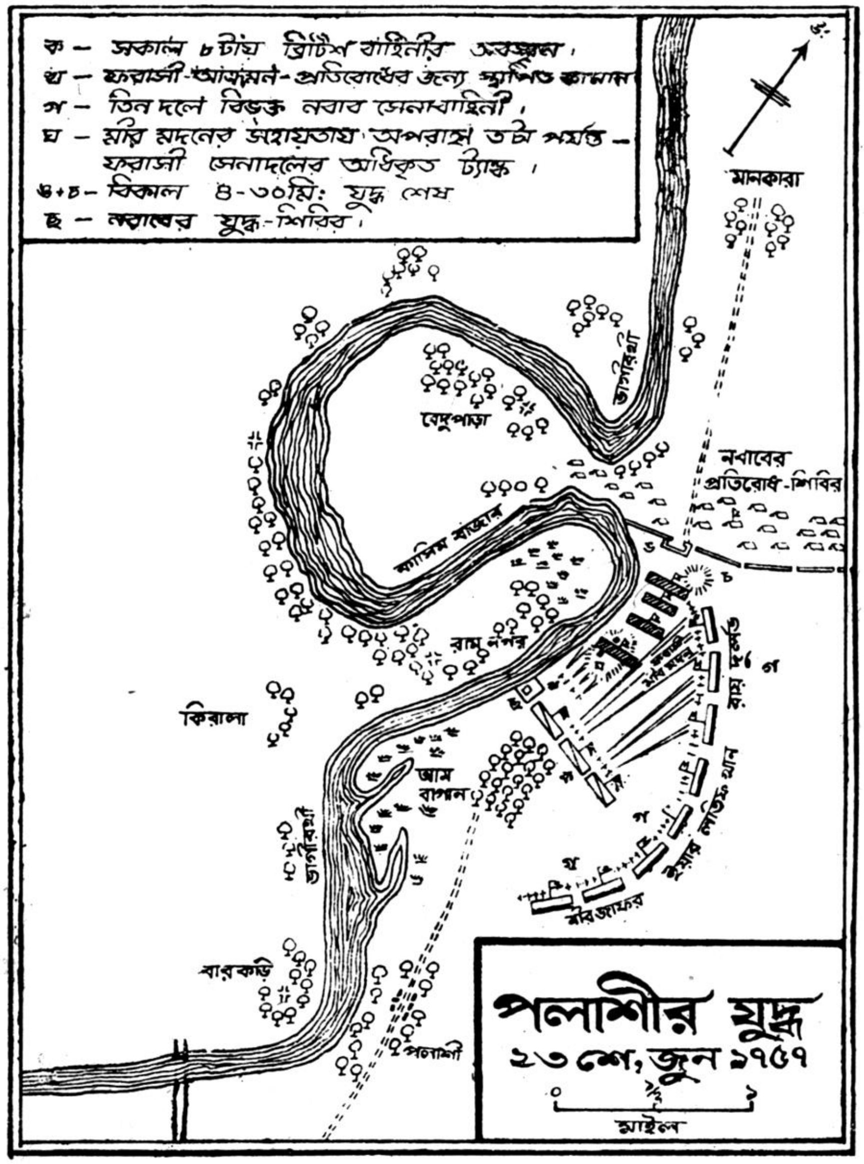

পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র

নবাবের পতনের কারণ

রবার্ট ক্লাইভ আলীনগর সন্ধি নবাবের দুর্বলতার প্রকাশ বলে ধরে নেয়। ফলে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লব, নবাবের সেনাপতি মীরজাফর প্রমুখ। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আমবাগানে নবাবের সঙ্গে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নবাবের পক্ষে ছিলেন দেশপ্রেমিক মীরমদন, মোহন লাল এবং ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে। জেতার সবধরণের সুযোগ সুবিধা এবং এদের প্রাণপাত লড়াইয়ের পরও নবাব পরাজিত হন তার সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। এ যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- নবাবের সেনাপতি মীরজাফরের অসহযোগিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।
- নবাবের সেনাপতি, সভাসদসহ প্রত্যেকে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজ নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন।
- তরুণ নবাবের অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তার অভাব ছিল। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- সেনাপতি মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা জানা সত্ত্বেও তিনি বার বার তার উপর নির্ভর করেছেন।
- ইংরেজদের সম্পর্কে আলীবর্দী খানের উপদেশ, সতর্কবাণী সিরাজউদ্দৌলার কাছে গুরুত্ব পায়নি।

- নবাবের শত্রু পক্ষ ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের রণকৌশল ছিল উন্নততর।
- রবার্ট ক্লাইভ ছিল দূরদর্শী, সূক্ষ্ম ও কূট বুদ্ধিসম্পন্ন।

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল

- সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু বাংলায় প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের পথ সুগম করে।
- যুদ্ধের ফলে মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসালেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল রবার্ট ক্লাইভের হাতে।
- পলাশী যুদ্ধের ফলে ইংরেজ বা বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পায়। অপরদিকে ফরাসিরা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।
- এ যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তির স্বার্থে এদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে।
- পলাশী যুদ্ধের সুদূর প্রসারী পরিণতি ছিল সমগ্র উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা। এ ভাবেই এ যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পলাশীর যুদ্ধ একটি খন্ডযুদ্ধ হলেও বাংলা তথা উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূর প্রসারী।

বক্সারের যুদ্ধের কারণ

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক কোম্পানি মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। কিন্তু যে উদ্দেশে মীর জাফরকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল কোম্পানির সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নতুন নবাব কোম্পানির চাহিদা মতো অর্থ দিতে ব্যর্থ হয়। অপর দিকে রাজকার্যে ক্লাইভের ঘন ঘন হস্তক্ষেপ, নবাবের পছন্দ ছিল না। ফলে নবাব ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য গোপনে ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁতাত করেন। বিষয়টি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে তারা নতুন নবাবের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অক্ষমতা, ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁতাত এবং অযোগ্যতার অভিযোগ তোলে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইংরেজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে শর্ত সাপেক্ষে সিংহাসনে বসান। কিন্তু মীর কাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি চেয়ে ছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করে আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। এ উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ গুলোই শেষ পর্যন্ত বক্সারের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

মীর জাফর

- মীর কাশিম ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং প্রশাসনকে প্রভাবমুক্ত করার উদ্দেশে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ করেন এবং রাজধানী চারদিকে পরিখা খনন করেন।
- ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা এবং সৈনিকদের ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য দুজন ইউরোপীয় সৈনিককে প্রশিক্ষক হিসেবে রাখেন।
- অস্ত্র গোলাবারুদের জন্য যাতে কারো উপর নির্ভর করতে না হয় সেজন্য রাজধানীতে কামান, বন্দুক ইত্যাদি তৈরির ব্যবস্থা করেন।
- বিহারের শাসনকর্তা রাম নারায়ণ ইংরেজদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখালে তাকে পদচ্যুত ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
- ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাটের ফরমানে ইংরেজদের ব্যবসায় করার যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল তারা তার অপব্যবহার করা শুরু করে। দস্তক নামের ছাড়পত্রের অপব্যবহারের ফলে দেশি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ফলে, নবাব সবার জন্য এক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশীয় বণিকদের জন্যও সবধরণের শুল্ক উঠিয়ে দেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া লাভজনক ব্যবসায় অসুবিধা হয়। এ বিষয়ে নবাব কোনোরকম আপোষ করতে না চাইলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হযে পড়ে।
- নবাবের সকল পদক্ষেপ ছিল দেশ ও জনগণের স্বার্থে, কিন্তু ইংরেজ স্বার্থবিরোধী। ফলে ক্ষুব্ধ ইংরেজরা এর প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

বক্সারের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

নবাবের ইংরেজ স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে পাটনা কুঠিরের অধ্যক্ষ এলিস ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে পাটনা দখল করে নেয়। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া নবাবের আর কোনো উপায় থাকে না। মীর কাশিম সফল প্রতিরোধের মাধ্যমে এলিসকে পাটনা থেকে বিতাড়িত করেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে নবাব শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ইতোমধ্যে ইংরেজরা মীর জাফরকে আবার বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম পরাজিত হয়েও হতাশ হননি। নবাব ইংরেজদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধ যুদ্ধে লিপ্ত হন যা ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মিলিত বাহিনী, মেজর মনরোর কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়। মীর কাশিমের পরাজয়ের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ধারের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংরেজ শক্তি অপ্রতিরুধ্য গতিতে বাংলা তথা উপমহাদেশের সর্বত্র ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে থাকে। এ কারণে উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি।

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল

বক্সারের যুদ্ধ উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সুদূর প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- এ যুদ্ধের ফলে মীর কাশিমের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপমহাদেশে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিনা বাধায় তারা উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।
- এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখন্ডে পালিয়ে যান। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। মীর কাশিম পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন।
- ইংরজরা অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে কারা এলাহাবাদ হস্তগত করতে সক্ষম হয়।
- এ যুদ্ধের ফলে শুধু বাংলার নবাবই পরাজিত হননি, তাঁর মিত্র ভারত সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা পরাজিত হন। এই তিন শক্তির একসঙ্গে পরাজয়ের কারণে ইংরেজদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- এ যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লি সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত হয় এবং তারা অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে থাকে।

বক্সারের যুদ্ধ মীর কাশিমের শাসন এবং নবাবী আমলেরই শুধু পরিসমাপ্তি ঘটায়নি, মুঘল সম্রাটের দুর্বলতাও ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে দ্রুতগতিতে ইংরেজদের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• পলাশীযুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এবং তার পক্ষে অবস্থানকারীদের একটি চার্ট তৈরি করতে হবে। • বক্সারের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম ও তাদের দেশের নাম পাশাপাশি রেখে একটি ছক প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের কারণে বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। তবে পলাশীর বিজয়ে কোম্পানির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হয়নি। সে জন্য তাকে আরো একটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। মীর জাফর ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে তাকে সরিয়ে মীর কাশিমকে সিংহাসনে শর্তসাপেক্ষে বসানো হয়। স্বাধীনচেতা মীর কাশিম ইংরেজদের অনুগত না হয়ে স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাংলার নবাব একা পরাজিত হননি তাঁর সাথে তার মিত্র দিল্লির সম্রাট শাহ আলম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হন। এই তিন শক্তির এক সঙ্গে পরাজয়ের কারণে ইংরেজদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ সুনিশ্চিত হয়। যার পরিণতিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একশবছর অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই উপমহাদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পলাশীযুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?

ক) ১৭৫৬, ১৩ জুন
খ) ১৭৫৭, ২৩ জুন
গ) ১৭৬৪, ১২ জুন
ঘ) ১৭৬৩, ৩০ জুন

২। পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারতে−

ক) বাংলার স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান হয়
খ) বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়
গ) মুঘল সম্রাটদের ক্ষমতা সুসংহত হয়
ঘ) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের পথ প্রশস্ত হয়

৩। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পক্ষে প্রাণপণ যুদ্ধ পরিচালনা করেন− (অনুধাবন)

i) মীর জাফর ii) মীর মদন iii) মোহন লাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

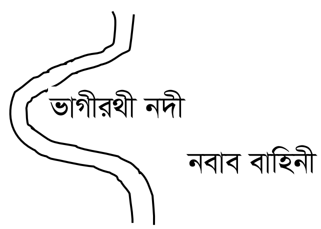

৪। উপরের চিত্রটি কোন যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত?

ক) পলাশীর যুদ্ধ
খ) বক্সারের যুদ্ধ
গ) গিরিয়ার যুদ্ধ
ঘ) ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ

৫। উক্ত যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়

i) ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ii) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে iii) অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

৬। ‘ক’ নামের একটি দেশের সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে জাতি গোষ্ঠী আসতে থাকে। একপর্যায়ে ক দেশের সাথে আগত খ দলের যুদ্ধ হয়। ক দলের সৈন্য রসদ বেশি থাকলেও তাদের দুই জন সেনাপতি রোবটরূপী সেনা মোতায়েন করে যাদের মেমোরিতে যুদ্ধ না করার কমান্ড থাকায় তারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে ক দলের দুঃখজনক পরাজয় ঘটে ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়।

ক. সিরাজউদ্দৌলা কবে বাংলার মসনদে আরোহন করেন?
খ. ষোড়শ শতকে অনেক ইউরোপীয় জাতি বাংলায় এসেছিল কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধটি পাঠ্য বইয়ের যে যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি সে যুদ্ধের মূল কারণ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. “উক্ত যুদ্ধই বাংলার স্বাধীনতা সূর্যকে দুইশত বছরের জন্য ছিনিয়ে নেয়”− মতামত দিন।

পাঠ-৮.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	এক সালা বন্দোবস্ত, পাঁচ সালা বন্দোবস্ত, দশ সালা বন্দোবস্ত, জমিদার, অনুপস্থিত জমিদার, প্রজাস্বত্ব আইন, পুঁজি, সূর্যাস্ত আইন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি:

লর্ড কর্নওয়ালিসকে কোম্পানির শাসন দুর্নীতিমুক্ত ও সুসংগঠিত করতে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনা প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ বছর ২২ মার্চ নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের নিজ নিজ জমির উপর স্থায়ী মালিকানা দান করে যে ভূমি বন্দোবস্ত চালু করা হয় তাকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলা হয়।

লর্ড কর্নওয়ালিস

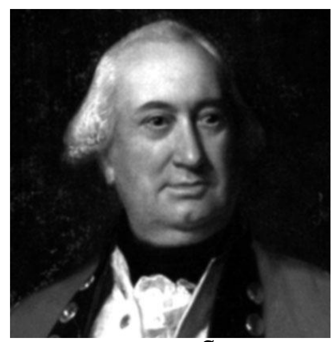
ওয়ারেন হেস্টিংস

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। জমি বন্দোবস্তের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকায় জমিদাররা অর্থ আদায়ের জন্য কৃষকদের প্রতি চরম নির্যাতন মূলক ব্যবস্থা নিতো। অথচ কৃষকের বা জমির উন্নয়নের প্রতি তাদের কোনো লক্ষ ছিল না। ফলে নির্যাতনের ভয়ে কৃষকরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যেতো। বছরের পর বছর জমি অনাবাদিথাকায় জমির দাম কমে যেতে থাকে।এ অবস্থায় হেস্টিংস জমিদারদের সঙ্গে এক সালা বন্দোবস্ত চালু করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায়ও সরকার, জমিদার, প্রজা কারো কোনো ধরনের উপকার হয়নি। ফলে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব সমস্যা সমাধানের জন্য ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা করতে থাকে।এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিটের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ জমিদারদের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্তের অনুমতি প্রদান করে। এই অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। একই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর অনুমোদন লাভ করে, কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করেন।

বৈশিষ্ট্য

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জমির স্থায়ী মালিকে পরিণত করে এবং জমিদাররা জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।
- রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়ার ফলে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমিদার জমিদারী ভোগের চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করে।

- এ প্রথা চালু হওয়ার ফলে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। সরকার স্বয়ং শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- নজরানা ও বিক্রয় ফি সমূহ বাতিল করা হয়।
- খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের ভূমির কিছু অংশ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা ছিল।

ফলাফল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। কর্নওয়ালিস জমিদার ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও একটি জমিদার শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপ আর উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও তার বিকাশের ধরণ এক ছিল না। ফলে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া এ ব্যবস্থায় সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হয়েছিল বেশি।

সুবিধা

- এ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে সরকারের রাজস্ব আয় সুনির্দিষ্ট হওয়ার ফলে সরকার তার আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি কোম্পানির একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠে। ফলে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়করণ এবং দীর্ঘায়িতকরণে জমিদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।
- জমিদাররা জমির মালিক হওয়ার কারণে উৎসাহিত হয়ে পতিত জমি, জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির রাজস্বের উন্নতি হয়।

অসুবিধা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। তারা ধীরে ধীরে ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। কিন্তু অপর দিকে জমিতে প্রজাদের পুরোনো স্বত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ফলে জমিদার ইচ্ছে করলেই যেকোনো সময় তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। প্রথম দিকে প্রজাস্বত্ব আইন না থাকায় তাদের ভাগ্যের জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করতো।

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির সঠিক জরিপের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় নিষ্কর জমির উপর বেশি রাজস্ব ধার্য করা হতো। জমির সীমা নির্ধারিত না থাকায় পরবর্তিকালে মামলা বিবাদ দেখা দিতো।
- সূর্যাস্ত আইনে নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা পরিশোধ করার কঠোর নিয়মের কারণে অনেক বড় বড় জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একমাত্র বর্ধমানের জমিদারী ছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাত বছরের মধ্যে অন্যান্য সব জমিদারী ধ্বংস হযে যায়।
- জমিদারি আয় ও স্বত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জমিদাররা নায়েব-গোমস্তার উপর দায়িত্ব দিয়ে শহরে বসবাস শুরু করেন। এইসব অনুপস্থিত জমিদারদের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে জমির উৎপাদন কমে যেতে থাকে, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ হতে থাকে।
- উপমহাদেশে জমির মালিকানা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। ফলে নিম্নবর্ণের অনেক ব্যক্তি, সাধারণ মানুষ যারা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালিক হন, তারা জমিদারী কিনে আভিজাত্যের মর্যাদালাভে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে দেশীয় পুঁজি, দেশীয় শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা সরাসরি জমিদার কর্তৃক শোষিত হতে থাকে। আবার এই জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে গ্রামীন সমাজে একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠছিল, যারা পরবর্তী সময়ে দেশ জাতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি যারা প্রথমদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত ভিত ছিল, তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ রাজ উৎখাতের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি ও প্রজাদের কী ধরণের ক্ষতি হয়েছিল এবং জমিদারদের কী ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল

সারসংক্ষেপ

ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্ত এবং একসালা বন্দোবস্ত করে ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। তবে এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে কর্নওয়ালিস প্রথমে দশসালা পরে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল হলেও বাংলার সাধারণ কৃষক এমনকি অনেক সম্ভ্রান্ত বনেদি জমিদার সর্বশান্ত হয়ে যায়। নবসৃষ্ট জমিদার শ্রেণি ইংরেজ শাসন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও এদের পরবর্তী প্রজন্ম, সুশিক্ষিত সচেতন শ্রেণি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতারণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা নেতৃত্ব ছিল মুখ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক কে?
ক) লর্ড ক্লাইভ
খ) লর্ড কর্নওয়ালিস
গ) লর্ড রিপন
ঘ) লর্ড ডালহৌসি

২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল−
ক) ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত
খ) বাণিজ্য সংক্রান্ত বন্দোবস্ত
গ) শাসন সংক্রান্ত বন্দোবস্ত
ঘ) শিল্প সংক্রান্ত বন্দোবস্ত

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে−
i) জমিদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়
ii) প্রজাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়
iii) প্রজাদের পুরানো স্বত্ব বিলুপ্ত হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কে জমির মালিক হয়েছিল− (জ্ঞানমূলক)
ক) কৃষক
খ) নবাব
গ) জমিদার
ঘ) সম্রাট

৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানি আয় কেমন ছিল (অনুধাবন)
ক) কম
খ) বেশি
গ) নির্দিষ্ট
ঘ) অনির্দিষ্ট

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

চাপিতলার প্রজাবৎসল জমিদার কাশেম ভূঁইয়া সর্বদা প্রজার পাশে থাকতেন কিন্তু একদিন নির্দিষ্ট দিনে খাজনা জমা দিতে ব্যর্থ হলে তার জমিদারি নিলামে ওঠে, নিলামে জমিদারি কিনে নেন ব্যবসায়ী শংকর মজুমদার। তিনি প্রজাদের জোর করে হলেও নিয়মিত খাজনা আদায় করতেন।

৬। কাশেম সাহেবের জমিদারি নিলামে ওঠে কোন আইনের বলে–

ক) সূর্যাস্ত আইন খ) ইলবার্ট বিল
গ) রওলাট আইন ঘ) নিয়ামক আইন

৭। কাশেম সাহেব যে আইনের বলে জমিদারি হারান সে আইনের উদ্যোক্ত কে?

ক) ওয়ারেন হেস্টিংস খ) জন কাটিয়ার
গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড ক্লাইভ

সৃজনশীল

হাবীব সাহেব তাঁর মেডিকো নামের ঔষধের দোকানটিতে যতাযথভাবে সময় না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাই তিনি ১টি চুক্তি পত্রের মাধ্যমে ইকবাল সাহেবের নিকট দোকানটি হস্তান্তর করেন। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলো। উক্ত চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাড়ার অর্থ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু ইকবাল সাহেব নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে দোকানটি হাতছাড়া হয়ে যায়। কর্ম হারিয়ে তিনি হন সর্বস্বান্ত।

ক. একসালা বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন?

খ. পাঁচসালা বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের গৃহিত পদক্ষেপ লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত কোন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উক্ত ব্যবস্থায় যে নতুন জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটে তারা ইংরেজদের ক্ষমতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল – মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. গ

বাংলায় ইংরেজ শাসনের প্রভাব

ইউনিট ৯

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে ইংরেজরা শুধু এদশের রাজনৈতিক ক্ষমতাই দখল করেনি; শুরু করে চরম অর্থনৈতিক শোষণ। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়ে, এ শোষণের পথ আরো প্রশস্ত হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা লাভের আগেই ঘুষ, ভেট, ব্যক্তিগত পারিতোষক, ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি আদায়ের নামে নবাব, নবাবের পরিবার এবং সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবার গুলোকে প্রায় নিঃস্ব করে ফেলে। একই সঙ্গে বাণিজ্যিক কোম্পানি হিসেবে নিজেদের বাণিজ্যের স্বার্থে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া শুরু করে, এদেশের বস্ত্র শিল্প, কুঠির শিল্প, চিনি, লবণ শিল্প ইত্যাদিকে। ক্ষমতা লাভের পর দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা নামের এই অভিনব ব্যবস্থায় চরম দারিদ্রের শিকার হয় বাংলার কৃষকরা। এই ব্যবস্থার মর্মান্তিক প্রকাশ ঘটেছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে। যে দুর্ভিক্ষে বাংলার একতৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতালাভের পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চলে কান্ডজ্ঞানহীন শোষণ।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আইন ও সংস্কারের মাধ্যমে যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়, তাও ছিল ইংরেজ শাসন শোষণের স্বার্থে। সত্যিকার অর্থে প্রায় দুইশ বছর ব্রিটিশ শাসন কালে যা কিছু উন্নতি হয়েছে সব কিছু ব্রিটিশ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক স্বার্থে হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ ঃ অর্থনৈতিক শোষণ ও দুর্ভিক্ষ
পাঠ-৯.২ ঃ বাংলায় ইংরেজদের সংস্কার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

পাঠ-৯.১ অর্থনৈতিক শোষণ ও দুর্ভিক্ষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- দ্বৈত শাসন সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- দুর্ভিক্ষের বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বস্ত্রশিল্প, চরকা, তাঁত, লবণ শিল্প, কাঁচামাল, মুদ্রা অর্থনীতি, শিল্পবিপ্লব, মহাজন শ্রেণি, দ্বৈত শাসন, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, দেওয়ান

১.১. অর্থনৈতিক শোষণ

মধ্যযুগে বাংলায় যে সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল তা কোম্পানির শোষণ শাসনের কারণে ভেঙ্গে পড়ে। বাংলার অভিজাত পরিবার থেকে কৃষক পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় বাংলার কুটির শিল্প, বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, নতুন শিল্প গড়ে ওঠার প্রবণতা।

সতেরো এবং আঠারো শতকে যখন ইংরেজ কোম্পানি ধীরে ধীরে এ অঞ্চল গ্রাস করার পাঁয়তারা করছে তখনও বাংলা ছিল বস্ত্র শিল্প সমৃদ্ধ এবং বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিযোগ্য অঞ্চল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যবসায়ই ছিল এদেশ থেকে নামমাত্র মূল্যে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয় করে প্রচুর লাভের বিনিময়ে এ সমস্ত পণ্য ব্রিটেন অথবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিক্রি করা। ঐ সময় বিশেষ করে বাংলা বিহারের চরকা এবং হাতে চালিত তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো বস্ত্রশিল্প ইংল্যান্ড কেন, সমগ্র ইউরোপে কোথাও প্রস্তুত হতো না। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত এই সমস্ত বস্ত্র ব্রিটেন ও ইউরোপের বাজার প্লাবিত করে ফেলে। অপর দিকে ইউরোপে প্রস্তুত নিম্নমানের বস্ত্র বাংলার উন্নতমানের বস্ত্রের কাছে মার খেতে থাকে এই অবস্থায় ব্রিটিশ বস্ত্র শিল্পের মালিকরা বাংলা তথা ভারতীয় বস্ত্র আমদানির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে ধীরে ধীরে ব্রিটেনের বাজারে এ অঞ্চলে প্রস্তুত বস্ত্র প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া বাংলা তথা ভারতবর্ষ থেকে লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ ব্রিটেনের কলকারখানায় বিনিয়োগের ফলে ব্রিটেনে শুরু হয় অভূতপূর্ব বিপ্লব ইতিহাসে যা শিল্পবিপ্লব নামে খ্যাত। শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল এবং নিশ্চিত এক বাজারের। আর সে বাজার এমন হবে যা হারাবার শংকা কম। অধিকৃত বাংলা তথা ভারতবর্ষ পরিণত হলো ব্রিটিশ পণ্যের সেই বিশাল নিশ্চিত বাজারে। ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থে বলি হতে হলো বাংলার বস্ত্রশিল্পকে, বন্ধ হয়ে গেল এর উজ্জ্বলতম সম্ভাবনার দ্বার।

অপরদিকে বাংলার বস্ত্রশিল্প থেকে লবণ শিল্প পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর বাংলার জনগণের কৃষি ছাড়া আর কোনো জীবিকার উপর নির্ভল করার উপায় ছিল না। অথচ আকস্মিক ভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থার ফলে বাংলার কৃষক শ্রেণি একদিকে সর্বগ্রাসী জমিদার শ্রেণি এবং অপরদিকে ব্রিটিশ পণ্যের নির্মম শোষণের অসহায় শিকারে পরিণত হয়। ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনের মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শোষণ; এই শোষণ নির্বিঘ্ন করার জন্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন আনা হয়। আর এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য ছিল একটাই– বিশেষ অর্থনৈতিক শোষণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। যার ফলে এটা প্রায় নিয়ম হয়ে যায় যে ভারতীয় কৃষক কেবল ব্রিটিশ শিল্প কারখানাগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করবে আর তাদের কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ ক্রয় করবে। তাছাড়া মুদ্রা অর্থনীতি চালু এবং শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে হাজার বছরের প্রাচীন গ্রাম সমাজ ধ্বংস হয়ে যায়। ব্রিটিশ ভারতে কৃষকদের তিন ধরনের শোষকের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন: প্রথম ব্রিটিশ শাসক শ্রেণি, যারা আদায় করত ভূমি রাজস্ব। দ্বিতীয় জমিদার শ্রেণি; যারা আদায় করত খাজনা এবং তৃতীয় শোষক মহাজন শ্রেণি, যাদের দিতে হতো ঋণের সুদ হিসেবে কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের সবটাই। এভাবে ইংরেজ শাসকদের অর্থনৈতিক শোষণে শিকার হয়ে অভিজাত, কুটিরশিল্প-শ্রমিক, কৃষক নিঃস্ব হয়ে যায়। বাংলা তথা ভারতীয় জনগণ পরিণত হয় বিরাট এক দরিদ্র জনগোষ্ঠিতে।

১.২ কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরাই বাংলার সত্যিকার শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এ সময়ে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লাভে সক্ষম হয়। মূলত বক্সারের যুদ্ধে বাংলার নবাব, অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাটের পরাজয় ইংরেজ শক্তিকে এই ক্ষমতা লাভের সুযোগ করে দেয়। মুঘল শাসন আমলে বাংলার দেওয়ানের পদ এবং সুবেদারের পদ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত ছিল। মুর্শিদ কুলি খান এই নিয়ম ভেঙ্গে দুটি পদ একাই দখল করে নেন। তার সময় কেন্দ্রে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো হলেও পরবর্তিকালে অনেকেই তা বন্ধ করে দেন। আলীবর্দী খানের সময় থেকে একবারেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট কোম্পানিকে বাৎসরিক উপঢৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণের অনুরোধ করেন। তখন কোম্পানি বিষয়টি অগ্রাহ্য করে। কিন্তু বক্সারের যুধের পর ক্লাইভ দ্বিতীয়বার (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ) ভারতবর্ষে এলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

ক্লাইভ দেশ থেকে ফিরে প্রথমেই পরাজিত অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লীর সম্রাটের দিকে নজর দেন। তিনি অযোধ্যার পরাজিত নবাবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। তার বিনিময়ে আদায় করে নেন কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অপরদিকে দেওয়ানি শর্ত সম্পর্কিত দুটি চুক্তি করেন। একটি দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের

সঙ্গে, এতে কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি দান করা হয়। এর বিনিময়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নবাব প্রতিবছর সম্রাটকে পাঠাবেন। এই টাকা নিয়মিত পাঠাবার জামিনদার হবে কোম্পানি। ইতিহাসে এটি এলাহাবাদ চুক্তি নামে পরিচিত। অপর চুক্তিটি হয় মীর জাফরের নাবালক পুত্র নবাব নাজিম-উদ-দ্দৌলার সঙ্গে। বাৎসরিক তেপ্পান্ন লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাব কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সকল শর্ত মেনে নেন। এই দুটি চুক্তির ফলে যে দেওয়ানি লাভ করা হয় তাতে এ অঞ্চলে কোম্পানির ক্ষমতা একচেটিয়া বৃদ্ধি পায়। ফলে সমস্ত ক্ষমতা চলে যায় কোম্পানির হাতে। অপরদিকে দেওয়ানি লাভের ফলে কোম্পানির যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানির সমস্ত খরচ কুলিয়ে ব্যবসায়ের সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সুতরাং দেওয়ানির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে–

- দেওয়ানি লাভ কোম্পানির শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশাল বিজয়।
- সম্রাট ও নবাব উভয়েই ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে তারা হয়ে যান কোম্পানির পেনশনভোগী কর্মচারী।
- দেওয়ানি লাভের ফলে এবং নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী শুল্কহীন বাণিজ্যের কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের অর্থ লোভ দিনদিন বেড়ে যেতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে দেশীয় বণিক শ্রেণি, সাধারণ মানুষ। তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।
- দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। এর পরিমাণ এতটাই ছিল যে এই অর্থের বলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

দ্বৈত শাসন ও দুর্ভিক্ষ

রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানি সনদের নামে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে। দিল্লি কর্তৃক বিদেশি বণিক কোম্পানিকে এই অভাবিত ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। অর্থাৎ যাতে করে কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব পরিণত হন ক্ষমতাহীন শাসকে। অথচ নবাবের দায়িত্ব থেকে যায় ষোলআনা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। যার চরম মাসুল দিতে হয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠিকে। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। কোম্পানির মুর্শিদাবাদের প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের ভাষায় 'দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতিসত্য।' এই দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ মৃত্যু বরণ করে। অথচ ইংরেজ সরকার বাংলার জনগণকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং ১৭৬৫-৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল, দুর্ভিক্ষের বছরও রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ প্রায় তার কাছাকাছি ছিল। ফলে চরম শোষণ নির্যাতনে বাংলার মানুষ হত দরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। সারাদেশে শুরু হয় সীমাহীন বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ইংরেজ শাসনের সূচনায় দেওয়ানি লাভ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিষয়টির উপর একটি দলীয় বিতর্কের আয়োজন করুন।

সারসংক্ষেপ

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে উপমহাদেশের তিন শক্তি দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, বাংলার নবাব মীর কাশিমের পরাজয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখল এবং অর্থনৈতিক শোষণের পথ খুলে দেয়। কোম্পানির ক্ষমতা লাভের আগেই এ অঞ্চলের ব্যবসায় বাণিজ্য শিল্পের ক্ষতি করে নিজেদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালিয়ে যেতে থাকে। দেশীয় শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে কোম্পানির ক্ষমতা দখল, দেওয়ানি লাভ এ অঞ্চলের জনগণের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের বার্তা বয়ে নিয়ে আসে। এর ফলে যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু করা হয় তার ফল ভোগ করতে হয় জনগণকে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিদেশি কোম্পানির চরম অর্থনৈতিক শোষণে নিঃস্ব হয়ে যায় বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠি যারা কৃষি

কার্যের সঙ্গে যুক্ত। ফলে ভেঙ্গে পড়ে কৃষি ব্যবস্থা, দেখা দেয় সারা বাংলা ব্যাপী ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বান্তর নামে পরিচিত। যাতে মৃত্যুবরণ করে বাংলার একতৃতীয়াংশ মানুষ। কোম্পানির শোষণে, কোম্পানির স্বার্থে ধ্বংস করা হয় বাংলার বস্ত্রসহ অন্যান্য শিল্প। এবার কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতি পরিপূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। দ্বৈত শাসন নীতির প্রবর্তক কে? (জ্ঞানমূলক)
ক) বেন্টিঙ্ক খ) হেস্টিংস
গ) ক্লাইভ ঘ) কর্ণওয়ালিস

২। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলায় কত লোকের মৃত্যু ঘটে?
ক) এক-তৃতিয়াংশ খ) এক-চতুর্থাংশ
গ) এক-পঞ্চমাংশ ঘ) দুই-তৃতিয়াংশ

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আজও চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীনের আঁকা দুর্ভিক্ষের চিত্র ১৯৪৩ সকলের নিকট হৃদয়স্পর্শী হয়ে আছে। তার দুর্ভিক্ষের চিত্রগুলোতে অনাহারী মানুষের দুঃখ কষ্ট আর মৃত্যুর দৃশ্য সে সময়ে ভয়াবহতার এক জলন্ত দৃশ্যপট।

৩। উদ্দীপকের অনুরূপ যে দুর্ভিক্ষ কোম্পানির দ্বৈত শাসনামলে সংগটিত হয়, তা কী নামে পরিচিত?
ক) ছেচল্লিশের দুর্ভিক্ষ খ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর
গ) নব্বইয়ের দুর্ভিক্ষ ঘ) তেতাল্লিশের মন্বন্তর

৪। উক্ত দুর্ভিক্ষের পর ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান কে?
ক) লর্ড ক্লাইভ খ) ওয়ারেন হেস্টিংস
গ) লর্ড বেন্টিংক ঘ) কর্নওয়ালিস

সৃজনশীল প্রশ্ন

আন্তন ও আকরামের পিতার অবর্তমানে নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মুন ফিশারিজের মালিকানা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে বড়ভাই আন্তন নিজে ফিশারিজের পরিচালনার দায়িত্ব নেয় এবং ছোট ভাই আকরামকে সংসারের দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করে। কিন্তু ফিসারিজের আয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় সংসারে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা।

ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির মালিক হন কে?

খ) উদ্দীপকের দায়িত্ব গ্রহণ ও অর্পণের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনা সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।

গ) আপনি কি মনে করেন উক্ত ঘটনার মত ক্ষমতা ভাগাভাগির ঘটনা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

পাঠ-৯.২ বাংলায় ইংরেজিদের সংস্কার ও আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় ইংরেজদের সংস্কারসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তন বিষয়ে বিবরন দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রাজস্ব বোর্ড, রাজস্ব সংস্কার, কালেক্টর, দেওয়ানি, কাযি, মুফতি, জুড়ি ব্যবস্থা, কমিশনার, চার্লস-উড, ছোট লাট, সিভিল সার্ভিস, সতীদাহ প্রথা

২.১ বাংলায় ইংরেজদের সংস্কার: প্রায় দুশ বছর বাংলায় ইংরেজ শাসন আমলে যেমন তীব্র অর্থনৈতিক শোষণ রাজনৈতিক নিপীড়ণ চলেছে, তেমন বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতবর্ষকে একটি আধুনিক সমাজে পরিণত করার ভিত রচনা করা হয়েছে। তবে সবই করা হয়েছে ইংরেজ শাসকদের প্রয়োজন আর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে।

অর্থনৈতিক সংস্কার

কোম্পানি দেওয়ানি লাভের পর দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার নামে যে ভাবে রাজস্ব আদায় শুরু করে তার পরিণতি হয়েছিল ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (১৭৭৬ খ্রি:) ফলে নিঃস্ব কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় সম্ভব ছিল না। কোম্পানির স্বার্থে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানির ওপর ন্যস্ত করে। কোম্পানির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য নবাবের বাৎসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ টাকা থেকে ১৬ লক্ষ করা হয়। সিতাব রায় ও রেজা খানকে পদচ্যুত করা হয় এবং রাজস্ব বোর্ড গঠন করে রাজস্ব সংস্কার করা হয়। তাছাড়া কালেক্টরের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং দেওয়ানি মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। পাঁচসালা বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের জমি ইজারা দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ব্যর্থ হলে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদারদের ভূমির মালিক হিসেবে মেনে নেন। এবং তাদের বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা প্রদানের নিয়ম চালু করেন। এই ব্যবস্থার দোষগুণ থাকা সত্ত্বেও এর প্রভাব ছিল বাংলার আর্থসামাজিক কাঠামোয় সুদূর প্রসারী। কর্নওয়ালিস কোম্পানির স্বার্থে দুর্নীতি এবং অযোগ্য কর্মচারীদের পরিবর্তে দেশী বণিকদের কাছ থেকে সরাসরি পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের প্রথা চালু করেন।

বিচার ব্যবস্থা

কর্নওয়ালিসের সময় বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়, একে ফৌজদারি ও দেওয়ানি এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের ফলে সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। বাংলা বিহার এ উড়িষ্যাকে মোট ১২টি বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগে একটি ভ্রাম্যমান কোর্ট স্থাপন করা হয়। এই আদালতের প্রত্যেকটিতে দুজন ইংরেজ বিচারক এবং আইন ব্যাখ্যার জন্য কাযি ও মুফতি নিযুক্ত করা হয়। লর্ড বেটিঙ্ক সর্ব প্রথম বিচার কার্য ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেশীয়দের ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় সর্বপ্রথম জুড়ি ব্যবস্থার প্রবর্তণ করেন এবং ভারতীয়দের জুরির সদস্য নিযুক্ত করা হয়। একই সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষায় বিচারকার্য সমাধার নির্দেশ দেন।

প্রশাসনিক সংস্কার

কর্নওয়ালিসের সময় থেকেই প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুগঠিত ও সুসংহত করার চেষ্টা চলে। কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস কোড বা বিধি প্রণয়ন করেন। কর্নওয়ালিশ কোডে সরকারী কর্মচারীদের প্রশাসনিক নিয়ম নীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের প্রতি সদয় ছিলেন না। তাই তিনি কোনো ভারতীয়কে সরকারের উচ্চ পদে নিয়োগ দেননি। কর্নওয়ালিস পুলিশ বাহিনীকেও প্রশাসনের শৃঙ্খলা শান্তি রক্ষার স্বার্থে সুগঠিত করেন। তিনি জেলা প্রশাসকের ওপর পুলিশি ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্পণ করেন। জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা ও

নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দায়ী থাকতেন। কোলকাতার শান্তি শৃঙ্খলার জন্য একজন সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। পুলিশ প্রশাসনের এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

লর্ড বেন্টিঙ্ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি প্রশাসন ও বিচার বিভাগের আমূল পরিবর্তন আনেন। তিনি বাংলা প্রেসিডেন্সিকে ১০টি বিভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি বিভাগে একজন কমিশনার নিযুক্ত করেন। পরবর্তিকালে লর্ড ডালহৌসি ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করার জন্য বাংলায় একজন ছোট লাট নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ স্থাপন, শাসন ব্যবস্থার সুবিন্যাসের জন্য জেলার সৃষ্টি এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তাছাড়া সে সময়ে বেসরকারি কর্মচারীদের জন্য বিভাগীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়। তার সময়ই সর্ব প্রথম ভারতীয়দের জন্য প্রশাসনিক কার্যে নিয়োগের উদ্দেশ্যে সিভিল সার্ভিস নামক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা চালু করা হয়।

শিক্ষা সংস্কার

বাংলা তথা উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালুর কৃতিত্ব লর্ড বেন্টিঙ্কের। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী কোম্পানি শিক্ষার জন্য বছরে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। প্রথমে শুধু সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় শিক্ষা দান করা হতো। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা চালুর সমর্থক ছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সরকারি প্রচেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজি বিদ্যালয়, চিকিৎসা বিদ্যালয় ও আইন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা মেডিকেল কলেজ, হুগলী কলেজ, ঢাকা কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ, বহরমপুর কলেজ। ইংরেজি ভাষা প্রচলনের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে বাংলার শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটে। এর ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। অপরদিকে প্রচলিত ভাষায় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ব্যবস্থাও চালু করা হয়।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে চার্লস উডের শিক্ষা বিষয়ক নির্দেশ নামা (Education Despatch) প্রণয়ন করা হয়। যার ফসল হিসেবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। যাকে কেন্দ্র করে বাংলায় একটি উচ্চ শিক্ষিত দৃঢ়চেতা স্বাধীনতাকামী মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠতে থাকে।

সামাজিক সংস্কার

সংস্কারপন্থী বাঙালি নেতা ও শিক্ষিত শ্রেণির উদারবাদীদের সহযোগিতায় ইংরেজ শাসকরা সামাজিক ধর্মীয় অনেক অমানবিক প্রথা কুসংস্কার দূর করতে সক্ষম হন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক রাজা রামমোহন রায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদারপন্থী হিন্দু নেতৃবর্গ এবং সদর নিজামত আদালতের জজদের অকুণ্ঠ সমর্থনে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বরে সতীদাহ প্রথা রহিত করতে সক্ষম হন। স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো বিধবাকে স্বামীর সঙ্গে মরতে বাধ্য করলে তা আইনত দণ্ডনীয় বলে আইন জারি করা হয়। লর্ড এলেনবরা-এর সময়ে (১৮৪৩ খ্রিঃ) দাস প্রথা উচ্ছেদ করা হয়। পরবর্তী সময়ে দেবতার নামে শিশু হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। লর্ড ডালহৌসি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায় হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন পাস করে বিধবা বিবাহের প্রচলন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

যোগাযোগ ব্যবস্থার সংস্কার

কোম্পানি শাসনের শেষ দিকে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে 'উন্নয়নের যুগ' হিসেবে পরিচিত। এ সময় রেলসড়ক নির্মাণ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। তাছাড়া রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত করার জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে একটি পূর্ত বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে ব্রিটিশ পণ্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণের কারণে বন্দর উন্মুক্ত হয়, ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। এসব সংস্কার এ অঞ্চলের বিদেশী ইংরেজ শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধ করেছিল এবং তাদের রাজত্বকে করেছিল দীর্ঘায়িত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলায় ইংরেজদের সংস্কারের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। সামাজিক সংস্কারে সহযোগিতাকারী দুজন বাঙালির নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কোম্পানি শাসন আমলে বাংলায় তথা ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংস্কারগুলো করা হয়েছিল মূলত কোম্পানির স্বার্থে। এদেশে তাদের শাসন শোষণ দৃঢ় করার লক্ষ্যে। সামাজিক সংস্কারগুলো বেশিরভাগ হয়েছিল উদার পন্থী বাঙালি নেতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে। যেমন সতীদাহ প্রথা রদ বিধবা বিবাহ প্রচলন ইত্যাদি। তাছাড়া ইংরেজি শিক্ষার একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন রাজা রামহোমন রায়। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কারণেই বাংলায় একটি আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। যারা ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে পরবর্তিকালে দেশবাসীর অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চার্লস উডের নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয় কবে?
- ক) ১৮৩৫ খ) ১৮৫৪
- গ) ১৮৫৭ ঘ) ১৮৪৭

২। সতীদাহ প্রথায় সহমরণ কী? (অনুধাবন)
- ক) স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে দাহ করা খ) স্ত্রীর চিতায় স্বামীকে দাহ করা
- গ) পিতার মৃত্যুতে কন্যাকে চিতায় দাহ করা ঘ) প্রবাসে স্বামীর মৃত্যু সংবাদে স্ত্রীকে চিতায় দাহ করা

৩। বিধবা বিবাহ আইন পাস করেন কে?
- ক) লর্ড বেন্টিংক খ) লর্ড ডালহৌসি
- গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ) রাজা রামমোহন রায়

৪। কী কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ন হয়ে ওঠে?
- ক) বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতির জন্য খ) শাসনতান্ত্রিক দুর্বলতার জন্য
- গ) আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকায় ঘ) অসাধু উপায়ে অর্থোপার্জনের সুযোগ পেয়ে

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ ঃ ১. গ ২. ক ৩. খ ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ ঃ ১. ক ২. ক ৩. খ ৪. খ

বাংলায় কৃষক বিদ্রোহ

ইউনিট ১০

বাংলার কৃষকের জীবনে প্রাচুর্য ছিল না কখনও। জীবন ধারণ করতে পারত কোনভাবে। কিন্তু সে অবস্থারও ব্যাপক পরিবর্তন হতে থাকে সতের শতক থেকে। সতের ও আঠারো শতকে ইংরেজ বণিক শ্রেণির আগ্রাসন কেড়ে নিতে থাকে বাংলার কৃষকের মুখের হাসি, তাদের আনন্দ উৎসব। প্রথমে তারা ধ্বংস করেছিল গ্রাম বাংলার কুটির শিল্প, তারপর তাদের নজর পড়ে এদেশের উর্বর জমির উপর। অতিরিক্ত অর্থের লোভে ভূমি রাজস্ব আদায়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। যে পরীক্ষার নিষ্ঠুর বলি হয় বাংলার কৃষক, সাধারণ মানুষ। ফলে তীব্র শোষণে অসহায় কৃষক সাধারণ মানুষের বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এ বিদ্রোহ ক্রমাগত চলতে থাকে আঠারো শতকের শেষাবধি থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। এর সঙ্গে সঙ্গে সূত্রপাত ঘটে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের। যা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১০.১ ঃ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
পাঠ-১০.২ ঃ তিতুমীরের সংগ্রাম
পাঠ-১০.৩ ঃ নীল বিদ্রোহ
পাঠ-১০.৪ ঃ ফরায়েজি আন্দোলন

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

পাঠ-১০.১ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ফকির সন্ন্যাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- তিতুমীরের নেতৃত্বে ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহের কাহিনী বলতে পারবেন;
- নীল চাষীদের উপর চরম নির্যাতনের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফরায়েজি মতবাদ হাজী শরিয়ত উল্লাহর সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ভিক্ষাবৃত্তি মুষ্টি-সংগ্রহ, তীর্থস্থান, মজনুশাহ, ভবানীপাঠক, গেরিলা পদ্ধতি, লেফটেন্যান্ট ব্রেনান

ভূমিকা

ফকির-সন্ন্যাসীরা ছিল বাংলার অধিবাসী। এরা ছিল হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় ভুক্ত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এক একটি দল। এরা সাধনায় সিদ্ধি লাভের উদ্দেশ্যে সারা বছর দেশের একস্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াতো। ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে উভয় গোষ্ঠি পরিচিত ছিল। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিদ্রোহী হতে এবং অস্ত্র ধারণ করতে হয়। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ চলতে থাকে।

ফকির-সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কারণ

বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী বিদ্রোহ। আঠারো শতকের শেষার্ধে এই বিদ্রোহের শুরু। এর আগে নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চান। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম পালিয়ে গেলেও ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা তাদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতে থাকে। বাংলার ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের রীতি অনুযায়ী ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষে সারা বছর তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের সাথে নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অস্ত্র থাকত। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতে থাকে।

মজনু শাহের বিদ্রোহ

সন্ন্যাসীদের নেতা ভবানী পাঠক

তীর্থস্থান দর্শনের উপর করারোপ করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদেরকে ডাকাত-দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ। আর সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও নায়েব-গোমস্তার বাড়ি।

ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে। ১৭৭১ খ্রিস্টাব্দে মজনু শাহ সারা উত্তর বাংলায় ইংরেজ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। তবে এ আন্দোলনের তীব্রতা ছিল উত্তর বঙ্গে। এই সব অঞ্চলে ইংরেজদের সঙ্গে বিদ্রোহী ফকির-সন্ন্যাসীদের বহু সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। এ সব সংঘর্ষে বিদ্রোহীরা অনেক ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে এবং কোম্পানির বহু কুঠি লুঠ করে।

ফকির মজনু শাহর যুদ্ধ কৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি, অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবানশাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্স প্রমুখ ফকির। এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। অপরদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী-পাঠক ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। ফলে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

ব্যর্থতার কারণ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ফকির সন্ন্যাসীদের ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল তাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা ও দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব। তাছাড়া মজনু শাহর মৃত্যুর পরে ফকিরদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল ক্রমশ আন্দোলনকে দুর্বল করে দেয়। ফকির-সন্ন্যাসীরা কোনো এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল না। ফলে বিদ্রোহীরা স্থানীয়দের সহযোগিতা সহানুভূতি পেতে ব্যর্থ হয়। অস্ত্র, রণকৌশল সবদিক দিয়ে তারা ইংরেজ সৈন্যদের সমকক্ষ ছিল না। ফলে ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের উন্নত, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, রণকৌশল, সামরিক প্রযুক্তি এবং বিশাল সেনাবাহিনীর কাছে প্রাণপণ লড়াই করেও হেরে যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

ফকির সন্ন্যাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ছিল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বনের উপর কোম্পানি হস্তক্ষেপের কারণে তারা তাদের সনাতন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এ অবস্থায় নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। এই সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও, বিদেশী ইংরেজ শাসকদের নির্যাতনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে বাংলার সাধারণ নিঃস্ব মানুষের পক্ষ থেকে এটাই ছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফকির সন্যাসী বিদ্রোহ কতদিন ব্যাপি চলেছিল? (সময়কাল অনযায়ী)

ক) ১৭৬০ থেকে ১৭৭১ খ) ১৭৬০ থেকে ১৮০০
গ) ১৭৭৭ থেকে ১৮০০ ঘ) ১৭৮৭ থেকে ১৮০০ খ্রি:

২। ফকিরদের বিদ্রোহী দলের নেতা কে ছিলেন–

ক) বলাকি শাহ খ) চেরাগ আলী শাহ
গ) মজনুশাহ ঘ) মাদার বকস

৩। ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়- কারণ ইংরেজরা–

i) তাদেরকে ডাকাত বা দস্যু বলে চিহ্নিত করছিল
ii) তাদের তীর্থস্থান দর্শনে কর আরোপ করেছিল
iii) তাদের চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ তিতুমীরের সংগ্রাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- আন্দোলনের একটি বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এ আন্দোলনের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	তাহরিক-ই-মুহম্মদিয়া, ওয়াহাবি, মীর নিসার আলী, গোলাম মাসুম, বাঁশের কেল্লা, লাঠিয়াল বাহিনী, মেজর স্কট,

ভূমিকা

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় প্রায় একই সময়ে দুটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের শুরু হয়। পূর্ব বাংলার আন্দোলনটি ফরায়েজি আন্দোলন নামে পরিচিত। আর পশ্চিম বাংলার আন্দোলনের নাম ওয়াহাবি বা 'তারিক-ই-মুহম্মদীয়া'। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তিতুমীর। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে এ আন্দোলন শুরু এবং শেষ হয় ১৮৩১ ক্রিস্টাব্দে তিতুমীরের শাহাদাৎ বরণের মধ্য দিয়ে।

তিতুমীরের সংগ্রাম

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন ওয়াহাবি আন্দোলনের (তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া) জোয়ার চলছে, তখন পশ্চিম বঙ্গের বারাসাত অঞ্চলে তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের সঠিক পথ নির্দেশ করাই এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার ওয়াহাবিরাও তিতুমীরের নেতৃত্বে একই উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত 'তাহরিক-ই-মুহম্মদীয়া' আন্দোলন বা ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। তিতুমীর হজকরার জন্য মক্কা শরিফ যান এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে আসেন। দেশের ফিরে তিনি ধর্মীয় সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান, বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতী স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। ফলে জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের উপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নানা নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। তিতুমীর এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন ইতিহাস খ্যাত তাঁর বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী। ইংরেজ জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমীরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমীরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উঠে শাসক-শোষক, জমিদার শ্রেণি।

ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ

জমিদারদের প্ররোচনায় ইংরেজ সরকার তিতুমীর এবং তার অনুসারীদের দমনের জন্য বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠায়। কিন্তু তারা তিতুমীরের বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৫ জন ইংরেজ সৈন্য নিহত ও বহু আহত হয়। কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পাঠানো ইংরেজ বাহিনীও তিতুমীরের বাহিনীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন বড় লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে তিতুমীরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনা বাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমীরের নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে

পরাজিত হয় তিতুমীরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এ ভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংগঠিত কৃষক আন্দোলনের। এই যুদ্ধে তিতুমীরের ৫০ জন অনুসারী নিহত হন। গোলাম মাসুমসহ ২৫০ জনকে বন্দি করা হয়। পরে এক প্রহসনমূলক বিচারে গোলাম মাসুমকে ফাঁসি এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

তিতুমীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুদ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী প্রতিরোধের মুখে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক। যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	তিতুমীরের বিরুদ্ধে সশস্ত্রযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারি ব্যক্তিদের নাম লিখুন। নারিকেলবাড়িয়ার যুদ্ধে তিতুমীরের পক্ষের কতজন শহীদ, কতজন বন্দি এবং কয়জনের ফাঁসি হয় তার তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

তিতুমীরের পরিচালিত তাহরিক-ই-মুহাম্মদীয়া বা ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার। পরবর্তিতে এটি একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। যা শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। ইংরেজ সরকার, জমিদার নীলকরদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের মুখে তিতুমীর ও তার বাহিনী পরাজিত হয়। এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও পরবর্তিকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সংগ্রাম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় গুরুত্ব এটাই।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের নাম কী?
ক) তাহরিক-ই-মুহাম্মদিয়া খ) ফরায়েজি গ) খিলাফত ঘ) ওয়াহাবি

২। তিতুমিরের দুর্গ কিসের তৈরি ছিল? (অনুধানব)
ক) ইটের খ) মাটির গ) বাঁশের ঘ) টিনের

৩। বাংলার ওয়াহাবি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল (অনুধাবন)?
i) তিতুমীরের নেতৃত্বে ii) হাজী শরিয়তউল্লাহর নেতৃত্বে iii) মজনু শাহের নেতৃত্বে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। তিতুমীরের প্রকৃত/আসল নাম কী? (জ্ঞান)
ক) আমির আলী খ) মীর নিসার আলী গ) মাওলানা মোহাম্মদ আলী ঘ) মাওলানা শওকত আলী

সৃজনশীল প্রশ্ন

মুক্তিযোদ্ধা মাখন কুদ্দুস ২০১৬ সালে রক্ত ঝড়া মার্চের এক শিক্ষার্থী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন মুক্তিযোদ্ধারা কঠিন আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করেছে। তারা ইতিহাসের একজন বীর যোদ্ধার আত্মত্যাগ থেকে প্রতিনিয়ত অনুপ্রেরণা লাভ করেছে সেই যোদ্ধা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন নিজস্ব চিন্তায় তৈরি কেল্লা তৈরি করে। আর বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বাঙালি শহীদ হিসেবে আজও অমর হয়ে আছেন।

ক. কোন গ্রামে তিতুমীর তাঁর প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন?

খ. তিতুমীর পরিচালিত আন্দোলনের উদ্দেশ্য কী ছিল ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকে পাঠ্য বইয়ের কোন যোদ্ধার কথা স্মরণ করা হয়েছে? ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে তার সবচাইতে বিখ্যাত দিকটি তুলে ধরুন।

ঘ. সকল স্বাধীনতা সংগ্রামে তার আত্মত্যাগ হবে অনুপ্রেরণার উৎস- আপনি কী একমত? যুক্তি দিন।

পাঠ-১০.৩ নীল বিদ্রোহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- নীল চাষের নামে কৃষকদের প্রতি অমানবিক অত্যাচার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- নীল চাষের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	খাদ্য ফসল, বাণিজ্য ফসল, নীল চাষি, নীলকর, দাদন, 'অনারারি', নীল কমিশন, 'ইন্ডিগো কন্ট্রাক্টস অ্যাক্ট'

ভূমিকা

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে। উপমহাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের শাসক হয়ে উঠে। তবে সব সময় তাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল সজাগ। এই সজাগ ব্যবসায়ী বুদ্ধির কারণেই বাংলার উর্বর ফসলের ক্ষেতে তাদের দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর ক্ষেত গুলোতে খাদ্য ফসলের (খাবার ফসল) পরিবর্তে বাণিজ্য ফসল (বাণিজ্যের জন্য যে ফসল) উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে। নীল ছিল তাদের সেই বাণিজ্য ফসল।

নীল চাষের কারণ

আঠারো শতকে নীল ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। বস্ত্রশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানে নীল চাষ করা সম্ভব ছিল না। ফলে তাদের বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা করতে হয়। বাংলায় নীল চাষ ছিল সেই বিকল্প চিন্তার ফসল। যে কারণে বাংলা হয়ে উঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় ইংরেজ আমলে নীল চাষ শুরু হয়।

কৃষক নীল চাষে বাধ্য হয়

বাংলার কৃষকদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে তাদের নীল চাষে বাধ্য করা। নীল চাষের জন্য নীলকররা কৃষকদের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিতো। কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রীম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশ পরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীল চাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো।

জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষের খরচও বৃদ্ধি পায় নীলকররা বিষয়টি বিবেচনায় রাখত না। তাছাড়া প্রথম দিকে তারা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নীল চাষ কৃষকদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তারা চরম অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায়। এসব বঞ্চনা আর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে কৃষকদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। আইন ছিল তাদের নাগালের বাইরে। আইন যারা প্রয়োগ করবেন। সেসব বিচারকদের বেশির ভাগ ছিল নীলকরদের নিজের দেশের লোক বা বন্ধু। আবার নীলকররাও অনেক সময় নিজেরাই অবৈতনিক (অনারারি) ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পেতেন। ফলে আইনের আশ্রয় বা সুবিচার পাওয়া কৃষকদের জন্য ছিল অসম্ভব। এ অবস্থায় নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক অভিনব অত্যাচারী জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীল চাষিকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

নীল চাষিদের বিদ্রোহ

চরম অত্যাচার আর শোষণে বিপর্যস্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এই সব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীল চাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেনী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলীতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই

ভাই। স্থানীয় পর্যায়ের এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের উপদেশও অগ্রাহ্য করে। এদিকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীল চাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষকদের জয়

প্রথম বারের মতো বাংলার সংগ্রামী বিদ্রোহী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। অর্থাৎ কৃষক নীল চাষ করতে না চাইলে তাকে বাধ্য করা যাবে না। তাছাড়া 'ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট অ্যাক্ট' বাতিল করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তিকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এদেশে নীলচাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	কোন কোন অঞ্চলে ব্যাপক নীল চাষ হতো? কী আবিষ্কারের ফলে নীল চাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়?

সারসংক্ষেপ

১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ নীলকরদের সীমাহীন অত্যাচার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে নীল চাষিরা যে শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তোলে তা-ই ইতিহাসে নীল বিদ্রোহ নামে খ্যাত। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর নেতৃত্ব দিয়েছিল স্থানীয় পর্যায়ের সাধারণ কৃষকরা। ফলে দেখা যায় যে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নেতা স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালিত করে। এই নেতৃত্ব এতটাই শক্তিশালী এবং সুসংহত ছিল যে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে নীলচাষ করা, না করা কৃষকদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয় এবং 'ইন্ডিগো কন্ট্রাক্টস অ্যাক্ক্ট' বাতিল করা হয়। ফলে নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নীল চাষিদের বিদ্রোহের প্রকাশ পায় কবে?

ক) ১৮৫৬ খ) ১৮৫৭ গ) ১৮৫৮ ঘ) ১৮৫৯

২। বাংলাদেশে একচেটিয়া নীলের ব্যবসা কাদের ছিল? (অনুধাবন)

ক) ফরাসি বণিকদের খ) ওলন্দাজ বলিকদের গ) ইংরেজ বণিকদের ঘ) বাঙালি বণিকদের

৩। নীল চাষকে কৃষকদের ইচ্ছাধীন করার ক্ষেত্রে কোন কমিশনটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগমূলক)

ক) সাদা কমিশন খ) সায়মন কমিশন গ) নীল কমিশন ঘ) চেমসফোর্ড কমিশন

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন। (অভিন্ন তথ্যভিত্তিক)

জমিদার দীপু মন্ডল জোর করে কৃষকদের দিয়ে তাঁর পছন্দের ফসল ফলাতে থাকে। এতে কৃষকরা নিজ স্বার্থ রক্ষায় এলাকার সাহসী সন্তান ননী ও রনীকে নিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

৪। উদ্দীপকের ন্যায় ভারতীয় উপমহাদেশে এ ধরণের একটি বিদ্রোহের নাম কী?

ক) কৃষক বিদ্রোহ খ) নীল বিদ্রোহ গ) ফকির বিদ্রোহ ঘ) সাওতাল বিদ্রোহ

৫। ইংরেজ শাসনে এই ধরণের একটি বিদ্রোহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো–

i) ইংরেজ সরকারকে এদেশীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল করা।

ii) ভারতীয়দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীল চাষ করানো বন্ধ হয়।

iii) স্থানীয় পর্যায়ে কৃষক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির ঐক্য গঠন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii গ) iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৪ ফরায়েজি আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ফরায়েজি আন্দোলন কী, তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফরায়েজি আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- ফরায়েজি আন্দোলনে হাজী শরিয়ত উল্লাহ ও দুদু মিয়ার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফরজ, 'দারুল-হারব', নুন-ভাতের দাবি, মুহাম্মদ মুহসিন উদ্দীন আহমদ, সশস্ত্র সংগ্রাম, ওস্তাদ, হলক।

ভূমিকা

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্ষমতা দখলের ফলে বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক ক্ষতি রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মতো শিক্ষাদীক্ষা ও সংস্কৃতিতেও বিপর্যয় নেমে আসে। শিক্ষার অভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন নানা ধরনের অনাচার কুসংস্কারে ভরে যায়। এ অবস্থায় মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য উনিশ শতকে বাংলায় যে সংস্কার আন্দোলন হয় তার মধ্যে ফরায়েজি আন্দোলন অন্যতম। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাজী শরিয়ত উল্লাহ। তাঁর মৃত্যুর পর দুদু মিয়া এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

আন্দোলনের পটভূমি

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরিয়াত উল্লাহ বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলায় ১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের উপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। তিনি ইসলাম ধর্মকে এসব কুসংস্কার আর অনৈসলামিক অনাচার মুক্ত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। এই প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এক ধর্মীয় সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজী শরিয়ত উল্লাহর এই সংস্কার আন্দোলনের নামই ফরায়েজি আন্দোলন।

ফরায়েজি মতবাদ

ফরায়েজি শব্দটি আরবি 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যাঁরা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি। আর বাংলায় যাঁরা হাজী শরিয়ত উল্লাহর অনুসারী ছিলেন, ইতিহাসে শুধু তাদেরকেই ফরায়েজি বলা হয়ে থাকে। শরিয়ত উল্লাহ যে ফরজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি অবশ্যপালনীয় (ফরজ) মৌলনীতি। এই মৌলনীতিগুলো হচ্ছে– ঈমান বা আল্লাহর একত্ব ও রিসালাতে বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান।

হাজী শরিয়ত উল্লাহ

তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পরেননি। শরিয়ত উল্লাহ ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' অর্থাৎ বিধর্মীর রাজ্য বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিধর্মী বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ফরায়েজি আন্দোলন

হাজী শরিয়ত উল্লাহর আহ্বানে বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতী, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শরিয়ত উল্লাহর উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠির আস্থা, বিশ্বাস এবং তাঁর অসাধারণ সাফল্য নিম্নশ্রেণির

জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে এবং নানা ধরনের কর আরোপ করে। তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশ জুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন। জমিদার শ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়েজি প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে শরিয়ত উল্লাহ প্রজাদের রক্ষার জন্য লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে তার উপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ফরায়েজি আন্দোলন ও দুদু মিয়া

হাজী শরিয়ত উল্লাহর মৃত্যুর পরে ফরায়েজি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাঁর যোগ্যপুত্র মুহম্মদ মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার মতো পন্ডিত না হলেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন একাধারে একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক শ্রেণির শোষণ মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। যার ফলে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত শুধু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ইংরেজ শাসকদের চরম অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণবিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। হাজার হাজার কৃষক জমিদার, নীলকর সাহেবদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য ফরায়েজি আন্দোলনে যোগদান করে। দুদুমিয়া ছিলেন ফরায়েজিদের গুরু বা ওস্তাদ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শান্তিপ্রিয় নীতি বাদ দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। ফরায়েজিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁর পিতার আমলের লাঠিয়াল জালালউদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ্য ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রবৃতি অঞ্চলগুলো নীল চাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এই অঞ্চলগুলোতে নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রাও ছিল দুঃসহ ফলে কৃষকরাও হয়ে উঠেছিল বিদ্রোহী। দুদু মিয়া তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করেছিলেন। কৃষক প্রজাসাধারণকে নিয়ে স্বাধীন সরকারের একটি সেনাবাহিনীও (লাঠিয়াল বাহিনী) তিনি গঠন করেন। ফরায়েজিদের সরকার ব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে কতগুলো হলকা বা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। দুদু মিয়া তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী জমিদার, নীলকর এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালিয়ে যান। দেশীয় জমিদাররা বিদেশি ইংরেজ শাসক ও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে থাকে। কিন্তু দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষী না পেয়ে তাকে বার বার মুক্তি দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে ইংরেজ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। ভীত ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দি হিসেবে কলকাতার কারাগারে আটকে রাখেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুক্তি পান এবং ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে এই দেশ প্রেমিক দুঃসাহসী বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ ভারতে বাঙালি মুসলমানদের নৈতিক চেতনা আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে ফরায়েজি আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। পরবর্তী সময়ে সবধরনের শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে এই আন্দোলন। সুতরাং নিসন্দেহে পরাধীন ভারতে বাঙালি মুসলমানের জন্য এই আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ফরায়েজি শব্দটি কোন আরবি শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ কী? কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি ফরজ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

ইংরেজ শাসন আমলে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অধঃপতনও ঘটে। ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে নানা ধরনের কুসংস্কার অনাচার প্রবেশ করে। এসব থেকে বাঙালি মুসলমানকে উদ্ধার এবং ইসলামের বিধান মতো তাদের পরিচালনার জন্যই হাজী শরিয়ত উল্লাহ ফরায়েজি আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর মৃত্যু পর দুদু মিয়ার

নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তাঁর সময়ে এটি কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয় এবং বিক্ষুব্ধ প্রতিরোধ আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

১। কার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন গড়ে উঠে?
   ক) হাজী শরিয়ত উল্লাহ   খ) মুহসিন উদ্দিন দুদুমিয়া
   গ) মীর নিসার আলী   ঘ) ফকির মজনু শাহ

২। হাজী শরিয়তউল্লাহ প্রদত্ত উপদেশ সমূহের মধ্যে নিচের কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য? (উচ্চতর দক্ষতা)
   ক) নিয়মিত নামাজ পড়া   খ) ভালো কাজ করা
   গ) জ্ঞানার্জন করা   ঘ) অবৈধ কর থেকে বিরত থাকা

   নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন। (প্রয়োগমূলক)

৩। জনাব মেহবুব উল্লাহ নিজ এলাকার কুপ্রথা ও ইসলাম বিবর্জিত কাজ দূর করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেন তার কার্যকলাপে কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।
   ক) ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের   খ) খিলাফত আন্দোলনের
   গ) ফরায়েজি আন্দোলনের   ঘ) তিতুমীরের আন্দোলনের

৪। হিন্দু প্রভাবিত সমাজ ব্যবস্থায় মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত ছিল– (অনুধাবন)
   i) পীরপুজা   ii) কবরপুজা   iii) মহররম মাসের তাজিয়া প্রথা

   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i ও ii   খ) i ও iii
   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

শাফকত সাহেব চাপিতলা গ্রামে তার সংস্কার কর্মকাণ্ডে জন্য আজও স্মরণীয়। এ গ্রামের শিক্ষার আলো বঞ্চিত মুসলিম গ্রামবাসীর মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার প্রভৃতি ছিল প্রবল। তারা পীর ফকিরদের মাজারে যাওয়া তাজিয়া নির্মাণসহ নানা কুসংস্কারে লিপ্ত ছিল তাছাড়া জমিদারদের জুলুমে তারা অতীষ্ঠ হয়ে ওঠে। শাফকত সাহেব তাদের অনৈসলামিক কাজ থেকে মুক্ত করতে এবং জুলুম বন্ধে এগিয়ে আসেন। তাঁর এ পদক্ষেপ ঢাকা কুমিল্লাসহ অনেক জায়গায় জনপ্রিয়তা লাভ করে।

ক. হাজী শরীয়ত উল্লাহ কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?
খ. নীল কমিশন কী? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্কারকের সাথে পাঠ্য বইয়ে উনিশ শতকে বাংলার কোন সংস্কারকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত সংস্কারকের আন্দোলনই কৃষক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়, আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.১ ঃ ১. খ ২. গ ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.২ ঃ ১. ক ২. গ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৩ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১০.৪ ঃ ১. ক ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ

বাংলায় নবযুগ

ইউনিট ১১

ভূমিকা

আঠারো শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে রক্তক্ষয়ী ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রিঃ) প্রভাব এসে পড়ে এ অঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এ সময়ে বাংলার কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরাই বাংলায় 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূচনা করেন। এই সময়ে বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সমাজ রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। বাংলার সর্ব ক্ষেত্রে দেখা দেয় পরিবর্তনের বিরাট সম্ভাবনা, যা ইঙ্গিত করে এক নবযুগের। এই নবযুগের জন্ম দিয়েছিলেন বাংলার একদল শিক্ষিত তরুণ যাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ। তাঁদের নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্রবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হতে থাকে। নবজাগরণের প্রভাবেই দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাঙালিকে তথা ভারতীয়দের স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ ঃ নবজাগরণ ও রাজা রামমোহন রায়
পাঠ-১১.২ ঃ ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
পাঠ-১১.৩ ঃ নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী
পাঠ-১১.৪ ঃ বেগম রোকেয়া

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

পাঠ-১১.১ নবজাগরণ ও রাজা রাম মোহন রায়

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলার 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- রাজা রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা ও তাঁর সংস্কার সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	রেনেসাঁ, নবজাগরণ, স্বাতন্ত্রবোধ, ব্রাহ্মধর্ম, আত্মীয় সভা, ব্রাহ্মসমাজ, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, এ্যাংলো হিন্দু কলেজ, মাদরাসা শিক্ষা

নবজাগরণ

উনিশ শতকে মানব সভ্যতার ইতিহাসে নতুন কোনো চিন্তা করার, নতুন কোনো আবিষ্কারের যুগ। এই শতকে ইউরোপে যে উদার নৈতিক চিন্তাধারা জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ হয়, তার ঢেউ এসে লাগে বাংলাদেশেও। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কোলকাতা হওয়াতে বাঙালিরাই প্রথম ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। ফলে ইউরোপের আধুনিক চিন্তাধারা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রভৃতির সঙ্গে বাঙালিদেরই প্রথম পরিচয় ঘটে এর কারণে চিন্তাশীল শিক্ষিত বাঙালিরা এই ভাব ধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হন। ফলে প্রচলিত মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা রীতিনীতি বাদ দিয়ে, বাঙালি শিক্ষিত সমাজে দেখা দেয় যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির।

এই সময় বাংলায় প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এই পরিণতিতে জন্ম হয় নতুন মত (ব্রাহ্মধর্ম ও নব হিন্দুবাদ), নতুন শিক্ষা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। এই নতুনের মধ্যেই বাংলায় 'রেনেসাঁস' বা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। এ ভাবেই উপমহাদেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলায় প্রথম নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁসের' উদ্ভব ঘটে। ফলে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে উঠে আধুনিক চিন্তাচেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালি পরিণত হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারকবাহকে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে আধুনিক মানুষে পরিণত হন। এই নব ভাবধারা প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু সংখ্যক উদারচেতা প্রশাসকেরও অবদান রয়েছে। এরা দেশী ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রবল উৎসাহ দেখিয়েছেন। হেস্টিংস, এ্যালফিনিস্টোন, ম্যালকম, মনরো, মেটকাফ প্রমুখ ইংরেজ প্রশাসকের অনেকে ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য ভাবধারা, জ্ঞান বিজ্ঞান-দর্শনে উজ্জীবিত করাকে তাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাছাড়া খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাও আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

রাজা রামমোহন রায়

বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা, ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী রামমোহন, বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সুফি মতবাদে বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে পারদর্শী রামমোহন, কিছুকাল তিব্বতে বসবাস করে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে 'তুহফাত-উল-মোয়াহিদ্দীন' (একেশ্বরবাদ সৌরভ) 'মানাজারাতুল আদিয়ান' (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা)। হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী', 'মিরাত-উল-আখবার' ও 'ব্রাহ্মনিকাল ম্যাগাজিন' নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়

আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮

খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে।

শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষার। এ কারণে তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহন ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'এ্যাংলো হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে ইংরেজি, দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। এদেশবাসীকে সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে তিনি গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদরাসা শিক্ষায় ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য আবেদন করেন।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে এই মহাপুরুষ, ভারতীয় নবজাগরণের স্রষ্টা, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পর ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। ভারতীয়দের ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	রাজা রামমোহন রায় কী কী করেছেন তার বর্ণনা দিয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

আঠারো শতকে ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বাংলায় যে নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁসের' জন্ম হয়, পরবর্তিকালে সেই ভাবধারা সারা ভারতবর্ষে ছাড়িয়ে গড়ে। এর ফলে শুধু বাংলা না সারা ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বিশাল পরিবর্তন সূচিত হয়। যার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব, বাংলার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, ইউরোপীয় আধুনিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত বাঙালি সন্তানরা। তাঁদের মধ্যে প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজ, পশ্চাদমুখি শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাঙালি সমাজকে আধুনিক যুগের পথে এগিয়ে দেন। তাঁর সময়টাই বাংলার ইতিহাসে নবজাগরণ বা 'রেনেসাঁসের' যুগ নামে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। এ্যাংলো হিন্দু কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (জ্ঞানমূলক)
- ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- খ) রাজা রামমোহন রায়
- গ) হাজী মুহম্মদ মুহসিন
- ঘ) স্যার সৈয়দ আহমদ

২। রাজা রামমোহন আত্মীয়সভা গঠন করেন কেন? (অনুধাবন)
- ক) পারস্পারিক সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য
- খ) সামাজিক সংস্কার সাধন কল্পে
- গ) ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের জন্য
- ঘ) জনগণকে নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার জন্য

৩। রামমোহন রায়ের ক্ষেত্রে কোনটি গ্রহণযোগ্য– (প্রয়োগমূলক)
- ক) ভারতীয় হিন্দুদের আদর্শ
- খ) ভারতীয় নবজাগরণের স্রষ্টা
- গ) ভারতীয় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ নেতা
- ঘ) ভারতীয় রাজনীতির প্রাণ পুরুষ

৪। ভারতের আধুনিক পুরুষ হিসেবে নিচের কোন ব্যক্তিত্ব অধিক গ্রহণযোগ্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
- ক) রাজা রামমোহন রায়
- খ) হাজী শরীয়ত উল্লাহ
- গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা সাগর
- ঘ) মহাত্মা গান্ধী

পাঠ-১১.২ ডিরোজিও ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	একাডেমি এ্যাসোসিয়েশন, সনাতনপন্থী হিন্দু, গোঁড়াপন্থী খ্রিস্টান, মাইকের মধুসূদন দত্ত, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, ব্যাকরণ, উপক্রমণিকা, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন, বহুবিবাহ, কন্যাশিশু হত্যা

ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ছিল রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ধারা। দৃঢ়ভাবে সে ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্রবৃন্দ ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের মাধ্যমে। যার নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুইস ডিরোজিও। তিনি তাঁর ছাত্র-অনুসারীদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার শিক্ষা দেন।

'রেনেসাঁস' যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। ডিরোজিও তাঁর স্কুল শিক্ষক ডেভিড ড্রামন্ডের প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত, অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মানবতাবাদী চিন্তাধারা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই শিক্ষকের আদর্শ ধারণ করে রাখার কারণে হতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ডিরোজিওর অনুসারী ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা দেশবাসীকে বার বার এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। তরুণ সমাজের পুরোনো ধ্যান-ধারণা পাল্টে দিতে ডিরোজিও কর্তৃক ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'একাডেমি এ্যাসোসিয়েশন' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাডেমির তরুণদের এই শিক্ষা দেয়া হয় যে যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান। নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবিত তরুণরা সনাতনপন্থী হিন্দু এবং গোঁড়াপন্থী খ্রিস্টানদের ধর্মবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনা মুখর হয়ে উঠে। ডিরোজিও এবং তার ছাত্রদের প্রকাশিত সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্রিকাতেও সমাজ, ধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক লেখা প্রকাশিত হয়। যে কারণে তারা রক্ষণশীল মহলের আক্রমণের শিকার হতে থাকেন বারবার।

বাংলার 'রেনেসাঁস' যুগের এই প্রতিভাবান তরুণ মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর হাতে গড়া অনুসারী, ছাত্ররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে থাকেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন ব্যনার্জি প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর ছাত্র না হলেও তাঁর আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর অনুসারীদের আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাণ্ডিত্য, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, দয়া ও তেজস্বিতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকের বাংলায় একক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রজ্ঞা ছিল অসাধারণ আর হৃদয় ছিল বাংলার কোমলমতি মায়েদের মতো। এই অসাধারণ যুগ প্রবর্তকের জন্ম হয়েছিল ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে মেদেনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তিনি তাঁর তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁর দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। আর হৃদয়ের মমত্ববোধ তাঁর মা ভগবতীদেবীর কাছ থেকে। দারিদ্রের কারণে রাতে বাতি জ্বালিয়ে পড়ার ক্ষমতা ছিল না। ফলে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নিচে বসে পড়াশোনা করতেন। তিনি ইংরেজি সংখ্যা গণনা শিখেছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার সময়, রাস্তার পাশের মাইল ফলকে লেখা সংখ্যার হিসেব গুণতে গুণতে।

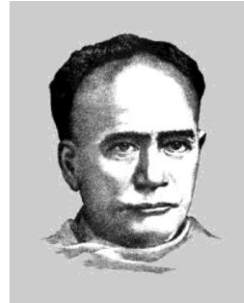

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

অসাধারণ মেধা আর অধ্যাবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়েসে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, বেদান্ত, স্মৃতি, অলঙ্কার শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ঐ বয়সে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতের দায়িত্ব লাভ করেন। একই সঙ্গে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বও পালন করেন।

কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এ জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনক বলা হয়।

শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।

শুধু সাহিত্য নয়, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা তাঁর কীর্তি। তাছাড়া স্কুল পরিদর্শক থাকাকালে গ্রামে গঞ্জে তিনি ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন', এখন এটি বিদ্যাসাগর কলেজ নামে খ্যাত।

তিনি একজন সফল সমাজ সংস্কারকও ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্ককারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। উদার ও সংস্কারমনা বিদ্যাসাগর হিন্দু সমাজে প্রচলিত, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, সতীদাহ প্রথা, কন্যা শিশু হত্যাসহ সামাজিক উন্নয়ন ব্যাহতকারী, মানবতা বিরোধী সব ধরনের অশুভ কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন পরিচলনা করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রণয়নে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

বিদ্যাসাগর দান-দাক্ষিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। এ কারণে তাঁকে দয়ার সাগরও বলা হতো। তিনি যথেষ্ট সচ্ছল না হলেও বহু অনাথ ছাত্র তাঁর বাসায় থেকে লেখাপড়া করতো। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরম অর্থকষ্টের সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগরের অর্থে লেখাপড়া করেছেন।

তার মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। মায়ের ইচ্ছায় তিনি গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য তিনি একবার ভরা বর্ষায় গভীর রাতে 'দামোদর নদ' সাঁতরিয়ে পার হয়ে বাড়ি যান। এই সমাজ সেবক মহাজ্ঞানী ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ৭১ বছর বয়েসে মৃত্যু বরণ করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• "একদিকে তিনি বিদ্যাসাগর অপর দিকে দয়ার সাগর"-এর অর্থ কী? • বিদ্যাসাগরের শিক্ষা এবং তাঁর মাতৃভক্তির অসাধারণ কাহিনী উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাঙালিদের মধ্যে নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবাদর্শ সৃষ্টিতে যাঁরা অনন্য সাধারণ ভূমিকা রেখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। একজন সংস্কৃত পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও জনহিতৈষী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একদিকে ছিলেন বিদ্যাসাগর অপর দিকে দয়ার সাগর। তাঁর মানবিক গুণাবলি তাঁর পান্ডিত্যের মতই বাঙালি সমাজে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বাংলার শিক্ষা ও সামাজিক নবজাগরণ ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসামান্য গুরুত্ববহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। হেনরি লুই ডিরোজিওর জন্ম সাল কোনটি? (জ্ঞানমূলক)

ক) ১৭৭৪ খ) ১৮০৯
গ) ১৮২২ ঘ) ১৮৩১

২। ডিরোজিও কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) একুশ খ) বাইশ
গ) তেইশ ঘ) চব্বিশ

৩। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে নিচের কোন নামটি অধিক যুক্তিযুক্ত?

ক) রাজা রামমোহন রায় খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ) হেনরী লুই ডিরোজিও ঘ) প্যারিচাদ মিত্র

৪। জনাব প্রদীপ শৈশব অবস্থায় গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নীচে দাঁড়িয়ে পড়াশুনা করতেন। প্রদীপ-এর কাজের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন ব্যক্তির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগমূলক)

ক) হাজী মুহাম্মদ মুহসিনের খ) হাজী শরিয়ত উল্লাহ্‌র
গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঘ) মুহসিনউদ্দিন দুদু মিয়ার

৫। কর্মজীবনে প্রবেশের সাথে সাথে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে বিষয়ে/কোন বিষয়ে মনোযোগী হয়েছিলেন?

ক) ধর্মপ্রচারে খ) ধর্মচর্চায়
গ) রাজনৈতিক জ্ঞান অন্বেষণে ঘ) সাহিত্য চর্চায়

৬। স্কুল পরিদর্শক থাকাকালিন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কতটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন?

ক) ২০টি খ) ২৩টি
গ) ৩৫টি ঘ) ৩৭টি

৭। ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন কেন? (বহুপদী)

i) মায়ের ইচ্ছার পূর্ণতা দান করতে
ii) পরিবারের চিকিৎসার জন্য
iii) মাতৃভক্তি প্রদর্শন স্বরূপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৩ নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নওয়াব আবদুল লতিফের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুসলিম নবজাগরণে সৈয়দ আমীর আলীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কলেজিয়ট স্কুল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, লিংকস ইন, প্রিভি কাউন্সিল, সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন

উনিশ শতক ছিল বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য চরম হতাশার কাল। মুসলমানরা ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতা করতে গিয়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষায় বিমুখ হওয়ার কারণে সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে দারিদ্রের নিম্নতম ধাপে নেমে আসে। এই অধঃপতিত অবস্থা ও দুর্দিনে যে সব মনীষীর আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আসে নওয়াব আবদুল লতিফ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। নওয়াব আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা মাদরাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। এবং পরে কোলকাতা মাদরাসায় অধ্যাপনা করেন।

নওয়াব আবদুল লতিফ

১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে কোলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সরকার তাঁকে প্রথমে খান বাহাদুর পরে নওয়াব এবং নওয়াব বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করে।

আবদুল লতিফ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন এবং এর গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তাই তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কোলকাতা মাদরাসায় এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চশিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদরাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে মুহসিন ফান্ডের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য সমাজ।

সৈয়দ আমীর আলী

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে ছিলেন তিনি হলেন সৈয়দ আমীর আলী। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তাদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করতে চেয়েছেন।

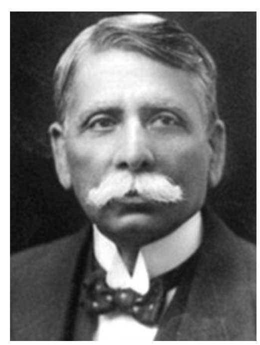

সৈয়দ আমীর আলী

সৈয়দ আমীর আলী ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে হুগলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনের লিঙ্কস ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন। বাংলা তথা ভারতে তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তিনি বুঝতে

পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। ফলে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমীর আলী কোলকাতা মাদরাসায় কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন।

মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রদূত আমীর আলী ছিলেন একজন সুলেখক। তাঁর বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হচ্ছে– *'The spirit of Islam'* এবং *'A Short History of the Saracens'*। এতে ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আধুনিক ভারতের উন্নতির জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সৈয়দ আমীর আলী নারী অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিলেন। বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রদূত সৈয়দ আমীর আলী ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর ভূমিকা উল্লেখ করে একটি প্রবন্ধ রচনা করে শিক্ষকের কাছে জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমান তথা ভারতীয় মুসলমান জনগোষ্ঠি শিক্ষাদীক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে ছিল পশ্চাদপদ। চরম দুর্দশাগ্রস্ত এই জনগোষ্ঠি চলমান অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড থেকে ছিল দূরে। দুর্দশা কবলিত পশ্চাদপদ মুসলিম সমাজকে সহযোগিতা করতে যেসব মনীষী এগিয়ে আসেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। এই দুই মনীষীর প্রচেষ্টায় বাঙালি মুসলমান পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ এবং ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করার বিষয়ে উৎসাহিত হয়। বাঙালি মুসলিম রেনেসাঁসের অগ্রপথিকদ্বয় যেমন মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার পক্ষপাতি ছিলেন তেমন আমীর আলী তাদের রাজনীতি সচেতন করারও পক্ষে ছিলেন। তাদের প্রভাবে প্রেরণায় মুসলমানদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক নবচেতনার ও জাগরণের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নওয়াব আব্দুল লতিফ কত খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?
ক) ১৮২৬ খ) ১৮২৭ গ) ১৮২৮ ঘ) ১৮৪৯

২। নওয়াব আব্দুল লতিফকে সরকার "খান বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করেন কেন?
ক) তাঁর মানবীয় গুনাবলীর খ) কর্ম জীবনের কৃতিত্বের জন্য গ) তার সাহসিকতার জন্য ঘ) তার সৃজনশীলতার জন্য

৩। মোহামেডন লিটারারি সোসাইটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ খ) ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দ গ) ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দ ঘ) ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ

৪। নওয়াব আবুল লতিফের কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল– (উচ্চতর দক্ষতা)
i) মুসলমানদের প্রতি সরকারের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব দূর করা
ii) শিক্ষায় মুসলমানদের অগ্রগতি সাধন করা
iii) হিন্দু মুসলিম মৈত্রী স্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। সৈয়দ আমীর আলী কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন?
ক) লন্ডনের লিঙ্কন্স ইন খ) ঢাকা ল কলেজ গ) কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) প্রেসিডেন্সি কলেজ

৬। ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে যে গ্রন্থে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i) *The Prophet Mohammad (sm)* ii) *The Spirit of Islam* iii) *A Short History of the Saracens*
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১১.৪ বেগম রোকেয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বেগম রোকেয়ার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- নারী শিক্ষা বিস্তারে বেগম রোকেয়ার অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পায়রাবন্দ, অবরোধবাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, সাখাওয়াত মেমোরিয়াল, উর্দু প্রাইমারি স্কুল, আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম, মুসলিম মহিলা সমিতি

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া

বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। তারা সব ধরনের অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজ ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দি করে। মুসলমান মেয়েদের এই বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যিনি আহবান জানান তিনি বেগম রোকেয়া। এই মহীয়সী নারীর জন্ম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী সাবের। মায়ের নাম মোসাম্মৎ বাহাতন্নেসা সাবেরা চৌধুরী। ঐ অঞ্চলে সাবের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশিন। বেগম রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইবরাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

তাঁকে পড়াশোনা করতে হতো গভীর রাতে, যাতে বাড়ির লোক টের না পায়।বড় ভাইয়ের একান্ত উৎসাহে তিনি উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। স্কুলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন।

সাহিত্য চর্চার বিষয়বস্তুও ছিল নারী সমাজকে নিয়ে। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা– বঞ্চনার করুণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। যা উপলব্ধি করেছেন, তা-ই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করুণ দশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা। বেগম রোকেয়ার লিখিত গ্রন্থ অবরোধ বাসিনী, পদ্মরাগ, মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন প্রভৃতিতে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহিত জীবনে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞান চর্চায় উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জীবনের বাকি সময় নারী শিক্ষা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কোলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে উন্নিত হয়। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

বেগম রোকেয়া নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

মুসলমান নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার মনে নারীর প্রতি সমাজের নানা অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ছিল তীব্র বিদ্রোহের সুর। তিনি তাঁর কর্মের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এই মহীয়সী নারী কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বেগম রোকেয়া যে ধর্মীয়, সামাজিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন, লেখাপড়া শিখেছেন তার উপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাঙালি মুসলিম নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া ছোট বেলা থেকেই নারীকে পর্দা প্রথার নামে বন্দি করে রেখে তার ব্যক্তিত্বের প্রতি অবমাননা তাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছে। ধর্মের নামে এই আচরণের ফলে মেয়েরা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি লেখা পড়া করাও তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তিনি বাঙালি মুসলমান নারী সমাজকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেন। বড় ভাই বোন এবং পরে স্বামীর সহযোগিতায় লেখা পড়া শিখে নারী সমাজকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নারী শিক্ষা নারী জাগরণের জন্য কাজ করে গেছেন। বাঙালি মুসলমান নারী সমাজ তাঁদের আজকের প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ এবং ঋণী, তিনি বেগম রোকেয়া।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বেগম রোকেয়া কোন জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)
ক) ভাগলপুর খ) রংপুর
গ) বগুড়া ঘ) দিনাজপুর

২। বেগম রোকেয়ার সময়কালে মেয়েরা কেমন ছিল? (অনুধাবন)
ক) উগ্র মানসিকতা সম্পন্ন খ) লাজুক প্রকৃতির
গ) অত্যন্ত পর্দানশীন ঘ) ভীরু প্রকৃতির

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
রফিজা সমাজের কুসংস্কার ও অশিক্ষা দূর করতে কাজ করেন। তার স্বামী এতে সহযোগিতা করেন।

৩। রফিজার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ চরিত্র–
ক) লীলা নাগ খ) লক্ষ্মী বাঈ
গ) বেগম রোকেয়া ঘ) প্রীতিলতা

৪। তিনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করেন–
ক) পর্দাপ্রথা মানতে খ) নারী মুক্তি আনয়নে
গ) গৃহকর্মে নিয়োজিত থাকতে ঘ) বিলাসিতা করতে

৫। মুসলিম নারী মুক্তি আন্দোলনের আগ্রদূত কাকে বলা হয়?
ক) মাদার তেরেসা খ) বেগম রোকেয়া
গ) সুলতানা রাজিয়া ঘ) বেগম ফয়জুন্নেসা

৬। বেগম রোকেয়া যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। (অনুধাবন)
i) বাংলা ভাষায় ii) ইংরেজি ভাষায়
iii) আরবি ভাষায়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) ii
গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ ঃ ১. খ ২. গ ৩. খ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ ঃ ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. গ ৫. ঘ ৬. গ ৭. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ ঃ ১. গ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. ক ৬. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ ঃ ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. খ ৫. খ ৬. ক

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

ইউনিট ১২

বাঙালিরা কখনই বিদেশি ইংরেজ শাসকদের মেনে নেয়নি। যার প্রমাণ পলাশীর যুদ্ধের পর পর একের পর এক কৃষক বিদ্রোহ। পরাধীনতার একশ বছর পরেও স্বাধীনতা ঘোষণা করে এ দেশের সৈনিকরা ও দেশীয় রাজরাজারা। পরবর্তী সময়ে স্বাধীকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ। বাঙালি তরুণরা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দলে দলে আত্মাহুতি দিয়ে কাঁপিয়ে তোলে ইংরেজ শাসনের ভিত। উপমহাদেশের স্বাধীকার স্বাধীনতা আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা ছিল বাঙালিদের। এই ইউনিটে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামসহ পরবর্তী আন্দোলন সমূহে বাঙালি তথা তৎকালীন ভারতবাসীর গৌরবের ও আত্মত্যাগের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা আছে ইংরেজ শাসকরা ভারত ছাড়তে বাধ্য জেনে, কীভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে উপমহাদেশকে বিভক্ত করে, দ্বিখন্ডিত করে বাংলাকে- বাঙালি জনগোষ্ঠিকে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১২.১ ঃ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম
পাঠ-১২.২ ঃ ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন
পাঠ-১২.৩ ঃ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন
পাঠ-১২.৪ ঃ খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন
পাঠ-১২.৫ ঃ লাহোর প্রস্তাব
পাঠ-১২.৬ ঃ ব্রিটিশ শাসন অবসান

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-১২.১ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল ও এর প্রভাব মূল্যায়ন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মহাবিদ্রোহ, স্বত্ববিলোপনীতি, সাম্রাজ্যবাদী, লাখেরাজ সম্পত্তি, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ধর্মীয় স্বাধীনতা।

ভূমিকা

পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহীদের নেতৃত্বে যে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকভাবে চরম শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত, সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ– এসবই মহাবিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি রচনা করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক কারণ

গভর্নর জেনারেল ডালহৌসি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী শাসক। ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে পারতো না। এই নীতি প্রয়োগ করে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক পুত্র এবং পেশওয়া দ্বিতীয় রাজা বাজিরাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়। ব্রিটিশের অনুগত মিত্র অযোধ্যার নবাবও এই আগ্রাসন থেকে রক্ষা পাননি। অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত করা হয়। এসব ঘটনায় দেশীয় রাজন্যবর্গ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তাছাড়া ডালহৌসি কর্তৃক দিল্লি সম্রাট পদ বিলুপ্ত করায় সম্রাট পদ থেকে বঞ্চিত দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ও ক্ষুব্ধ হন।

অর্থনৈতিক কারণ

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড। আইন প্রয়োগের ফলে অনেক বনেদি জমিদার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সামাজিকভাবে হেয় হন। তাছাড়া কোম্পানি পলাশী যুদ্ধের পর এ অঞ্চল থেকে যে পরিমাণ অর্থ, সোনা রূপাসহ মূল্যবান সম্পদ ব্রিটেনে পাচার করে তাতে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি, সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রচলন, দেশীয় রাজ্য গ্রাস এবং নতুন চাকুরি আইনের ফলে বহুলোক বেকার কর্মহীন ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানির শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং কোম্পানি শাসন বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হতে থাকে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

আঠারো শতকের শেষ ভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যের প্রভাব, কোম্পানির সমাজ সংস্কার জনকল্যাণমূলক হলেও রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমান এসব মেনে নিতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ, খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ধর্মপ্রচার, ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নতুন আইন; সবই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল মানুষকে বিচলিত করে তোলে। ফলে তারা ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

সামরিক ও প্রত্যক্ষ কারণ

সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে পদবি, বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার উপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

তবে বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত। হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল; সমুদ্র পাড়ি দিলে ধর্ম নষ্ট হয়। সে ক্ষেত্রে হিন্দু সিপাহিদেরকে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ভারতের বাইরে যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে দুই ধর্মের সৈন্যরা ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে উঠে পশ্চিম বঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৯ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গলপান্ডে নামে এক সিপাহী। দ্রুত এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে মিরাট, কানপুর পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র। বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে শামিল হয়।

বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা

বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সিপাহী জনতার এই বিদ্রোহ নিষ্ঠুর এবং অত্যন্ত কঠোর হাতে দমন করে। এই সংগ্রামের সঙ্গে জড়িতদের বেশির ভাগ হয় যুদ্ধে শহিদ হন অথবা তাঁদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন, মায়ানমার) নির্বাসিত করা হয়। ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে শহীদ হন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে অন্তর্ধান হন। সাধারণ সৈনিক বিদ্রোহীদের উপর নেমে আসে চরম অমানবিক নির্যাতন। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক সৈনিকের লাশ। এভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণ–

১. সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত পরিকল্পনা এবং একক নেতৃত্বের অভাব।
২. সাংগঠনিক দুর্বলতা, প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্র ও রসদের অভাব।
৩. শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণি, অধিকাংশ দেশীয় রাজা, জমিদার, সৈন্যদের একটি অংশের অসহযোগিতা।
৪. অপর দিকে ইংরেজদের উন্নত সামরিক কৌশল, উন্নতমানের অস্ত্র, সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের জয়ী করেছে।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব

১. এর ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সরকার ও পার্লামেন্টের হাতে ভারত শাসনের দায়িত্ব অর্পিত হয়।
২. ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণা পত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

এই বিদ্রোহের সুদূর প্রসারি গুরুত্ব হচ্ছে, বিদ্রোহের ক্ষোভ থেমে থাকেনি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সচেতন হয়ে উঠে এবং নানা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

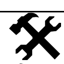 **অ্যাকটিভিটি** (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যর্থতার কারণসমূহ নিয়ে শ্রেণি কক্ষে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক যুগান্তকারী ঘটনা। ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সামরিক ক্ষেত্রে কোম্পানি সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা, অনুসৃত নীতি বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আর ক্ষোভের সৃষ্টি করে, তারই বহিঃপ্রকাশ এই সংগ্রাম। নানা কারণে এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। তবে এর ফলে ভারতে একশ বছরের কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। উপমহাদেশের শাসনভার ব্রিটিশ রাজ ও পার্লামেন্টের হাতে অর্পিত হয়। এটি ভারতের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয় কত সালে?

(ক) ১৮৫৭ (খ) ১৮৮৫ (গ) ১৯০৫ (ঘ) ১৯৪৭

২। এনফিল্ড রাইফেলের কার্তুজে মিশ্রিত ছিল– (অনুধাবন)

i) গরুর চর্বি ii) মহিষের চর্বি iii) শুকরের চর্বি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল–

i) নেতৃত্বের অভাব ii) বিচ্ছিন্ন আন্দোলন iii) উন্নত সমরাস্ত্র ও সুসজ্জিত বাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে করা কলিঙ্গ যুদ্ধ, সম্রাট অশোকের চিন্তার জগতে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য বিস্তার তথা তাঁর সাম্রাজ্যবাদ নীতি পরিহার করেন।

৪। উদ্দীপকে সম্রাট অশোকের রাজ্য বিস্তার নীতি পরিহারের সাথে ভারত ব্রিটিশ শাসনামলে কার ঘোষণার মিল দেখা যায়?

(ক) রাজা পঞ্চম জর্জ (খ) রানী ভিক্টোরিয়া (গ) রানী মেরী (ঘ) রাজা ২য় চার্লস

৫। উক্ত ঘোষণার পর ভারতে

i) ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় হয় ii) স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হয় iii) ভারতীয়, ব্রিটিশ সমঅধিকার নিশ্চিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

নীনা ও মীরা বড় চাচার সাথে বাহাদুর শাহ পার্কে বেড়াতে আসে। চাচা জানান যে এ পার্কটি এদেশের এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের সাক্ষী, চাচার বক্তব্য শুনে নীনা এ ঘটনার জন্য বিদেশী শাসনের সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে দায়ী করে। অপরদিকে মীরা মনে করে ঐ সংগ্রাম দানা বেধেঁছিল দেশের শিল্প কারখানা ধ্বংস হওয়ার কারণে।

ক. মঙ্গল পান্ডে কে ছিলেন?

খ. এনফিল্ড রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলেছিল কেন?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগ্রামটি ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে কারণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. মীরার মত ১৮৫৭ সালের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য অর্থনৈতিক কারণই মূলত দায়ী– আপনি কী একমত? ব্যাখ্যা দিন।

পাঠ-১২.২ ভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- উপমহাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	নতুন যুগ, বুদ্ধিজীবী শ্রেণি, জাতীয়তাবাদী চিন্তা, রাজনৈতিক সংগঠন, সিভিল সার্ভিস সর্বহারা বিপ্লব, বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা, ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন,

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হলে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল; স্বদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন একদল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের আকাঙ্ক্ষা। এঁদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন বাংলার রাজনীতি সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরাই। তাঁদের জাতীয় ঐক্যবোধ দেশপ্রেম বাংলা থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। রাজনীতি সচেতন এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধকারী সংগঠন গুলোর জন্মও হয়েছিল বাংলায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশন'। ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান রাজনৈতিক দাবিগুলো মূলত ছিল 'ইন্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশনের' দাবি সমূহের মার্জিত রূপ। নেহরু বাঙালির এই ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর আত্মজীবনী ভারত সন্ধানে লিখেছেন 'বাংলাদেশের নেতারা সমগ্র রাজনৈতিক ভারতের নেতা রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।'

১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ একটা রাজনৈতিক সংগঠনের অভাব বোধ করছিলেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আহুত জাতীয় সম্মেলনে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোলকাতায় একটি সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে যখন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রচেষ্টা সাফল্যের শেষ ধাপে উপস্থিত। তখনই সরকারি উদ্যোগে কংগ্রেস গঠনের আয়োজন শুরু হয়। বড় লাট ডাফরিনের ইচ্ছায় ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর প্রাপ্ত এ্যালন অক্টোভিয়ান হিউম কংগ্রেস গঠনের পরিকল্পনা করেন। ভারতীয় জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু প্রমুখ নেতাদের সহযোগিতায় হিউম কংগ্রেস গঠনে সফল হন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ছিলেন কোলকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্রোপাধ্যায়।

মুসলিম লীগ

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গঠিত হলেও বেশিরভাগ মুসলিম নেতা এতে অংশ গ্রহণ করেননি। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার ফলে অবহেলিত পশ্চাদপদ বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু কংগ্রেস এবং হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের চরম বিরোধিতা শুরু করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং তারা কংগ্রেস থেকে আরো দূরে সরে যায়। হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাবি আদায়ের জন্য একটি সংগঠন জরুরি ছিল।

নবাব সলিমুল্লাহ

অপরদিকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার নতুনভাবে শাসন সংস্কার চালু করার বিষয়টি বিবেচনায় আনে। এসব কারণে, নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে মুসলমানদের মধ্যে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের আগ্রহ দেখা দেয়। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায়, বড় লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে বড় লাটের কাছে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা সংক্রান্ত একটি দাবি নামা পেশ করা হয়। এই সাক্ষাৎকারের পর মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরের ৩০ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স'। সম্মেলন শেষে নওয়াব ভিখারুল মুলক্-এর সভাপতিত্বে মুসলিম নেতাদের উপস্থিতিতে একটি রাজনৈতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় নবাব সলিমুল্লাহ 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন হাকিম আজমল খান, জাফর আলী খান, মুহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল।

এভাবে মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল–

এক. ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যবোধ সৃষ্টি করা। সরকারের কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে ভুল ধারণা জন্মালে তা দূর করা।

দুই. ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা। মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা সরকারের কাছে তুলে ধরা।

তিন. এসব উদ্দেশ্য ব্যহত না করে ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।

মুসলিম লীগ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন নবাব সলিমুল্লাহ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, জাফর আলী খান, হাকিম আজমল খান ও মুহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সর্ব ভারতীয় মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন আগা খান।

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ অক্টোবর প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের উজবেক প্রজাতন্ত্রের তাসখন্দ শহরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে যখন রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার চিন্তিত হয়ে পড়ে। একই বছর নভেম্বর মাসে লেনিনের নেতৃত্বে দুনিয়া কাঁপানো সর্বহারা বিপ্লব সফল হয়। ফলে পৃথিবীতে প্রথম সর্বহারা মানুষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। আতঙ্কিত ব্রিটিশ সরকার এই সর্বহারা বিপ্লবের খবর যাতে ভারতে আসতে না পারে তার জন্য নানা ধরনের কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে সময় ভারত জুড়েও চলছিল বিক্ষোভ, ধর্মঘট, হরতাল, উত্তাল গণআন্দোলন। এই অবস্থার পটভূমিতে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টির ভারতীয় দলটির জন্ম দেশের বাইরে।

লেনিন

মোট ৭ জন সদস্য নিয়ে তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। মুহম্মদ শফিক এই কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রবাসে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের স্বীকৃতি লাভ করে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিশেষ করে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন ঠেকাতে পারেনি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই বিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। প্রথম থেকে মুজাফফর আহমদের নেতৃত্বে এবং আব্দুল হালিম, আবদুর রাজ্জাক খাঁ ও শামসুল হুদা প্রমুখের প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলায় কোলকাতাকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূত্রপাত ঘটে। কমরেড মুজাফফর আহ্মদ শুধু বাংলা নয়, ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃত।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

যখন বাংলার রাজনীতি সচেতন জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণি একটি রাজনৈতিক দল গঠনে প্রস্তুত; তখনই লর্ড ডাফ্রিনের ইচ্ছায় হিউম জাতীয়তাবাদী নেতাদের সহযোগিতায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হলেও অনেক মুসলিম নেতা এতে যোগদান করেনি। তাছাড়া ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গবঙ্গ আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা মুসলমানদের স্বার্থ বিরোধী ছিল। এ অবস্থায় তাদের স্বার্থ রক্ষা এবং মুসলমানদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য একটি সংগঠন প্রয়োজন ছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ তাদের সেই প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়। মুসলিম লীগ গঠনের একযুগেরও বেশি সময় পার হয়েছে যখন ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা রাজনৈতিক দল কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় বিদেশের মাটিতে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত পার্টির প্রভাবে বাংলায়, কোলকাতাকে ঘিরে কমরেড মুজাফফর আহ্মদের উদ্যোগে যাত্রা শুরু হয় বাংলা তথা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির। এভাবে ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা তিনটি রাজনৈতিক দলের।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে?

(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯০৬

(গ) ১৯০৯ (ঘ) ১৯১৬

২। ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা হয় কাকে?

(ক) মুজাফফর আহ্মেদ (খ) আব্দুল হালিম

(গ) আবদুর রাজ্জাক (ঘ) মনি সিং

৩। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়–

i) লর্ড ডাফরিনের পৃষ্ঠপোষকতায়

ii) এলান অক্টোভিয়ান হিউমের ঐক্যান্তিকতায়

iii) কতিপয় শিক্ষিত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

কোলকাতার নির্মল সেন এক পর্যায়ে বুঝতে পারলেন যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিন্তা ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাকে দেশ শাসনে তথা দাবী আদায়ের কাজে লাগাতে হলে একটি সংগঠন গড়ে তোলা অপরিহার্য। তখন একাজে কিছু ব্রিটিশ ব্যক্তিবর্গও এগিয়ে এসেছিলেন।

৪। উদ্দীপকে উল্লিখিত সংগঠনটির মত উনবিংশ শতকে ভারতে গড়ে ওঠা সংগঠনটি কী নামে পরিচিত?

(ক) জাতীয় যুক্তফ্রন্ট (খ) মুসলিম লীগ অব ভারত

(গ) ন্যাশনাল ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (ঘ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

৫। উক্ত সংগঠনটি ভারতীয় উপমহাদেশে গঠিত হয়েছিল–

i) জনগণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা লাঘবে

ii) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য

iii) ভারতীয়দের অসন্তোষ প্রশমিত করার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.৩ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গের পটভূমি ও কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- স্বদেশী আন্দোলনের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বাংলা ভাগ, 'বিভেদ ও শাসননীতি', বাংলা প্রেসিডেন্সি, বঙ্গভঙ্গ রহিত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন, সশস্ত্র সংগ্রাম।

বঙ্গভঙ্গের পটভূমি

ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভক্তি ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে এর বাস্তবায়ন হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদাহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ। প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অপরদিকে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী করা হয় কোলকাতাকে।

মানচিত্র ১ : বাংলাদেশ ১৯০৫-১৯১১

বঙ্গভঙ্গের কারণ

বঙ্গভঙ্গের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১. উপমহাদেশের একতৃতীয়াংশ লোকের বসবাস বাংলা প্রেসিডেন্সির প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ করা হয়।

২. রাজধানী হওয়ার কারণে আর্থ-সামাজিক সকল কর্মকাণ্ডের প্রাণ কেন্দ্র ছিল কোলকাতা। শিল্প কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সব কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোলকাতাকে ঘিরে। ফলে পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে। পশ্চাদপদ মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলার উন্নতি অগ্রগতির কথা বিবেচনা করে বাংলা ভাগ প্রয়োজন ছিল।

৩. সর্বোপরি কংগ্রেস নেতারা কোলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতেন। মূলত কোলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল ব্রিটিশ প্রশাসনের জন্য বিপদজনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো অপর দিকে পূর্ব বাংলার উন্নতির নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবে লর্ড কার্জনে 'বিভেদ ও শাসন নীতি' প্রয়োগ করে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করে দিল।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। অপর দিকে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত **১৯১১** খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে। রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

বঙ্গভঙ্গ রদে হিন্দু সম্প্রদায় খুশি হয়, অপর দিকে মুসলমান সম্প্রদায় প্রচণ্ড মর্মাহত এবং হতাশ হয়। ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কে ফাটল ধরে। এরপর থেকে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, তাকেই স্বদেশী আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। পরে বিলেতি শিক্ষা বর্জনও এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বদেশী আন্দোলন ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

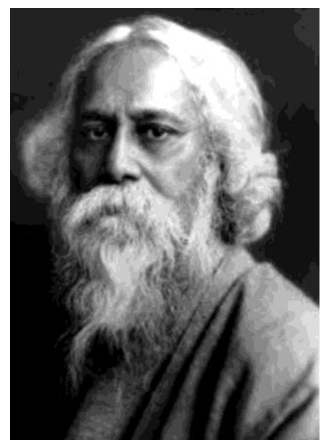

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলে। একই সঙ্গে দেশী পণ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করে। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠে বাংলার নিজস্ব তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা। অপর দিকে বিলেতি শিক্ষা বর্জন এবং আন্দোলনের সাথে যুক্তদের বিভিন্ন সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বের করে দেওয়ার ফলে প্রয়োজনে গড়ে উঠে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধকারী শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক গানগুলো রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং রজণীকান্ত সেন প্রমুখ। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় রচনা করেন।

আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

মুসলমান সমাজ স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কারণে আন্দোলন জাতীয় রূপলাভে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সাধারণ মানুষ, এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের লোকজন, দারিদ্র সমাজ এই আন্দোলনের মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়। ফলে আন্দোলন সার্বজনীন একটি শক্তিশালী ভিত্ গড়তে সক্ষম হয়নি।

এ আন্দোলনের মাধ্যমে বিলেতি দ্রব্য বর্জন সফল হয়নি। কারণ কোলকাতার অবাঙালি মাড়ওয়ারি ব্যবসায়ী এবং বাংলার গ্রাম গঞ্জের ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সর্বোপরি এই আন্দোলন গোপন সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে জনগণ আন্দোলন থেকে দূরে সরে যায়। ফলে গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন সফলতার দ্বারে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। স্বদেশী আন্দোলনের হতাশার দিক হচ্ছে- এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সম্পর্কের তিক্ততা আরো বৃদ্ধি পায়। যার পরিণতি হচ্ছে **১৯৪৭** খ্রিস্টাব্দে সম্প্রদায় ভিত্তিতে ভারত বিভক্তি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বঙ্গভঙ্গ এবং বঙ্গভঙ্গ রদ বাঙালি জাতির ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর কী প্রভাব বিস্তার করেছিল? এর পরিণতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন শিক্ষকের নিকট জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। বঙ্গবঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যকার সম্প্রীতিতে চির ধরে; স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের সম্ভাবনা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। নেতাদের উদার প্রচেষ্টা, বিভিন্ন যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে মাঝে মাঝে ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিভেদ নীতিরই জয় হয়। উভয় সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতার পরিণতিতে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে উপমহাদেশ ভাগ হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বঙ্গভঙ্গ কত সালে রদ করা হয়?
(ক) ১৯০৫ (খ) ১৯০৬ (গ) ১৯০৯ (ঘ) ১৯১১

২। বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশদের কোন উদ্দেশ্য কাজ করেছিল?
(ক) মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার নীতি (খ) হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার নীতি
(গ) 'বিভেদ ও শাসন নীতি' (ঘ) রাজ্য সম্প্রসারণ করার নীতি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা শহরের নাগরিক সুযোগ সুবিধায় শৃঙ্খলা তথা সুশাসন কায়েম করতে শহরটিকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং দুই অংশের জন্য দুইজন মেয়র নির্বাচতি হয়েছেন।

৩। উদ্দীপকের এই বিভক্তি ব্রিটিশ ভারতের কোন ঘটনার সাথে মিল লক্ষ করা যায়?
(ক) ভারত বিভাগ (খ) বঙ্গভঙ্গ (গ) পাকিস্তান সৃষ্টি (ঘ) বঙ্গভঙ্গ রদ

৪। উক্ত ঐতিহাসিক বিভক্তির মূল কারণ হলো–
i) প্রশাসনিক ii) অর্থনৈতিক iii) রাজনৈতিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i খ) i ও ii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন
i) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ii) দিজেন্দ্রলাল রায় iii) রজণীকান্ত সেন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত?
(ক) বিদেশী পণ্য গ্রহণ (খ) বিদেশি পণ্য বর্জন (গ) কোরিয় পণ্য গ্রহণ (ঘ) বিলেতি পণ্য বর্জন

সৃজনশীল প্রশ্ন

রোহন ও রাফসান নতুন বছরের জন্য কেনাকাটা করতে বাজারে যায়। রোহন তার পছন্দের তালিকায় বিদেশি বেল্ট জুতা ইত্যাদি রাখলেও রাফসান বিদেশি পণ্য পরিত্যাগ করে দেশীয় পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য কেনার পক্ষে মত দেয়। অবশেষে রাফসান ভাই রোহনকে দেশীয় পণ্য কেনার জন্য রাজী করাতে সক্ষম হয় এবং উভয়ে দেশী পণ্য কিনে বাসায় আসে।

ক. মুসলিম লীগ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
খ. সর্বভারতীয় কংগ্রেস গঠিত হয় কেন?
গ. পাঠ্য পুস্তকের কোন আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাফসান দেশীয় পণ্য ক্রয় করে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. তুমি কী মনে কর রোহনের মানসিকতা নিজ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা স্বরূপ? যুক্তি দিন।

পাঠ-১২.৪ খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- এই আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	জাতীয় ভিত্তিক গণআন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, খলিফা, রাওলাট আইন, সশস্ত্র বিপ্লব, গেরিলা পদ্ধতি, চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী, স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার।

ভূমিকা

হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্ব পূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয় ভিত্তিক গণ-আন্দোলন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এই ঐক্য স্বল্পকালের হলেও সারা ভারতের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

খিলাফত আন্দোলনের কারণ

ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হন। কারণ ধর্মীয় কারণে তাঁরা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। কিন্তু এই যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে জার্মানির পক্ষে যোগদানের কারণে শাস্তি স্বরূপ তুরস্ককে খণ্ড-বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করা হয়। ফলে ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে। যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্বদেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও দুই ভাই মাওলানা শওকত আলী এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলী।

অসহযোগ আন্দোলনের কারণ

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে মন্টেগু চেম্স্ফোর্ড সংস্কার আইনের নৈরাশ্যজনক ধারাগুলো ভারতীয়দের মনে গভীর হতাশার সৃষ্টি করে। ঠিক এ সময় একদল ভারতীয় যুবক জার্মানির সহযোগিতায় স্বাধীকার অর্জনের চেষ্টা করে। এই অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার নির্যাতন ও দমনমূলক রাওলাট আইন পাস করে। কংগ্রেস এই আইনের তীব্র নিন্দাও প্রতিবাদ করে। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে হরতাল পালিত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ১৩ এপ্রিল ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় দিন। এই দিন পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র জনতার উপর ব্রিটিশ সেনাবাহিনী গুলি চালায়। ফলে প্রায় ৪০০ সাধারণ মানুষ নিহত হয়। তাছাড়া সংবাদপত্রের উপর হস্তক্ষেপ এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়।

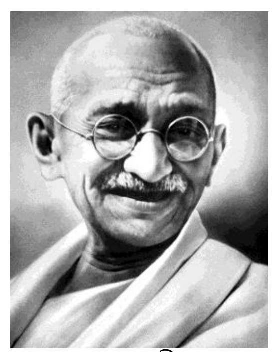

মহাত্মা গান্ধী

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দে এই আন্দোলন সর্বভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে উত্তর প্রদেশের চৌরিচোরা নামক স্থানে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সহিংসতায় রূপ নিলে হঠাৎ করে এই আন্দোলন বন্ধের ডাক দেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রেফতার হলে আন্দোলন স্থিমিত হয়ে যায়। অপর দিকে তুরস্কের

জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল আতার্তুক বিদেশী বাহিনীকে দেশ থেকে বিতারিত করেন। তুরস্কে জাতীয়তাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে খিলাফত আন্দোলনও থেমে যায়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য

এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে। কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ বিভেদ ও শাসননীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির এক রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। অপর দিকে এই ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। এই আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের নয়, সারা ভারতের জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দুই-ই ছিল ক্ষণস্থায়ী। আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশস্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাকেই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অতর্কিতে বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হলেও এর আগেই সংগ্রাম শুরু হয়ে ছিল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরামের বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের আগেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। এই আন্দোলন কোলকাতা কেন্দ্রিক হলেও ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও। এই সময় বিপ্লবীরা ইংরেজ কর্মকর্তা, ইংরেজদের হত্যা, বোমা হামলার মধ্য দিয়ে ইংরেজ সরকারের মধ্যে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কোলকাতায় গোপনে বোমা তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র আনার পরিকল্পনাও করা হয়।

মাস্টারদা সূর্যসেন

ক্ষুদিরাম

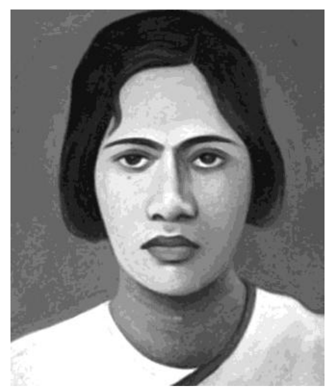

প্রীতিলতা

বিপ্লবীদের কোনো কোনো পরিকল্পনা সফল হয়, কোনোটি ব্যর্থ হয়। ইংরেজ প্রশাসনের চরম নির্যাতন মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড কোনো কিছুই বিপ্লবীদের তাদের দুঃসাহসী সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকারের বেঙ্গলঅর্ডিনেন্স জারির কারণে বহু বিপ্লবী কারারুদ্ধ হয়। ফলে আন্দোলন কিছুটা স্থিমিত হলেও ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার বৃদ্ধি পায়। বাঙালি তরুণরা মৃত্যু ভয়কে তুচ্ছ করে সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এমন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, সাঁর আসল নাম সূর্যসেন (১৮৯৪-১৯৩৪)। তিনি চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসন মুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই বিপ্লবী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাঙ রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠান দখল করে, সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে 'স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার' গঠনের ঘোষণা দেয়। যুদ্ধ ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে। এ যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। ফলে গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে বিপ্লবীরা পিছু হটে। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে সূর্যসেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে সংক্ষিপ্ত ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ জানুয়ারি তাকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং তাঁর লাশ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়। সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাও ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য

কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা। প্রীতিলতা তার যোগ্যতার জন্য চট্টগ্রাম 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। সফল আক্রমণের পরে সহযোদ্ধাদের বাঁচাতে ধরা পড়ার আগেই বিষপানে তিনি আত্মহত্যা করেন। এই সশস্ত্র আন্দোলন চলে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

সশস্ত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ

এই আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ গণবিচ্ছিন্নতা। শুধু কিছু সংখ্যক দুঃসাহসী শিক্ষিত দেশপ্রেমিক তরুণ এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

বিপ্লবীদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে সাধরণ মানুষ আতঙ্কিত ছিল। বিষয়টি গোপনে পরিচালিত হতো বলে এ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না।

তাছাড়া বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠি এর সঙ্গে যুক্ত ছিল না। সনাতন ধর্মীয় কিছু আচার আনুষ্ঠানিকতা মেনে শপথ নিতে হতো বলে মুসলমানদের পক্ষে এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না।

সর্বোপরি চরম দমননীতির কারণে গণবিচ্ছিন্ন বিপ্লবীরা অসীম সাহস দেশপ্রেম থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হন। সশস্ত্র বিপ্লব সফল না হলেও বিপ্লবীদের আত্মাহূতি, দেশপ্রেম ও সাহস পরাধীন বাংলা তথা ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে ছিল। তাঁদের আত্মত্যাগ পরবর্তী আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়ে ছিল।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**) /শিক্ষার্থীর কাজ**	সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণসমূহ অনুসন্ধান করুন।

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে খিলাফত, অসহযোগ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দুটি আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকলেও যৌথ নেতৃত্বের কারণে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম দেশব্যাপী গণসচেতনতা জাগরণ সৃষ্টিতে সফল হয়। অপর দিকে দুঃসাহসী তরুণদের সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তাদের দেশপ্রেম আত্মাহূতি কিংবদন্তীর মতো মানুষে মুখে মুখে ফিরতে থাকে। সুতরাং এই সব আন্দোলন গণমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

খিলাফত

১। কে তুরস্ককে আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন?

(ক) রেজা শাহ (খ) মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ

(গ) আবুল কালাম আজাদ (ঘ) মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক

২। খিলাফত আন্দোলন বলতে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত?

(ক) ১৯১৯ সালের মুসলিম জাহানের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলন

(খ) ১৯২০ সালে তুরস্কে ক্ষমতা লাভের জন্য আন্দোলন

(গ) তুরস্কের অখণ্ডতা ও মুসলিম জাহানের খিলাফতের মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন

(ঘ) বাংলার মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের উৎপীড়ন থেকে রক্ষার যে আন্দোলন

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন। (অভিন্ন তথ্য ভিত্তিক)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর ওফাতের পর পর্যায়ক্রমে তার প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্রের প্রধান নিযুক্ত হন হযরত আবু বকর (রা), হযরত ওমর (রা), হযরত ওসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা)। সে সময় থেকেই খলিফা পদটি মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ পদ হিসেবে পরিগনিত হয়ে আসছে।

৩। উদ্দীপকের ন্যয় মুসলিম জাহানের সর্বোচ্চ পদের সম্মান রাখতে বৃটিশ ভারতে কোন আন্দোলন গড়ে ওঠে?

(ক) অসহযোগ (খ) খিলাফত

(গ) স্বদেশী (ঘ) ভারতছাড়

৪। ভারতে উক্ত আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যারা–
(ক) মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী
(খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও লিয়াকত আলী
(গ) জওহরলাল নেহরু ও মতিলাল নেহরু
(ঘ) আবুল কালাম আজাদ ও আবুল হাশিম

অসহযোগ

১। মহাত্মা গান্ধী কখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন?
(ক) ১৯০৯ সালে (খ) ১৯১৪ সালে
(গ) ১৯১৮ সালে (ঘ) ১৯১৯ সালে

২। কোন আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম সবাই সক্রিয়ভাবে যোগদান করেছিল?
(ক) খিলাফত ও অসহযোগ (খ) অসহযোগ
(গ) ফরায়েজি (ঘ) ওয়াহাবী

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

এই অল্প কিছুদিন আগে বিভিন্ন চা বাগানে নিম্ন মজুরীর প্রতিবাদে চা শ্রমিকরা বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমে আসে। রাস্তা অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করতে থাকলে চা শ্রমিক নেতা নিতাই তাদের সহিংস আচরণ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আহবান জানান।

৩। উদ্দীপকের শ্রমিক নেতা নিতাই, ভারতীয় উপমহাদেশের কোন স্বনামধন্য নেতার গৃহীত নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন–
(ক) মাস্টারদা সূর্যসেন (খ) স্যার সৈয়দ আহ্মেদ
(গ) মহাত্মা গান্ধী (ঘ) আবুর কালাম আজাদ

৪। উক্ত নেতার কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল–
i) হিন্দু মুসলিম ঐক্য দৃঢ়করন
ii) নির্যাতন মূলক আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ
iii) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সশস্ত্র

১। মাস্টারদার প্রকৃত নামের ক্ষেত্রে কোনটি সমর্থনযোগ্য–
(ক) মাস্টার মশাই (খ) সূর্যসেন
(গ) আরজ আলী (ঘ) অজয় সেন

২। প্রীতিলতা কোন স্থান আক্রমনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?
(ক) পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব (খ) পাহাড়তলী সানশাইন ক্লাব
(গ) পাহাড়তলী খ্রিস্টার ক্লাব (ঘ) পাহাড়তলী ইউরেশিয়ান ক্লাব

৩। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেন কোনটি?
(ক) নেতৃত্বের অভাব (খ) গণবিচ্ছিন্নতা
(গ) ধর্মীয় বিরোধ (ঘ) একতার অভাব

পাঠ-১২.৫ লাহোর প্রস্তাব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি বলতে পারবেন;
- লাহোর প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া এর পরিণতি জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বরাজদল, বেঙ্গল প্যাক্ট, নেহরু রিপোর্ট, চৌদ্দ দফা, সাইমন কমিশন রিপোর্ট, গোলটেবিল বৈঠক, দ্বি-জাতিতত্ত্ব, দিল্লি প্রস্তাব-১৯৪৬।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর কংগ্রেসের সঙ্গে মতপার্থক্য দেখা দিলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর সমর্থকদের নিয়ে 'স্বরাজদল' গঠন করেন। তিনি মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক সমঝোতা ও সমতার ভিত্তিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে স্বাক্ষরিত 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামের এই চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে পড়ে কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা এবং দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যুর কারণে। পরবর্তী কালে 'নেহরু রিপোর্ট', জিন্নাহর চৌদ্দ দফা, ব্রিটিশ সরকারের সাইমন কমিশন রিপোর্ট, লন্ডনে অনুষ্ঠিত তিনটি গোলটেবিল বৈঠক; কোনটিই সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কোনো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। এই পটভূমিতে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়।

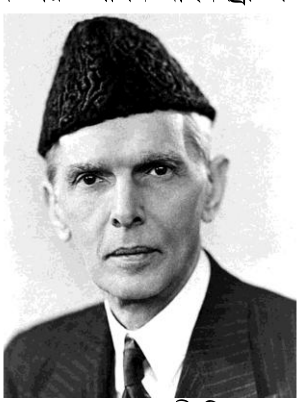

মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ

জওহরলাল নেহরু

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

এই আইনের আওতায় অনুষ্ঠিত ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচন পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িকতা এবং রাজনৈতিক সংকট আরো বৃদ্ধি পায়। কারণ অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলিম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে থাকে। তাছাড়া নির্বাচনের পরে কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু মন্তব্য করেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার এবং কংগ্রেস ছাড়া আর কোনো শক্তি নেই। মুসলমানদের মধ্যে এর তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। জিন্নাহ নেহরুর বক্তব্যের প্রতিবাদে তার 'দ্বি-জাতিতত্ত্বের' ঘোষণা দেন। তার দ্বিজাতিতত্ত্ব অনুযায়ী হিন্দু মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। তাদের ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উভয়য়ের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। এভাবে লাহোর প্রস্তাবের আগেই হিন্দু ও মুসলমানের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের চিন্তার প্রকাশ ঘটতে থাকে।

অবশ্য মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্রের দাবি প্রথম উত্থাপন করেন আল্লামা ইকবাল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঞ্জাবি ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী। দুটি প্রস্তাবের একটিতেও বাংলার মুসলিম প্রধান অঞ্চলের কথা

বলা হয়নি। চৌধুরী রহমত আলীর প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়।

লাহোর প্রস্তাব : প্রধান ধারাসমূহ

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে লাহোরে মুসলিম লীগের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ. কে ফজলুল হক ২৩ মার্চের অধিবেশনে তাঁর রচিত যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। তাই ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ–

ক. ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

খ. পূর্বোক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের প্রদেশগুলো হবে স্বশাসিত ও সার্বভৌম।

গ. সর্বক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ. প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

উল্লিখিত প্রস্তাবের ধারাসমূহের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এটিকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রচার হতে থাকে। ফলে দ্রুত এ প্রস্তাবটি ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

লাহোর প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া এবং পরিণতি

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন এবং মুসলমানদের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি অসম্ভব বলে উল্লেখ করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে বাঙালি মুসলমান পূর্বাংশ নিয়ে ‘স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র’ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ৯ এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জিন্নাহ বেআইনীভাবে ‘লাহোর প্রস্তাব’ সংশোধনের নামে ভিন্ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। সুতরাং, বলা যেতে পারে যে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী নয়, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে উত্থাপিত দিল্লি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়। লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্য এই যে- এটি গ্রহণ বর্জন এবং বাতিল কোনোটাই করা হয়নি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	লাহোর প্রস্তাব কী পাকিস্তান প্রস্তাব ছিল? এই প্রস্তাবের ধারাসমূহ অনুযায়ী কী পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যার মাধ্যমে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে। ভারতের এক জটিল রাজনৈতিক সংকটের সময় এ.কে. ফজলুল হক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠনের প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের আইন সভার সদস্যদের সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাব অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য একটি রাষ্ট্র গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠন করা হয়- যার নাম পাকিস্তান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলায় স্বরাজ দলের অভূতপূর্ব জয়ের কৃতিত্ব ছিল কার?
(ক) মহাত্মা গান্ধী (খ) চিত্তরঞ্জন দাস
(গ) মতিলাল নেহেরু (ঘ) শরৎ বসু

২। বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরিত হয় কখন?
(ক) ১৯২০ সালে (খ) ১৯২১ সালে
(গ) ১৯২২ সালে (ঘ) ১৯২৩ সালে

৩। লাহোর প্রস্তাব কে উত্থাপন করেন? (জ্ঞানমূলক)
(ক) মাওলানা ভাসানী (খ) আল্লামা ইকবাল
(গ) এ কে ফজলুল হক (ঘ) চৌধুরী রহমতুল্লাহ

৪। লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের অঞ্চলসমূহ– (উচ্চতর দক্ষতা)
i) ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ii) পূর্বাঞ্চালে iii) দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উনিশ শতকে চল্লিশের দশকে ভারতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি সম্বলিত একটি প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। মনে করা হয়ে থাকে এ প্রস্তাবের মাধ্যমেই স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল। এটি বৃটিশ ভারতের তৎকালিন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

ক. কোন আইনের বলে পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম হয়?
খ. বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক কারণ ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকে আপনার পঠিত কোন প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে? তার মূল কারণ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত প্রস্তাব ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ – আপনি কী একমত? মতামত দিন।

পাঠ-১২.৬ ব্রিটিশ শাসন অবসান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- সুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন;
- বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি বিষয়ে (১৯৩৭-৪৭) মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- অখন্ড বাংলার উদ্যোগ সম্পর্কে পর্যালোচনা করতে পারবেন;
- ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয় বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ক্রিপস মিশন প্রস্তাব; আজাদ হিন্দ ফৌজ, আজাদ হিন্দ সরকার, মিত্রবাহিনী, বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব, নৌবিদ্রোহ, ক্যাবিনেট মিশন, ভারত স্বাধীন আইন-১৯৪৭।

‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ক্রিপস মিশন প্রস্তাব সব মহল প্রত্যাখ্যান করলে সমগ্র ভারত ব্যাপী তীব্র গণঅসন্তোষ দেখা দেয়। উপমহাদেশের বাইরে এ সময় পৃথিবী ব্যাপী চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ। জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র জাপানের ভারত আক্রমণের আশঙ্কায় ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতিকে এই আক্রমণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়লে জাপানের ভারত আক্রমণের পরিকল্পনার পরিবর্তন হতে পারে। এই চিন্তা করে তিনি ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যেতে বলেন। শুরু হয় কংগ্রেসের ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন। মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে তিনি তাঁর দৃঢ় ঘোষণায় উল্লেখ করেন ‘আমি অবিলম্বে স্বাধনিতা চাই। এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই, উষালগ্নের আগেই যদি তা সম্ভব হয়।’ তিনি আরো বলেন ‘আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করবো। আর এ হবে আমাদের জীবনে শেষ লড়াই।’

কিন্তু ইংরেজ সরকার কোনোভাবেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না। সরকার এই আন্দোলন দমনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ঐ দিনই মধ্য রাতে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ গান্ধীজি, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরুসহ অনেকে গ্রেফতার হন। কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সব নেতা কারাগারে বন্দি হন। নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের কারণে অহিংস আন্দোলন ভয়াবহ সহিংস আন্দোলনে পরিণত হয়। নেতৃত্বহীন আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণে সারা ভারত নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কোথাও কোথাও অস্থায়ী সরকার, কোথাও বা জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তমলুক থানা দখল করার সময়, মাতঙ্গিনী হাজরা নামে এক বৃদ্ধ পুলিশের গুলি সত্ত্বেও জাতীয় পতাকা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে রেখে শহীদ হন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

এই আন্দোলনের পরপর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মানুষকে দিশেহারা করে তোলে। তাছাড়া দেশব্যাপী মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি সব মিলে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে হতাশ জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে।

সুভাষচন্দ্র বসুর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ

যখন দেশের অভ্যন্তরে চরম হতাশা বিরাজ করছে, ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তখন যুদ্ধ করে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য বাঙালিদের নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' বা Indian National Army (INA)। এই বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসু।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি, ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ বসু ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে সবার অলক্ষ্যে দেশত্যাগ করেন। প্রথমে তিনি ইংরেজদের শত্রু ভূমি জার্মানিতে যান এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটি সেনাবাহিনী গঠনে জার্মান সরকারের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, যিনি বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে যুদ্ধ করে মাতৃভূমি স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভারতীয় ভূখণ্ডের আন্দামান দ্বীপে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সরকারে সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং সুভাষ বসু তখন ছিল ইংরেজদের কাছে আতঙ্ক। এই দুঃসাহসী বাঙালি নেতার নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে বার্মা হয়ে ভারত ভূমিতে পদার্পন করে। কোহিমা ইম্ফলের রণাঙ্গনে বীরত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে এসব অঞ্চল দখল করে নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণাঙ্গনে জাপানি বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণের মুখে পিছু হটলে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পিছু হটতে হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের রেঙ্গুন ত্যাগ, মিত্রবাহিনীর বিজয়, আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রযাত্রা ব্যহত করে। ব্যর্থ হয় এক দুঃসাহসী বাঙালি দেশপ্রেমিকের লড়াই করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা। নেতাজি সুভাষ বসু সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। তখনি রচিত হতো বাঙালির দেশপ্রেম আর বীরত্বের আরেক গৌরবের ইতিহাস।

বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি

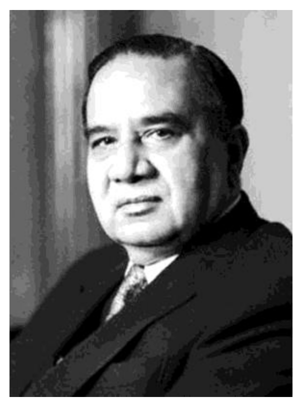

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এ সময় বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান রাজনীতিবিদদের উত্থান ঘটে। পরপর যে চারটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সবগুলোই গঠন করেন মুসলিম নেতারা। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কৃষক প্রজা পার্টি নামে একটি নতুন পার্টি জনসমর্থন লাভ করে। এর সভাপতি ছিলেন এ কে ফজলুল হক। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে। তবে কেউ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় এককভাবে সরকার গঠন করার যোগ্যতা থেকে দু'দলই ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ফজলুল হক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তবে এই মন্ত্রিসভা ছিল দুর্বল। ফলে কৃষক প্রজা পার্টিও দুর্বল হয়ে পড়ে। জিন্নাহের সাথে মতবিরোধের কারণে ফজলুল হক ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন থাকায় ঐ বছর ডিসেম্বর মাসেই তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। বহুদলের সমাবেশে গঠিত এই মন্ত্রিসভা বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করে। ফজলুল হক চেয়ে ছিলেন এই নতুন ধারার মাধ্যমে বাংলার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন না পেয়ে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। দুর্ভিক্ষে ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মৃত্যু বরণ করে। এই বছর ১৩ এপ্রিল দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই মন্ত্রিসভারও পতন ঘটে।

পরের বছর প্রাদেশিক নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম লীগ দু'টি উপদলে বিভক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৪ আসনে জয়লাভ করে। যা প্রকারন্তরে পাকিস্তান দাবির প্রতি বাংলার মুসলমানদের সুস্পষ্ট সমর্থনের প্রতিফলন ঘটায়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ নির্বাচন ও

নির্বাচনের ফল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রকৃত পক্ষে সোহরাওয়ার্দির মন্ত্রিসভার সময়কাল ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান, দেশ বিভাগের রাজনৈতিক পরিবেশে কলকাতার দাঙ্গা, স্বাধীন অখন্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও ভারত বিভাগ ছিল এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক চরম পর্যায়ে চলে গেলে তা এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপ নেয়। এ রকম এক জটিল ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ঘোষণা করে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দে যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাসে বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব নামে খ্যাত।

মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তিকালে শরৎচন্দ্র বসু এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের প্রবক্তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর বাংলাকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

প্রথম দিকে কংগ্রেস মুসলিম লীগ উভয় দলের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলেও জিন্নাহ, গান্ধীর প্রতি মৌন সমর্থন ছিল। মুসলিম লীগের গোঁড়াপন্থীরাও সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা এর তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে শুধু কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব সব দলের সমর্থন হারায়।

একই সঙ্গে পশ্চিম বাংলা কেন্দ্রিক বাঙালি অবাঙালি ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী-এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও যুক্ত বাংলার বিপক্ষে সোচ্চার ছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকা যুক্তবাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাতে থাকে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে লর্ড মাউন্টব্যাটন ভারত বিভক্তির ঘোষণায় পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের পরিকল্পনা করেন। জুন মাসের ২০ তারিখে বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিলে বাংলা ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। ফলে উক্ত আইন অনুসারে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট জন্ম নেয় পাকিস্তান নামের এক কৃত্রিম মুসলিম রাষ্ট্র। পূর্ব বাংলা যুক্ত হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। আর ১৫ আগস্ট জন্ম হয় আরেক রাষ্ট্র ভারতের, যার সঙ্গে যুক্ত হয় পশ্চিম বাংলা। এ ভাবেই প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সশস্ত্র অভিযান ব্যর্থ হলেও তাঁর অভিযান ভারতীয় স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার করেছিল। তিনি ব্রিটিশ ভারতে দেশীয় সেনাসদস্যদের আনুগত্যে যেমন ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমন তাদের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন। এ কারণেই আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতার পর ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইয়ে নৌ বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব আলামত প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয়দের আয়ত্তে রাখা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয় লাভ করে। এই পরিবর্তনের ধারা ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। শ্রমিকদল ভারতের স্বাধীনতা দানের এবং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইংল্যন্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দুটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন অবাঙালি ব্যবসায়ী ও রক্ষণশীলদের নেতা। অপর দিকে আবুল হাশিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ছিলেন প্রগতিশীল বাঙালিদের নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দিই বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে মুসলমান তরুণ ছাত্রসমাজ মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রধান নির্বাচনী কর্মসূচি করে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক আইন সভায় অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচন এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুস্পষ্ট রায় ঘোষিত হয় এবং মুসলিম লীগ নিজেকে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী এক মাত্র দল হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য, বর্তমান পাকিস্তান অংশে এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোট লাভে

ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের ভোটে পাকিস্তান প্রস্তাব জয়ী হয়েছিল। এই জয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি এবং তাঁর অনুসারী ছাত্র নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

নির্বাচন-উত্তর উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিচক্ষণ এ্যাটলি সরকার বুঝতে পারেন যে সম্মানজনকভাবে খুব বেশি দিন ব্রিটেনের পক্ষে ভারত শাসন করা সম্ভব হবে না। ফলে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্সের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভারতে আসে। যাকে বলা হয়, ক্যাবিনেট মিশন। এ সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশন পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়ে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্যাবিনেট মিশন মে মাসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে।

মন্ত্রিমিশন বা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। এতে পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য হলেও মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে। কারণ তারা মনে করে যে, পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত আছে। কংগ্রেস এ পরিকল্পনায় এক কেন্দ্রিক সরকার গঠনের মধ্যে অখণ্ড ভারত গঠন দাবির প্রতিফলন দেখতে পায়। কংগ্রেস নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তাবটি গ্রহণে রাজি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে মুসলিম লীগও তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো অকেজো হয়ে যায়।

বড় লাট ওয়েভেল এই অবস্থায় মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দলকে অন্তর্ববর্তীকালীন সরকারে যোগদানের আহ্বান জানান। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি নেহরুর মুসলিম লীগ স্বার্থ বিরোধী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদানের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কিন্তু বড় লাটের আহ্বানে নেহরু সরকার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে। এই দিন ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের আগেই ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের জন্য লর্ড ওয়েভেলের পরিবর্তে লর্ড মাউন্টব্যাটনকে ভারতের বড় লাট হিসেবে পাঠানো হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দেশরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ দেশ-বিভাগে সম্মত হতে বাধ্য হন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসের ৩ তারিখে মাউন্টব্যাটন সুস্পষ্টভাবে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। অপরদিকে পাকিস্তান দাবি মেনে নেওয়ায় মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই লন্ডনে কমন্স সভার এক ঘোষণায় ভারত, পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমানা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। ৯ আগস্ট র‍্যাডক্লিফ তাঁর সীমান্ত রোয়েদাদ সমাপ্ত করে তা ভাইসরয়ের কাছে জমা দেন। যা রহস্যজনক কারণে আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করা হয়। যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বিভক্ত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এ্যাটলি ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত কেন গ্রহণ করেন? সতীর্থদের সঙ্গে এর পিছনের ঘটনাসমূহ সম্পর্কে আলোচনার ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসন অবসানের পূর্ব মুহূর্তে শুধু বাংলা না সারা ভারত জুড়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছিল। ভারতবাসী স্বাধীনতা ছাড়া আর কোন কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ইংল্যান্ডের নব নির্বাচিত লেবার পার্টি সরকার বুঝতে পারে এই অবস্থায় বেশি দিন ভারত শাসন করা যাবে না। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বড় লাট ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করেন এবং ঐ বছর ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নামে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বিভক্ত হয় ভারতীয় উপমহাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। গান্ধীজি কত সালে "ভারতছাড়" আন্দোলন প্রচার করেন?
(ক) ১৯৪২ (খ) ১৯৪৩
(গ) ১৯৪৪ (ঘ) ১৯৪৫

২। ১৯৪৩ খ্রিঃ সৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ–
i) মানুষকে দিশেহারা করে তোলে
ii) অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে
iii) ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। INA নিচের কোনটিকে সমর্থন করে? (প্রয়োগ)
(ক) Indian National Army (খ) Indian National Assembly
(গ) Indian aceademy for national Army (ঘ) International New Army

৪। বৃহত্তর যুক্ত বাংলার প্রস্তাবকে বলা হয়–
(ক) বসু-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব (খ) হাশিম-বসু প্রস্তাব
(গ) হাশিম-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব (ঘ) হক-সোহরাওয়ার্দি প্রস্তাব

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ ঃ	১. খ	২. খ	৩. ক	৪. খ	৫. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ ঃ	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ ঃ	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ঘ	৫. ঘ	৬. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ ঃ	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ক		
	১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৫ ঃ	১. খ	২. ক	৩. খ			
	১. খ	২. ঘ	৩. গ	৪. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৬ ঃ	১. ক	২. ঘ	৩. ক	৪. ক		

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির আত্মপরিচয়

ইউনিট ১৩

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করাকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বাধিকারের প্রশ্নে এই অঞ্চলের জনগণকে শুরুতেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে সংকটের শুরু। ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরে দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্র ভাষার অধিকার আদায় করতে গিয়ে শহীদ হলেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে। তাদের রক্তের বিনিময়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ অর্জন করে রাষ্ট্র ভাষা বাংলার অধিকার। তবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের নীতির কোনো পরিবর্তন হয় নি। ফলে স্বাধিকার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। এরই পথ ধরে ছয় দফা ও এগার দফার আন্দোলন বিকশিত হয়। ধারাবাহিক পরিণতিতে সংঘটিত হয় ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৩.১ : ভাষা আন্দোলনের পটভূমি
পাঠ-১৩.২ : ভাষা আন্দোলন
পাঠ-১৩.৩ : পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি
পাঠ-১৩.৪ : ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন
পাঠ-১৩.৫ : সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫)
পাঠ-১৩.৬ : ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন
পাঠ-১৩.৭ : উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-১৩.১ ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের পটভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও তাদের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	উর্দু, বাংলা, তমদ্দুন মজলিস, রোমান হরফ

দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভাষা, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাসসহ সকল ক্ষেত্রে বিস্তর ব্যবধান ছিল। কিন্তু এত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও শুধু ধর্মের ভিত্তিতে প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটারের অধিক ব্যবধানে অবস্থিত পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি অসম রাষ্ট্র গড়ে তোলা হয়। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। বাঙালি জাতি মাতৃভাষার ওপর আঘাতের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি এসময়ে পূর্ব বাংলায় গঠিত বিভিন্ন সংগঠনও এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে *তমদ্দুন মজলিশ* গঠিত হয়। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এই সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিল বাঙালির সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন যা এই আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে।

ভাষা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পটভূমি

ভাষার ওপর আঘাত একটি জাতি এবং তার সংস্কৃতির ওপর আঘাতেরই শামিল। বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যই বাংলা ভাষার ওপর আঘাত করা হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথম থেকেই পূর্ব বাংলার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। ফলে জনগণকে প্রতিরোধ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সাংস্কৃতিক প্রশ্ন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলো পরের দিকে গুরুত্ব পেয়েছিল বেশি। বাংলা ভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষা সংস্কার কমিটি

পূর্ব বাংলার জনগণের আন্দোলনের মুখে প্রাদেশিক সরকার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে বাংলা ভাষা সংস্কারের জন্য মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে সভাপতি এবং কবি গোলাম মোস্তফাকে সম্পাদক করে একটি সংস্কার কমিটি গঠন করে। দেড় বছর ব্যাপক আলাপ আলোচনার পর কমিটি সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্টে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও বর্ণমালার প্রচুর সংস্কারের পরামর্শ দেয়া হয়। নতুন ভাষার নামকরণ হয় 'সহজ বাংলা'। কমিটি রোমান বা উর্দু হরফে বাংলা লেখার প্রশ্নকে কমপক্ষে বিশ বছরের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেয়। এ সময়ের মধ্যে উর্দু ভাষাকেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের আহ্বান জানায়। এই রিপোর্টটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পছন্দ হয় নি বলেই তা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নি।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা

ভাষা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে শুরু থেকেই যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মধ্য থেকে জন্ম নিতে থাকে অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর আহ্বায়ক মনোনিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঁইয়া। ১৯৫১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সংস্কৃতি সংসদ' নামে আরেকটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই সংগঠনটি ক্রমে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। সংসদের নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্য সভা বসত। এ সমস্ত সংগঠনের তৎপরতার মধ্য দিয়ে ভাষা প্রশ্নের গুরুত্ব মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকে। তারা বুঝতে পারে রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে পূর্ববাংলায় সব ধরনের উন্নতি থেমে

যাবে। তমুদ্দুন মজলিশ পুস্তিকা প্রকাশ করে জানিয়ে দেয় পূর্ববাংলার শিক্ষার বাহন, আইন আদালত ও অফিসের ভাষা বাংলা করতে হবে। এভাবে ভাষা আন্দোলনের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট তৈরি হয়ে যায়। যার শক্তির উপর দাঁড়িয়ে রূপলাভ করে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত বিস্ফোরণ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	তমদ্দুন মজলিস সম্পর্কে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই একটি সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পাকিস্তানি শাসকরা পূর্ববাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা শুরু করে। এ দেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে তারা উর্দু করতে চায়। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করতে থাকে। এদেশের মানুষের কাছে এই অসৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ পেয়ে যায়। ফলে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায় মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। এরই পরিণতিতে সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে গ্রহণের পক্ষে মত দেয় কে?

i. চৌধুরী খালিকুজ্জামান
ii. ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ
iii. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) iii ঘ) i, ii ও iii

২। ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন কোনটি?

ক) তমদ্দুন মজলিশ খ) রেনেসাঁ সোসাইটি
গ) সাহিত্য সংসদ ঘ) রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ

৩। কার নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়?

ক) অধ্যাপক নুরুল হক ভূইয়া খ) অধ্যাপক আবুল কাশেম
গ) মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ঘ) কবি গোলাম মোস্তফা

পাঠ-১৩.২ ভাষা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাষা আন্দোলনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন ও এর ভূমিকার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ২১শে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা রাষ্ট্রভাষা, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, সালাম, বরকত, রফিক

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৩৭ সাল থেকে ভাষা বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তমদ্দুন মজলিসের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক মনোনীত হন নূরুল হক ভূঁইয়া। পরবর্তীকালে এ উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি কমিটি গঠিত হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তমদ্দুন মজলিসের গঠিত প্রথম সংগ্রাম পরিষদটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আশ্বাস দেন যে, মানি অর্ডার, ফরম, ডাকটিকিট ও মুদ্রায় ইংরেজি-উর্দুর পাশাপাশি বাংলায় লেখা হবে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৮ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া বক্তৃতায় সুকৌশলে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্রদের মধ্যে হতে 'না' 'না' ধ্বনি সম্বলিত প্রতিবাদ ওঠে।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এক অধিবেশনে নিম্নপর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু মুসলিম লীগের সদস্যদের ভোটে তা অগ্রাহ্য হয়। এই সংবাদ ঢাকায় পৌছুলে এদেশের ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে মাতৃভাষার মর্যাদা রাখতে হলে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজন।

২৬ ও ২৯ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ ছাত্রসমাজ দেশের বরেণ্য বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। এ পরিষদের আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম। শুরু হয়ে যায় একের পর এক আন্দোলনের কর্মসূচি। নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ হরতাল আহ্বান করে। শামসুল আলমসহ ৬৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৩-১৫ মার্চ ঢাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলন তীব্রতর হলে নাজিমুদ্দিন ১৫ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ৮ দফা চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ও ব্যবস্থাপক সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপনে রাজি হন। কিন্তু ৬ এপ্রিল পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে নাজিমুদ্দিন সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে ১৫ মার্চের চুক্তি ভঙ্গ করে উর্দুকে পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব করেন। পরিষদের বিরোধী দলের প্রতিবাদের ফলে প্রস্তাবটি পরিষদে উত্থাপিত হলেও বাস্তবায়ন হয় নি।

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কঠোর নীতি

১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ঘোষণা করেন 'উর্দুই এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানায়। আন্দোলনকারীদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। জিন্নাহর এ ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনমনে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এ সময়ে সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। তখনও ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলন কর্মসূচি

১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত সময়কে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব বলা যায়। এই সময়ে আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে আকরাম খানকে সভাপতি করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী 'পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। এই কমিটি গঠনের প্রতিবাদ জানায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'। দেশ জুড়ে এর প্রতিবাদে সভাসমাবেশ চলতে থাকে। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হন। তখন তাঁর স্থলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের এক উক্তিকে কেন্দ্র করে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপলাভ করে।

একুশে ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত আন্দোলন

খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি ঢাকা সফরে আসেন। ২৭ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনিও জিন্নাহর মতো ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। এবার প্রতিবাদে ফেটে পড়ে ছাত্র জনতা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে ৪ ফেব্রুয়ারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ৩১ জানুয়ারি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের দিন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সরকার আন্দোলনকে কঠোর হাতে দমন করার কৌশল গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন আন্দোলন দমন করার জন্য ২০ তারিখ থেকে পরবর্তী এক মাসের জন্য ঢাকা জেলার সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করেন। এর মাধ্যমে ঢাকায় যেকোনো প্রকার সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্ররা সরকারি এই সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নিতে পারে নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন হলে সভা করে তাঁরা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আবদুল মতিন, ওলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতারা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে জোড়ালো মত দেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বর) ছাত্রদের সমাবেশে ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী যোগ দেয়।

সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠি চার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। ফলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বিকেলে ব্যবস্থাপক পরিষদের সভার দিকে প্রতিবাদ মিছিল অগ্রসর হতে গেলে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে। মাতৃভাষার দাবি জানাতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন– আবুল বরকত, আবদুস সালাম, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার এবং আহত হন কয়েকজন ছাত্রীসহ অনেকে। সে সময়ে গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতা শহীদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও

কয়েকজন শহীদ হন। অনেকে গ্রেফতার হন। যে স্থানে ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল সেই স্থানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩ ফেব্রুয়ারিতে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে।

পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়নের প্রতিবাদে ঢাকা শহরে ২৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ফুলার রোডে একজন কিশোর নিহত হয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ডা. সাঈদ হায়দারের নকশা অনুসারে রাতে মেডিকেল কলেজের গেইটের সামনে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি তা উদ্বোধন করা হয়। ১৯৬৩ সালে অস্থায়ী শহীদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। ১৯৭২ সালে পূর্বের নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহীদ মিনারটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি বাঙালির শহীদ দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষিত হয়। নিম্নে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য আলোচনা করা হলো।

প্রথমত, ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগঠিত গণআন্দোলন। এটি শুধু ভাষার মর্যাদার জন্যই গড়ে ওঠে নি। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। বাঙালিরা অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় হিসেবে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠাকে বেছে নেয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাই ষাটের দশকে স্বৈরশাসন বিরোধী ও স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে আন্দোলনে প্রেরণা জোগায়।

দ্বিতীয়ত, ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। এই আন্দোলন দ্বিজাতি তত্ত্বের ধর্মীয় চেতনার মূলে আঘাত হানে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভেঙ্গে অসাম্প্রদায়িক চেতনার আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে ধীরে ধীরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, ভাষা আন্দোলনে মুসলিম লীগ জনগণের মানসিকতা ও স্বার্থ উপেক্ষা করে জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দলটি শোচনীয়ভাবে পরাজয় ঘটে। এরপর আর কোনো নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়ী হয় নি।

ভাষা আন্দোলনের শহীদগণ

চতুর্থত, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ২১ ফেব্রুয়ারি শোক দিবস হিসেবে ছুটি ও শহীদ দিবস ঘোষণা করে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়। ১৯৬২ সালে সংবিধানে তা বহাল থাকে।

পঞ্চমত, যুক্তফ্রন্ট পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য, ভাষা বৈষম্য তুলে ধরে। যা ষাটের দশকে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় যার প্রেরণা ছিল ভাষা আন্দোলন।

ষষ্ঠত, ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ দলীয়ভাবে তাদের স্টাডি সেন্টারে একুশে ফেব্রুয়ারির দিন একটি প্রভাত ফেরি আয়োজন করবে এবং প্রভাতফেরি শেষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবে।

সারাংশ

ভাষা আন্দোলন পূর্ব বাংলার জনগণের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মাতৃভাষাকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ সময় পূর্ববাংলার ছাত্র সমাজজীবন বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই শাসকদের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণ কোনো সহানুভূতি পায় নি। তাই তাদেরকে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তারা হয়েছে সংঘবদ্ধ। শেষ পর্যন্ত তাদের চূড়ান্ত আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। মায়ের ভাষাকে রক্ষা করেছে বুকের রক্ত দিয়ে। এই ঘটনা পূর্ববাংলার জনগণের মনের শক্তিকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অধিকার আদায়ের সব আন্দোলনে একুশের চেতনা সরাসরি ভূমিকা রেখেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন কোথায়?

i. রমনার রেসকোর্স ময়দানে
ii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে
iii. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?

ক) নূরুল আমিন খ) খাজা নাজিমুদ্দিন
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) চৌধুরী খালিকুজ্জামান

৩। বর্তমান শহীদ মিনারের নকশা ও পরিকল্পনা কার?

ক) হামিদুর রহমান খ) ডা. সাঈদ হায়দার
গ) আবুল হাশিম ঘ) গোলাম মাহবুব

৪। কত খ্রিস্টাব্দে ইউনেস্কো কর্তৃক ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর স্বীকৃতি দেয়া হয়?

ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৯৯

সৃজনশীল প্রশ্ন

অ, আ, ক, খ আমার দুঃখীনি বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার রক্তাক্ত বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার গর্বিত বর্ণমালা
অ, আ, ক, খ আমার অহংকারী বর্ণমালা

ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কে ছিলেন? ১
খ. যুক্তফ্রন্ট কী? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অংশটুকু আপনার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. আপনি কী মনে করেন যে আমার বর্ণমালা অহংকারী ও গঠিত? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১৩.৩ পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানি শাসকরা কীভাবে পূর্ববাংলার সম্পদ শোষণ করার চিন্তা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার প্রতি পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র কেমন ছিল তার বিবরণ দিতে পারবেন।
- শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে পূর্ববাংলার জনগণ কতটা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- পূর্ববাংলার জনগণের প্রতি পাকিস্তানিদের বৈষম্যের প্রতিক্রিয়া কতটুকু সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	বৈষম্য, পাট, চা, সেনাবাহিনী, শোষণ

ভূমিকা

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় নি। বরং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিতে পূর্ব বাংলাকে সুদীর্ঘ ২৪ বছর আন্দোলন ও সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা হয় যার সফল পরিণতি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পূর্ব বাংলা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী উভয়পদেই নিয়োগ দেয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। পূর্ব বাংলার মতামত উপেক্ষা করে পাকিস্তানের রাজধানী করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে এবং পরে তা ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। এমনকি সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে সংখ্যা সাম্যনীতি মানতে বাধ্য করা হয়।

প্রশাসনিক বৈষম্য

১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত একটি হিসেব থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানের মন্ত্রীপরিষদ, পররাষ্ট্র, কৃষি, সংস্থাপন, স্বরাষ্ট্র, অর্থ, শিল্প, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, তথ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মোট ৬৯ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই ছিলেন পাঞ্জাবি। বাঙালি ছিলেন মাত্র ৩ জন। বেসামরিক সিএসপি কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৯৪৮-৬৩ পর্যন্ত ৩৪৬ জনের মধ্যে মাত্র ১২৬ জন (৩৬.৪%) ছিলেন বাঙালি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছিলেন ২১৮ জন (৬৩.৬%)।

সামাজিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। সরকারের অর্থনৈতিক এবং পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পূর্ব পাকিস্তান প্রথম থেকেই বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে দু'ধরণের সমাজজীবন পরিচালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের জীবনযাপন উন্নতমানের হলেও পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল বৈষম্যের শিকার। বাঙালিরা যাতে রাজনীতিতে সক্রিয় হতে না পারে এজন্য তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগগ্রস্ত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যেও দামের পার্থক্য থাকতো, যাতে তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে।

অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সেবার জন্য অনেক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ফলে সার্বিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের জীবনযাত্রার মান ছিল অনেক উন্নত।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের প্রকাশ ঘটে সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানিদের আধিপত্য ছিল। ক্ষমতার শীর্ষে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। তাদের এই বৈষম্যমূলক নীতি সামরিক বাহিনীতে নিয়োজিত বাঙালি সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। ক্রমশ এই অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানি শাসনামলে অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ছিল ভয়াবহ। ফলে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নি। পূর্ববাংলা ছিল সম্পদশালী। এই সম্পদ এদেশবাসী ভোগ করতে পারত না। পাকিস্তানি শাসকরা তা ছিনিয়ে নিত। পুরো পাকিস্তানের আয়ের ৬০ ভাগ আয় হতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজস্ব হতে। অথচ আমাদের অঞ্চলে এর মাত্র ২৫ ভাগ ব্যয় করা হতো। আর বাকি সব নিয়ে যাওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানের রপ্তানি আয়ের ৬০ ভাগ যেত পূর্বপাকিস্তান থেকে। কিন্তু পূর্বপাকিস্তানকে আমদানি দ্রব্যের মাত্র ২৫ ভাগ দেয়া হতো।

শিল্পের কাঁচামাল পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন হলেও বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে তারও মালিকানা থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। কৃষি উন্নয়নের জন্য যে ঋণ পাওয়া যেত তার সিংহভাগ কৃষিভিত্তিক অঞ্চল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০-এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দানা বাধতে থাকে এবং এ আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপলাভ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষাক্ষেত্রেও বাঙালিরা সুস্পষ্ট বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কেন্দ্রের বেলায় ১৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিই অবস্থিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন বৃত্তির সিংহভাগ সুবিধা পায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা। পূর্ব বাংলায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে বিদ্যালয় সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্যের ফলে ১৯৪৭-৪৮ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববাংলায় যেখানে শিক্ষিতের হার পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি ছিল সেখানে প্রায় বিশ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষিতের হার পূর্ববাংলার চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। ১৯৫৫-৫৬ থেকে ১৯৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষাখাতে ২০৮৪.৬ মিলিয়ন রুপি বরাদ্দ হলেও পূর্ব পাকিস্তানে করা হয়েছে মাত্র ৭৯৭.৬ মিলিয়ন রুপি অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য

চাকুরি ও নিয়োগের ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। পূর্ববাংলাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল যাতে তারা চাকরির প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। সিভিল, মিলিটারি ও অন্যান্য চাকরির মূল নিয়োগ দানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে নিজেদের মতো করে নীতি নির্ধারণ করা সহজ হতো। দেখা যাচ্ছে, সামরিক বাহিনীর সকল পর্যায়ের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরির ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের প্রধান দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তান। অনেক চাকরির বিজ্ঞাপন পূর্ববাংলার সংবাদপত্রে দেয়াই হতো না। এ ছাড়াও মনোনয়ন বোর্ডের অধিকাংশ সদস্যই হতেন পশ্চিম পাকিস্তানি। এসব কারণে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের পক্ষে উচ্চ পদে নিয়োগ পাওয়া ছিল খুব কঠিন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশ। এদের ভাষা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অন্যদিকে পাকিস্তানের বাকি ৪৫ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরনের। এদের মধ্যে মাত্র ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করে। এছাড়াও হাজার বছরের পুরনো বাঙালি জাতির সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে বাঙালিদের পাকিস্তানি করণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের এই বৈষম্য বাঙালিরা মেনে নিতে পারেনি। তাই পূর্ব বাংলায় সাংস্কৃতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রথমে প্রতিবাদ এবং পরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

বৈষম্য নীতির প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যের চিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে পূর্ববাংলার জনগণ স্বাভাবিকভাবেই বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে। পৃথিবীতে আর একটি দেশও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে একই রাষ্ট্রের এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের এমন ব্যাপক অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়ন চলে। যতদিন পর্যন্ত এই বৈষম্যের বিষয়টি পূর্ববাংলার জনগণের কাছে স্পষ্ট হয় নি ততদিন স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে নি। কিন্তু ক্রমে পাকিস্তানিদের চরিত্র প্রকাশিত হয়ে পড়লে এ অঞ্চলের জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে কয়েক পর্যায় প্রতিক্রিয়া দেখা যায়–

প্রথমত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথম প্রতিবাদ গড়ে ওঠে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নকে নিয়ে। ৫৫% লোকের বাংলা ভাষা উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিবাদে **১৯৪৮** ও **১৯৫২** সালে ব্যাপক আন্দোলন দেখা যায়। ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানি শাসকদের শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় প্রতিবাদ ছিল **১৯৫৪** সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। এই নির্বাচনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা হয়। শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে মুসলিম লীগ রাজনীতি থেকে চির বিদায় নেয়।

তৃতীয়ত, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির বিরুদ্ধে বাঙালিরা আবার প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। **১৯৬২** সালে আইয়ুব খানের সংবিধানের বিরুদ্ধে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন ক্রমে শিক্ষা রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে ছয় দফা ভিত্তিক, আগরতলা মামলা বিরোধী সর্বোপরি গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানের পতনের মাধ্যমে বৈষম্য বিরোধী প্রতিক্রিয়া সফল হয়।

চতুর্থত, পাকিস্তানি সরকার কর্তৃক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ ছিল **১৯৬৬** সালে ছয় দফা দাবি উত্থাপন। ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

পঞ্চমত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বাঙালির রায় ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। যদিও বাঙালি জাতিকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় বাঙালি রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ বৈষম্য-এর একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে একটি রচনা লিখবেন।

সারাংশ

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে অভিন্ন দেশ পাকিস্তানের সৃষ্টি হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কাছ থেকে পূর্ববাংলা সমান দৃষ্টি ও সহানুভূতি পায় নি। তার বদলে সম্পদশালী পূর্ববাংলাকে শোষণ করে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হয়। শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হয় পূর্ববাংলা। অবশেষে বাঙালিদের কাছে পরিষ্কার হয় পাকিস্তানি শাসকচক্রের শোষকের চেহারা। তারা ক্রমে আন্দোলনমুখর হয়ে পড়ে অধিকার আদায়ের জন্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবি ও পাঠান বাদে বাংলাসহ অপরাপর জাতির চাকুরির জন্য শতকরা কতভাগ কোটা নির্ধারণ করা হয়?

ক) ৫ খ) ২৫
গ) ৩৫ ঘ) ৬৫

২। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য করে?

i. অর্থনৈতিক
ii. প্রতিরক্ষা
iii. সাংস্কৃতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ১৯৭৪-৪৮ অর্থ বছরের পূর্ব বাংলায় শিক্ষিতের হার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে–

ক) কম খ) অনেক কম
গ) বেশি ঘ) অনেক বেশি

৪। উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা কোন বৈষম্যের অন্তর্ভুক্ত?

ক) শিক্ষা খ) সাংস্কৃতিক
গ) চাকুরি ঘ) সামাজিক

পাঠ-১৩.৪ ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কীভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের প্রাদেশিক নির্বাচন, নির্বাচনের ফলাফল ও তাৎপর্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	যুক্তফ্রন্ট, শেরেবাংলা, সোহরাওয়ার্দী, ভাসানী, ২১ দফা

ভূমিকা

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। মূলত এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই পাকিস্তানের পরাজয় ও নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উত্থানের সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়েছিল।

যুক্তফ্রন্ট গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল সবচেয়ে পুরাতন ও বড় রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন দলের রাজনীতিবিদগণ বুঝতে পারেন ক্ষমতাসীন সরকারী দল মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনে জয়লাভ করা কঠিন হবে। ইতোমধ্যেই ১৯৪৯ সালে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের পরিকল্পনা নেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। দলগুলো ছিল-

ক. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ,

খ. শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি,

গ. মওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী এবং

ঘ. হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। ২১ ফেব্রুয়ারিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য যুক্তফ্রন্টের ইশতেহার করা হয় ২১ দফা। ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। যুক্তফ্রন্ট তাদের ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবিতে গণমানুষের অধিকারের কথা তুলে ধরে। এই দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা
২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ
৩. পাটের ব্যবসায় জাতীয়করণ করা
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
৫. পূর্ব পাকিস্তানে লবণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করা
৬. কারিগর মুহাজিরদের কাজের ব্যবস্থা করা

৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধের জন্য খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করা
৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা
৯. অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করা
১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা
১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা
১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা ও মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি না করা
১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা
১৪. জন নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি বাতিল করা
১৫. বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ করা
১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা
১৭. বাংলা ভাষা করার দাবিতে নিহত শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা
১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান
২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা
২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

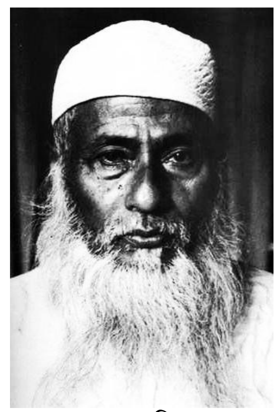
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও ফলাফল

১৯৫৪ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল প্রধানত স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২ এপ্রিল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। নির্বাচনে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিশাল ব্যবধানে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন। পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৪টি, তফসিল ফেডারেশন ২৭টি, খেলাফতে রব্বানী ২টি, খ্রিস্টান ১টি, বৌদ্ধ ১টি, কম্যুনিস্ট পার্টি ৪টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনসহ মুসলিম লীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতা পরাজিত হন। মূলত মুসলিম লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতা, রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের অবস্থান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধিতা, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি ও নেতৃত্বের জনবিচ্ছিন্নতাই মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রথম অবাধ নির্বাচন। এ নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় এ অঞ্চলের মানুষের মনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোরদার হয়। এ

নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে।

মন্ত্রিসভা গঠন

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের অন্যতম নেতা সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রী সভার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রির দায়িত্ব ছাড়াও অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। মে মাসে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউজকে বাংলা একাডেমি করার প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ বিজয় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ ভালোভাবে গ্রহণ করে নি। তাই শুরু থেকেই তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এ সময়ে এ. কে. ফজলুল হক কলকাতা সফরে দুই বাংলা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল ফজলুল হক আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতা গিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতা দেয়ার সময় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দুই বাংলা যে অভিন্ন তা বর্ণনা করেন।

তার এই বক্তৃতার সূত্র ধরে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা সুযোগ পেয়ে যান। তারা দেখতে পেলেন এই বক্তৃতার রেশ ধরে ফজলুল হককে অপসারণ করা যেতে পারে। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। প্রচার করা হয় ফজলুল হক ভারতের কাছে পূর্ববাংলা বিক্রি করে দিতে চান। একই সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে পূর্ববাংলার বিভিন্ন স্থানে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হতে থাকে।

মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও বিহারী শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ী করতে থাকে। এই সময়ে 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ৩০ মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন। এ শাসন জারি ছিল ১৯৫৫ সালের ২ জুন পর্যন্ত। মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে নি। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন বলবৎ ছিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগের পরাজয় কারণসমূহ চিহ্নিত করে একটি রচনা লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানি শাসক চক্রের শাসন ও শোষণে মানুষ মুসলিম লীগের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার মানুষ মুসলিম লীগকে পরাজিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। এভাবে পূর্ববাংলার কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করে। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা। কিন্তু মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে অল্পদিনের মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। তখন পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করা হয় এবং ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কত দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে?
ক) ৬ খ) ৮ গ) ১১ ঘ) ২১

২। কত খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৪৯ গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৫৪

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর লিখ।
বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে তথা জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে অংশ নেয়।

৩। পাকিস্তানের ইতিহাসে উক্ত প্রক্রিয়ায় প্রথম জোটবদ্ধ দলটি কত খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে অংশ নেয়?
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬ গ) ১৯৬২ ঘ) ১৯৭০

৪। উক্ত নির্বাচনে জয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন কে?
ক) এ কে ফজলুল হক খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) আবু হোসেন সরকার ঘ) সৈয়দ আজিজুল হক

পাঠ-১৩.৫ সামরিক শাসন ও তৎকালীন রাজনীতি (১৯৫৬-১৯৬৫)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান জারি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল ও তাঁর কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	সংবিধান, সামরিক শাসন, আইয়ুব খান, মৌলিক গণতন্ত্র

ভূমিকা

একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর বিভিন্ন পর্যায় হতে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি উত্থাপিত হয়। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার পক্ষ থেকে সংবিধান প্রণয়নের জোড়ালো দাবি ওঠে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ঘোষণা করা হয়। এটি ছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সংবিধান। এ সংবিধানের মাধ্যমে 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র' নাম ধারণ করে। পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোকে একত্রিত করে এক ইউনিট গঠন করা হয় এবং নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব বাংলার নাম হয় পূর্ব পাকিস্তান। সংবিধানে সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্য নীতি স্বীকৃতি হয়। বাংলা এবং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। তবে এই সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশ হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা করা হয়। পূর্ব বাংলার সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিস্থিতি অনুধাবন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা নতুন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠিত হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনিহার কারণে এই কাজে বিলম্ব হয়।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল খুবই কম। মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তাদের সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এই কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ হয় এবং কমিটির সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা হয়।

মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমিমাংসিত থেকে যায়। ১৯৫৫ সালে গভর্ণর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধান চালু ছিল মাত্র দু বছর। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয়। সংবিধান স্থগিত করার সাথে সাথে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ

গোলাম মুহাম্মদের পদত্যাগের পর ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁর অগণতান্ত্রিক আচরণ ও হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৫৬-৫৮ সালের মধ্যে কেন্দ্রে তিনটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তানেও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের মধ্যে গোলযোগে পরিষদ কক্ষেই ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী আহত হন এবং পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে প্রেসিডেন্ট মির্জা বেসামরিক শাসন অবসানের উদ্যোগ নেন।

সামরিক শাসন জারি

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই শাসন ব্যবস্থায় একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। সেনাপ্রধান আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করেন। সংবিধান বাতিল, আইন পরিষদ ও মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার গণতন্ত্র বিরোধী উপরিউক্ত কার্যক্রমে প্রধান সহযোগী ছিলেন আইয়ুব খান। উচ্চবিলাসী আইয়ুব খান ২৭ অক্টোবর ২১ দিনের মাথায় ইস্কান্দর মির্জাকে পদচ্যুত করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা

জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। অতঃপর তিনি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালে 'পোডো' (Public Office Disqualification Order, PODO) এবং 'এবডো' (Elective Bodies Disqualification Order, EBDO) নামক দুটি আদেশ জারি করে রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ ও নির্বাচনে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করেন।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন

১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের শাসন কাঠামো এবং রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের উদ্যোগ নেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে একটি নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন। তাঁর এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার লাভ করে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পাকিস্তানের দুই অঞ্চল থেকে ৪০ হাজার করে ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্য নির্বাচন করা হয়। আইয়ুব খান ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় নিম্ন থেকে উচ্চ স্তরগুলো ছিল :

১. ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে),

২. থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়) এবং তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে),

৩. জেলা পরিষদ,

৪. বিভাগীয় পরিষদ।

এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকতেন। এরাই জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোট দানের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ১৯৬০ সালে এসব মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন ও ১৯৬২ সালের সংবিধান

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ পূর্ব-পাকিস্তানে অসন্তোষ বৃদ্ধি করে। ১৯৬১ সালের শেষ দিকে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দীকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এই খবর পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন দমনে আইয়ুব সরকার গ্রেফতার নির্যাতন চালালে ছাত্র গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের ১ মার্চ একটি সংবিধান ঘোষণা করেন। সংবিধানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মন্ত্রীসভা ও গভর্ণরের ক্ষমতা সংকোচিত করা হয়। প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত করা হয়। বিচার বিভাগের ক্ষমতাও খর্ব করা হয়।

প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য আইয়ুব খান ও পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালান। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরীফ কমিশনের শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপলাভ করে। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ আগস্ট থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর হরতাল চলাকালে

পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। ৮ জুন সামরিক আইন স্থগিত করে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন

পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত হামিদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কমিশন রিপোর্ট বাতিল এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৬২ সালে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয়। এ অবস্থায় আইয়ুব খান 'রাজনৈতিক দলবিধি' প্রবর্তন করে পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটান। আইয়ুব খান নিজে 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।
পশ্চিম পাকিস্তানে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী দল সক্রিয় হয়। এসময়ে সোহরাওয়ার্দীর উদ্যোগে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ গঠিত হয়। এই ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। এই ফ্রন্ট খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

১৯৬৫ সালের নির্বাচন

১৯৬৪ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ঘোষণা দেন। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খান বিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে 'সম্মিলিত বিরোধী দল' (Combined Opposition Party, COP) নামে একটি জোট গঠন করে। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কপের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের নিরঙ্কুশ সমর্থনে আইয়ুব খান ফাতেমা জিন্নাহকে সহজেই পরাজিত করতে সক্ষম হন। তিনি দ্বিতীয় বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং মে মাসে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফলও সরকারী দলের পক্ষে যায়। অবৈধ প্রভাব ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে ব্যবহার করেই আইয়ুব খান নির্বাচনে জয় নিশ্চিত করেন। ফলে ১৯৬৫ সালের নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে নি।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ সেপ্টেম্বর ভারত লাহোর আক্রমণে অগ্রসর হয়। ১৭ দিন যুদ্ধের পর জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ২৩ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষিত হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত 'তাসখন্দ চুক্তি'র মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া

পাক-ভারত যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবলভাবে জাগ্রত হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ ও তাসখন্দ চুক্তি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ছিল না। আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। এ যুদ্ধের সময় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অসহায়ত্বের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের অরক্ষিত অবস্থা প্রকাশিত হয়। তদুপরি যুদ্ধজনিত কারণে অর্থনীতিতে অহেতুক চাপ পড়ে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীগণ একটি গনতান্ত্রিক দেশে সামরিক শাসন কী কী সংকট সৃষ্টি করতে পারে তার উপর একটি বিতর্কসভা আয়োজন করুন।

সারাংশ

১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান রচিত হয়। পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার বিরোধী কার্যকলাপে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উদ্ভুত রাজনৈতিক পরিস্থিতি **১৯৫৮** সালে সামরিক আইন জারি করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর অগণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ছাত্র গণআন্দোলনের সূচনা করে। নানা রকম কূটকৌশল ও দমন নীপিড়ন সত্ত্বেও আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। **১৯৬৬** সালে ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে তা আইয়ুবের শাসন ভিত্তিকে প্রকম্পিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান করা হয় কত খ্রিস্টাব্দে?

ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫০

গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৬২

২। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো–

ক) EBDO আদেশ জারি খ) PODO আদেশ জারি

গ) ডেপুটি স্পিকারের মৃত্যু ঘ) সামরিক শাসন জারি

৩। কোন সমস্যার কারণে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়?

ক) তাসখন্দ খ) বাংলা

গ) পাঞ্জাব ঘ) কাশ্মীর

৪। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে–

ক) আদর্শ গণতন্ত্র খ) অভিনব গণতন্ত্র

গ) সার্বজনীন গণতন্ত্র ঘ) প্রচলিত গণতন্ত্র

পাঠ-১৩.৬ ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ছয় দফা দাবি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ছয় দফা উত্থাপন করার পর কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- এগার দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	ছয় দফা, লাহোর, আগরতলা, এগার দফা

ভূমিকা

পাকিস্তানি শোষণ থেকে পূর্ব বাংলার জনগণকে মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা এবং এর পাশাপাশি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সোচ্চার হন।

ঐতিহাসিক ছয় দফা

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। বিরোধী দলের এই সম্মেলন চলাকালে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখান করেন। প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদল সম্মেলন বর্জন করেন। তারপর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে ঢাকায় চলে আসেন। ২১ ফেব্রুয়ারি 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয় দফা-কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ছয় দফাতে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবী। ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ-

ছয় দফার কর্মসূচিসমূহ

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।

২. শুধু দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলোর হাতে।

৩. দেশের দুই অংশে সহজেই বিনিময়যোগ্য অথচ পৃথক দুটো মুদ্রা থাকবে। অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই দেশের দুটি রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থাসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।

৪. আঞ্চলিক সরকারে হাতে থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য করার ও আদায়ের ক্ষমতা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে।

৫. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা আলাদা হিসেব থাকবে। প্রয়োজনে দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্র বৈদেশিক মুদ্রা পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী অর্থাৎ মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

প্রতিক্রিয়া

১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ বিরোধী দলের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা কর্মসূচি গৃহীত হয়। ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দিতে থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান। ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করা হয়। ছয় দফার পক্ষে দ্রুত জনমত গড়ে উঠে। পূর্ব পাকিস্তানে দিন দিন ছয় দফা জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। আইয়ুব খানের সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়। তারা ধরপাকড় শুরু করে এবং ছয় দফাকে রাষ্ট্র বিরোধী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা এই আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য কঠোর দমন নীতি প্রয়োগ করেছিল। রাজনৈতিক নেতাদের উপর শুরু হয় হয়রানি ও নির্যাতন। বিক্ষুব্ধ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পালন করে প্রতিবাদ দিবস। ৭ জুন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেয়া হয়। সরকারের ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে প্রতিবাদী মানুষ মিছিল বের করে। এই দিন পুলিশের গুলিতে ১১ জন নিহত এবং বহুসংখ্যক মানুষ আহত হয়। পুলিশী বর্বরতার প্রতিবাদে ৮ জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত

আগরতলা মামলা চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। প্রতিবাদী মানুষ আসামীদের মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিতে থাকে। অচিরেই এই আন্দোলন আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে রূপলাভ করে। একটি ঘটনা আন্দোলনকে আরও তীব্র করে তোলে। ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে কর্তব্যরত অবস্থায় বিনা কারণে হত্যা করা হয়। এ ঘটনা দ্রুত পরিস্থিতি অশান্ত করে তোলে। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান তাঁর পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ২২ ফেব্রুয়ারি সকল গ্রেফতারকৃত নেতা মুক্তি লাভ করেন। ২৫ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করেন।

সার্জেন্ট জহুরুল হক

এগার দফা আন্দোলন

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে সামরিক শাসন ও আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র হচ্ছিল তখন নেতৃত্বের পুরো ভাগে চলে আসে ছাত্ররা। এ সময়ে ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এগার দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এগার দফা কর্মসূচির ভেতর ছয় দফাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল শিক্ষা সংক্রান্ত বেশকিছু দাবি। এগার দফা কর্মসূচিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিলের কথা বলা হয়। তাছাড়াও শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, নিরাপত্তা আইন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং রাজবন্দিদের মুক্তি প্রভৃতি দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভাবে ক্রমে ছয় দফা ও এগার দফার মধ্য দিয়ে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নিতে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ছয়দফা উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীগণ একটি বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ লিখুন।

সারাংশ

পাকিস্তানি রাষ্ট্রযন্ত্রের বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের গণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ছয় দফা দাবি উত্থাপন করা হয়। এই দাবি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করলে পাকিস্তানি শাসকবর্গ ভীত হয়ে পড়ে। তারা আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার চালাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে বিরোধী দলের অনেক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু এই দমন নীতি তাদেরকে আরও প্রতিবাদী করে তোলে। অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকার মামলা প্রত্যাহার করে। তবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এতে থেমে যায় নি। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্বে চলে আসে। ছাত্ররা উত্থাপন করে এগার দফা দাবি। ছয় দফা ও এগার দফা আন্দোলন ক্রমে গণআন্দোলনের দিকে এগিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ছয় দফা কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে?

i. আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি
ii. মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন
iii. ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিশাল জয়
নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। আগরতলা ভারতের কোন রাজ্যের রাজধানী?

ক) আসাম খ) ত্রিপুরা গ) বিহার ঘ) পশ্চিবঙ্গ

৩। ছয় দফা দাবি প্রথম উত্থাপন করা হয় কোন সম্মেলনে?

ক) ঢাকা খ) লাহোর গ) আগরতলা ঘ) রাজশাহী

সৃজনশীল প্রশ্ন

জনাব 'ম' একটি অঞ্চলের বিরোধী দলীয় নেতা। তিনি শাসক শ্রেণির বৈষম্যমূলক নীতি তথা শোষণের হাত থেকে জনগণের মুক্তির জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি শাসক শ্রেণিকে কয়েকটি দাবি পেশ করেন। কিন্তু তারা দাবি না মেনে উক্ত নেতাকে একটি মামলায় কারাবন্দী করে প্রহসনমূলক বিচারের মুখোমুখি করে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।

ক. EBDO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. পাক-ভারত যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত দফাসমূহের সাথে আপনার পাঠ্য বইয়ের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ উল্লিখিত স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন কী পাকিস্তানি শাসনের সমাধি তৈরি করেছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

পাঠ-১৩.৭ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট কী ছিল তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গণঅভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।
- ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দমালা	গণঅভ্যুত্থান, ডাকসু, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, আসাদ, মতিউর

ভূমিকা

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে এক দুর্বার আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবার একসাথে আন্দোলনে নামে। আইয়ুব খানের পতনের মধ্যে দিয়ে আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সূত্রপাত করে। তাদের এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০ এর দশকে বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিতে এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর এই আন্দোলন ছিল সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৬৯ এর গণআন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মূল কারণ ছিল আগরতলা মামলা দায়ের ও নেতাদের নির্বিচারে গ্রেফতার, ছাত্রদের ওপর পুলিশী নির্যাতন। আর এ অভ্যুত্থানের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে পাকিস্তানি শাসকদের প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের কোন আস্থা ছিল না। এর ফলে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতম হচ্ছিল। আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিয়েও আন্দোলন থামাতে পারে নি।

প্রেসিডেন্ট আইয়ব খান

১৯৬৮ সালের একটি ঘটনা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তোলে। এ সময় আইয়ুব খান তাঁর শাসনকালের উন্নয়ন দশক (১৯৫৮-১৯৬৮) পালনের আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন করেন। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের নিকট আইয়ুব খানের শাসন ছিল শোষণ বঞ্চনা আর নির্যাতনের দশক। এই উন্নয়নের দশক পালন মানুষকে ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আওয়ামী লীগের কিছু নেতৃবৃন্দকে জেল থেকে ছেড়ে দেয়ায় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং আন্দোলন আরও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি মিলে পল্টন ময়দানে একটি জনসভা আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট অংশ মিছিল করে গভর্নর হাউস ঘেরাও করলে পুলিশের সাথে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এর প্রতিবাদে প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে ৮ ডিসেম্বর সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আওয়ামী লীগের ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১দফা দাবি পেশ করে।

এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক একটি মোর্চা গঠন করে ৮ দফা দাবি পেশ করে। এরপর 'ডাক' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে। 'ডাক' এর আহ্বানে ১৪ জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ১৮ জানুয়ারি ধর্মঘট আহ্বান করা হয়।

ধর্মঘটে পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হন। আসাদের মৃত্যুর প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ারি ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে পুলিশ ছাত্রদের মিছিলে বাধার সৃষ্টি করলে বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মতো রাস্তায় নেমে এসেছিল ছাত্র জনতা। পুলিশের বাধা পেয়ে মিছিল আরও দুর্বার রূপ নেয়। মিছিলকারীরা সেক্রেটারিয়েট ভবন আক্রমণ করে এবং একাংশে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঢাকা নগরী বিপ্লবী মিছিলকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এবার মিছিল সরকারী পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও সরকার সমর্থক দৈনিক *মর্নিং নিউজ* অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। এতদিন আন্দোলন ছিল ছাত্র ও আইনজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ২৪ তারিখে তা গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। মিছিলে যোগ দেয় রিকশা ও মোটর যানের চালক আর শ্রমিক সম্প্রদায়। আন্দোলন যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে তখন পুলিশকে সাহায্য করার জন্য শহরে ই.পি.আর নামানো হয়। ই.পি.আর বিভিন্ন স্থানে গুলি চালায়। এতে আন্দোলন না থেমে আরও বেগবান হয়। মিছিলে যোগ দিতে থাকে অধিকহারে যুবক ও সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। ২৪ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহুসংখ্যক মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হন।

মতিউর

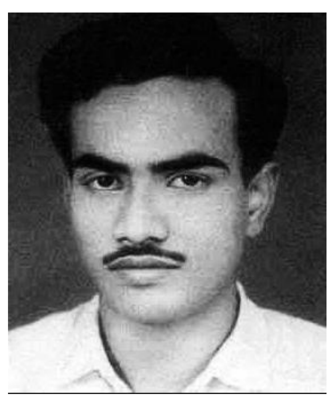

শহীদ আসাদ

১৯৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া

১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।

এরপর আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। আইয়ুব খান অবস্থা বেগতিক দেখে বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। কিন্তু বিরোধী দলীয় নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারি এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না। একই সাথে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে রাজবন্দিদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করেন।

শহীদ ড. মুহাম্মদ শামসুজ্জোহা

২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে প্রধান আসামী শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দেয়া হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ছয় দফা ও এগার দফার দাবি আদায় মূখ্য হয়ে উঠেছিল। গোলটেবিলের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে এবং দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি ২২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে সরিয়ে দিয়ে ড. এম এন হুদাকে নতুন গভর্নর নিযুক্ত করেন। তাতেও গণআন্দোলন শান্ত হয় নি। তখন তিনি ২৫ মার্চ সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে।

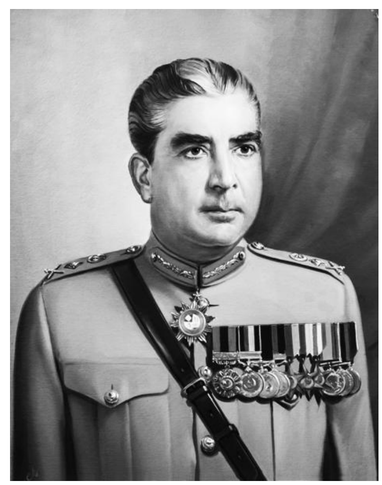

আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান

গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হয় তার সাফল্যজনক পরিণতি আইয়ুব খানের পতন। এ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় সরকার ও সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি মিলে। ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের সময় এ ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্ররা যে ভূমিকা পালন করে তা ব্যাখ্যা করে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

সারাংশ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আইয়ুব খানের দমন নীতি, শোষণ নিপিড়ন, নির্যাতন পূর্ব পাকিস্তানিদের বিক্ষুদ্ধ করে তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত গণরোষ বিপ্লবী করে তোলে প্রতিবাদী মানুষকে। মানুষের মিছিলের জোয়ারে ঢাকার রাজপথ উত্তাল হয়ে উঠে। আন্দোলনে শরিক হয় সমগ্র পূর্বপাকিস্তান। পুলিশ আর সৈন্যরা গুলি চালিয়েও থামাতে পারে নি আন্দোলন। আন্দোলনের মুখে ভেঙ্গে পড়ে সরকারি প্রশাসন। গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। শেষ পর্যন্ত গণঅভ্যুত্থানের মুখে টিকতে না পেরে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন আইয়ুব খান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ বা 'ডাক' এর '৮' মহাত্ম হলো–

i. পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল
ii. প্রতিষ্ঠা ৮ই জানুয়ারি
iii. দাবির সংখ্যা ৮টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি কেন বিখ্যাত?

ক) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যাহার খ) শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান
গ) সার্জেন্ট জহুরুল হককে নির্মমভাবে হত্যা ঘ) আইয়ুব খানের পদত্যাগ

৩। ২৪ জানুয়ারিকে 'গণঅভ্যুত্থান দিবস' হিসেবে পালন করা হয় কারণ ঐদিন–

i. সেক্রেটারিয়েট ভবনে আগুন লাগানো হয়
ii. দৈনিক মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন লাগানো হয়
iii. সর্বস্তরের মানুষের অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

সাম্প্রতিক সময়ে মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়। সরকারের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রশাসনিক সংস্কারসহ অন্যান্য সংস্কার এবং রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে এ আন্দোলন দানা বাধে। সরকার এ আন্দোলন দমন করতে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করলে শেষ পর্যন্ত সরকার পতনের এক দফার দাবিতে দুর্বার আন্দোলন রচিত হয়। এ পর্যন্ত কয়েকটি দেশে জনতার বিজয় নিশ্চিত হয়।

ক. 'অপারেশন সার্চ লাইট' কী? ১
খ. ৭ মার্চের ভাষণ কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. বর্ণিত আন্দোলনের সাথে পাকিস্তান আমলের কোন আন্দোলনের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উক্ত আন্দোলন কী পরবর্তীতে স্বাধীকার অর্জনে প্রভাববিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.১ ঃ ১. গ ২. ক ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.২ ঃ ১.ক ২. ক ৩. ক ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৩ ঃ ১. খ ২. ঘ ৩. ক ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৪ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. খ ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৫ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৬ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৩.৭ ঃ ১. ঘ ২. ক ৩. খ

১৯৭০ এর নির্বাচন ও মুক্তিযুদ্ধ

ইউনিট ১৪

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১৪.১ ঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচন
পাঠ-১৪.২ ঃ অসহযোগ আন্দোলন
পাঠ-১৪.৩ ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা
পাঠ-১৪.৪ ঃ প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ
পাঠ-১৪.৫ ঃ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা
পাঠ-১৪.৬ ঃ মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত
পাঠ-১৪.৭ ঃ স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

পাঠ-১৪.১ ১৯৭০ সালের নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পটভূমি, নির্বাচন পদ্ধতি, আসন বণ্টন প্রভৃতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- আইন কাঠামো আদেশ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ, এক ইউনিট, আইন কাঠামো আদেশ, নির্বাচনী ইশতেহার, শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভূট্টো, আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি, সাইক্লোন।

ভূমিকা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর দেশটির কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ গঠনের লক্ষ্যে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। ১৯৪৭-১৯৫৮ সময়কালে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দেশে সামরিক আইন চালু ছিল। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয় পরিষদ গঠন করা হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রথম দেশের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ লাভ করে।

১৯৭০ সালে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সূচনা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের নিকট থেকে ক্ষমতা গ্রহণের সময় ইয়াহিয়া খান ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেছিলেন। স্বভাবতঃই নির্বাচন অনুষ্ঠান ও জাতীয় পরিষদ গঠন সম্পর্কিত বিষয়গুলো তিনি সামরিক আইনের অধীনে বিভিন্ন ঘোষণার মাধ্যমে জারি করেন। ২৮ নভেম্বরের (১৯৬৯) বেতার ভাষণে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ইয়াহিয়া খান দুই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

প্রথমত ঃ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

দ্বিতীয়ত ঃ 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা দেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেওয়া হয়।

২৮ নভেম্বর (১৯৬৯) ইয়াহিয়া খান আরও কতকগুলি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। যেমন,

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার,
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন,
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা,
৪. বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা এবং
৫. পাকিস্তানে একটি ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ ঘোষণা করা হয় 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal Frame Work Order, LFO)।

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। শেষ পর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল ভাসানী ন্যাপ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি।

নির্বাচন

নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার। ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়। নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭ টি নারী আসনসহ মোট বরাদ্দকৃত আসন ছিল ১৬৯ টি। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি (পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টির নূরুল আমিন। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অপরটি পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে)। ১০ দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

পর্যালোচনা

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে প্রায় সবগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

২. ১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে দেশের দুই অংশের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কোনো মিল ছিল না।

৩. পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের পক্ষে বিপুল রায় ছিল ৬ দফার প্রতি গণরায় এবং পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের জন্য বাঙালির ম্যান্ডেটস্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে প্রত্যাখান করে।

নির্বাচন পরবর্তী রাজনীতি

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দুই মেরুতে অবস্থান করে। আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ন রাখে। পক্ষান্তরে পিপিপি সহ অন্যান্য দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। ভূট্টো হুমকি দেন যে, তাঁর মতামত গ্রহণ করা না হলে তাঁর দল জাতীয় সংসদে অধিবেশন বয়কট করবে। প্রত্যুত্তরে শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগও তাদের দাবিতে অটুট থাকে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর দাবিকে গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ১ মার্চ (১৯৭১) এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পুরো পূর্ব পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শুরু হয় মার্চের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) /শিক্ষার্থীর কাজ	১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব পর্যালোচনা করে নিজের ভাষায় একটি রচনা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। এক ব্যক্তি এক ভোট ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বন্টন করায় এই নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন ও ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন নির্ধারণ করা হয়েছিল। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬০ টি সাধারণ ও ৭টি মহিলা আসন লাভ করার মাধ্যমে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ স্বৈরাচারী আইয়ুব শাসনের অবসানের পর কে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন? (জ্ঞানমূলক)

ক) টিক্কা খান খ) জুলফিকার আলী ভূট্টো
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) ইয়াহিয়া খান

২। নিচের ছকটি দেখে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

নির্বাচন	মোট আসন সংখ্যা	আওয়ামীলীগ	পিপলস পার্টি
জাতীয় পরিষদ	৩১৩	১৬৭	৮৮
প্রাদেশিক পরিষদ	৩০০	২৮৮	-

উদ্দীপকে (ছকে) কত সালের নির্বাচনের ফলাফল দেখানো হয়েছে?

ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৬৫
গ) ১৯৭০ ঘ) ১৯৭৩

৩। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে কী হয়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক) পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে
খ) পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়
গ) পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবর্গ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়
ঘ) মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়

৪। বিশ্বের সকল বিবেকবান মানুষ বাঙালিদের দুঃসময়ে এগিয়ে আসলেও পাকিস্তানের শাসকবর্গ নিষ্ক্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি কোন ঘটনা মনে করিয়ে দেয়?
ক) ১৯৬৯ সালের জলোচ্ছ্বাস
খ) ১৯৭০ সালের ঘুর্ণিঝড়
গ) ১৯৭১ সালের দুর্ভিক্ষ
ঘ) ১৯৭২ সালের বন্যা

পাঠ-১৪.২ অসহযোগ আন্দোলন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৯৭১ সালের মার্চের অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- অপারেশন সার্চলাইট সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পূর্ব পাকিস্তান, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন, টিক্কা খান, পল্টন ময়দান, স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি, ৭ মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট, গণহত্যা।

৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে পুরো পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১ তারিখেই পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ "স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" গঠন করে। অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ২ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত ছাত্র গণজমায়েত শেষে ডাকসু'র ভিপি আ স ম আবদুর রব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার পল্টন ময়দানে আয়োজিত জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয়। ইশতেহারে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের তিনটি লক্ষ্য স্থির করা হয়। এখানে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ জাতি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করার কথা বলা হয়। পাশাপাশি ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করার প্রতি জোর দেওয়া হয়। তখন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সকল কর্মপন্থা ঘোষণা করা হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল:

১. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে;
২. আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করে মুক্তি বাহিনী গঠন করতে হবে;
৩. সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করে সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে, ইত্যাদি।

২ মার্চ হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে হতাহতের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়। তখনকার আন্দোলন কর্মসূচিতে ছিল : ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ প্রতিদিন সকাল ৬:০০ টা থেকে বেলা ২:০০ টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। পাশাপাশি ৭ মার্চ বেলা ২ টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভার কথাও বলা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা লক্ষ্য করে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ (১৯৭১) জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। একই দিন জেনারেল টিক্কা খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পান।

শেখ মুজিবের ৭ মার্চের ভাষণ

হরতাল ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহিংসতার দিকে মোড় নিতে শুরু করে। পুরো পূর্ব বাংলার মানুষ আন্দোলনে ফুঁসে উঠতে শুরু করে। এমনি পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত ভাষণে শেখ মুজিবুর

রহমান ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন-

ক) অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;

খ) অবিলম্বে সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;

গ) প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে এবং

ঘ) (জাতীয় অধিবেশনের পূর্বেই) জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, এই শর্তগুলো মানলেই যে শেখ মুজিবুর রহমান ২৫ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবেন এমন নিশ্চয়তা তিনি ভাষণে দেননি। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন। বিশেষ করে 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে তিনি উচ্চারণ করেন। এই ভাষণে তিনি যে সংগ্রামের ঘোষণা দেন, তার সূচনা ইতোমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর শেখ মুজিব যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি করেন তা না পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছিল অসহযোগ। ইতোমধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন ও 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি শীর্ষক ইশতেহার প্রচারের ফলে স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন, এমনটাই ছিল জনপ্রত্যাশা। কিন্তু স্বাধিকার, স্বাধীনতা অর্জন কিংবা আলাদা কোনো দেশ সৃষ্টির দাবির বিষয়ে তিনি তার ভাষণে স্পষ্ট করে কিছু না বলায় পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিকামী মানুষ কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। এই ভাষণের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ ভাষণ পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

নতুন প্রস্তাবনা ও সমঝোতার প্রচেষ্টা

পূর্ব পাকিস্তানে যখন অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, গোটা বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তেমনি মুহূর্তে ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি করেন। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান সমঝোতার উদ্দেশ্যে কয়েকজন জেনারেলসহ ঢাকায় আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক চলে। ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

ইয়াহিয়া খান ভূট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ছিল। তাছাড়া পাকিস্তান সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য ছিলেন পাঞ্জাব থেকে আগত। মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা চলাকালেই ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান বুঝতে পারেন এই সংকট আর রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার সাধ্য তাদের নেই। তাই সামরিক হামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনকে দমনের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাসদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়। প্রচুর সামরিক সরঞ্জাম নিয়ে আসা হয় আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে। পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানিদের উপর পরিচালিত হিংস্র সেই হামলার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। প্রয়োজনীয় সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ইয়াহিয়া খান আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঐদিন মধ্য রাতেই ৩ ব্যাটেলিয়ান পাকিস্তানি সৈন্য 'অপারেশন সার্চলাইটে' অংশ গ্রহণ করে। তারা ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানদার বাহিনীর নির্মম আক্রমণে প্রাণ হারায় প্রায় বিপুল সংখ্যক নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালি। এভাবেই তারা সংঘটিত করে ইতিহাসের বর্বরতম এক গণহত্যা। এ বিভৎস হত্যা ও ধবংসযজ্ঞের ঘটনায় গোটা জাতি বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ে।

ঐদিন রাত ১:৩০ টায় পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে শেখ মুজিবকে আত্মগোপন করার জন্য তার ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহকর্মী ও সুহৃদগণ পরামর্শ দিলেও তিনি তা না করে নিজ গৃহে অবস্থান করেন। ফলে পাকিস্তানি

বাহিনী তাঁকে সহজেই গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়েই তাঁকে বন্দি রাখা হয়। ৯ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বিভিন্ন বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তার বন্দি হওয়ার খবরটি প্রকাশিত হলে জাতি তা জানতে পারে। গ্রেফতারের পূর্বে শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা নেতা হিসেবে আন্দোলনের কোনো দিক-নির্দেশনা দিয়েছিলেন কিনা, এ বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	স্বাধীনতার ঘোষণা কিংবা নেতা হিসেবে আন্দোলনের কোনো দিকনির্দেশনা না দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার ফলে ২৫ মার্চ ১৯৭১ কী ধরণের সংকট তৈরি হয় তার উপর একটি রচনা তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে লাগাতারভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। যা ইতিহাসে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন নামে পরিচিত হয়ে আছে। ১৫ মার্চ থেকে ইয়াহিয়া খান আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার অভিনয় করেন। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করলে ভয়াবহ সংকটের মুখে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ। এ অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্থ জাতিকে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা প্রদান না করেই শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পূর্বপাকিস্তানের মানুষ চরম সংকটে নিপতিত হয়েছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় কোথায়?

ক) কলাভবন   খ) সংসদভবন
গ) রেসকোর্স   ঘ) বাংলামোটর

২। স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন কে?

ক) মোশতাক আহমদ   খ) আ স ম আবদুর রব
গ) তোফায়েল আহমদ   ঘ) নেয়ামত আলী

৩। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' কোথায় গঠনের কথা বলা হয়?

i) মহকুমা
ii) শহর
iii) জেলায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii   খ) i ও iii
গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৩ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের ঘটনা জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করতে পারবেন;
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বাধীনতার ঘোষণা, জিয়াউর রহমান, কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র, স্বাধীনতা যুদ্ধ, ২৬ মার্চ, ১৬ ডিসেম্বর।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশীদের উপর নির্মম গণহত্যা চালায়। ২৬ প্রথম প্রহরে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। আওয়ামী লীগের প্রধান সারির নেতৃবৃন্দ জীবনের নিরাপত্তা ও কৌশলগত কারণে আত্মগোপনে চলে যান। দলীয় প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা না পাওয়ায় তাদের কেউ কেউ সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয়ের জন্য রওয়ানা দেন। এ ভাবেই বাঙালি জাতির জীবনে এক চরম ক্রান্তিকাল উপস্থিত হয়। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তাদের দাবি অনুযায়ী ঘোষণাটি ই পি আর-এর ওয়ারলেস যোগে চট্রগ্রামে তাঁর ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগী জহুর আহমেদ চৌধুরী কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্ত একটি সরকারি বাহিনীর ওয়্যারলেস ব্যবস্থা, যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তারাও দায়িত্বরত ছিলেন, ব্যবহার করে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রেরণ করা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়।

এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমেদের কন্যা শারমিন আহমেদ এর লেখা "তাজউদ্দিন আহমেদ: নেতা ও পিতা' শীর্ষক গ্রন্থে (পৃ. ৪৪-৪৫ দ্রষ্টব্য) ২৫ মার্চ কালরাত ও শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার এ ঘোষণা বিষয়ে সংশয় তৈরি হয়। তার বর্ণনা মতে, পুরো জাতি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখেই গ্রেফতার হয়েছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালি জাতির এক মহাদুর্যোগকালে চট্রগ্রামস্থ সেনাবাহিনীর অষ্টম রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড মেজর জিয়াউর রহমান কাণ্ডারী হিসেবে হাজির হন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় হত্যাকান্ডের সংবাদ শুনেই চট্রগ্রামে প্রথম প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। 'We revolt' বলে তিনি পকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। জিয়া তাঁর অধীনস্ত সেনা কর্মকর্তা ও সৈন্যদের পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দেন। মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী অফিসারগণ তাঁদের রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেনেন্ট কর্নেল আবদুর রশিদ জানজুয়া ও অন্যান্য অবাঙালি অফিসারদের গ্রেফতার ও হত্যা করেন। উল্লেখ্য যে, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জিয়াকে বিদ্রোহ করতে কেউ নির্দেশ দেয়নি বা আহ্বান জানায়নি। দেশের জন্য নিজের যে কর্তববোধ তা থেকেই দেশ মাতৃকার চরম দুর্দিনে জিয়া সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

ইতোমধ্যে চট্রগ্রামের কালুরঘাটে একটি অস্থায়ী বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এ পর্যায়ে জিয়াউর রহমান এই অস্থায়ী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথমে নিজ নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। জিয়াউর রহমানের প্রদত্ত ঘোষণাটি ছিল নিম্নরূপ: "প্রিয় সহযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, আমি, মেজর জিয়াউর রহমান, প্রভিশানাল প্রেসিডেন্ট এবং লিবারেশন আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ',

এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি, বাংলাদেশ স্বাধীন। আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য যুদ্ধ করছি। আমাদের যুদ্ধ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দখল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। ইনশাআল্লাহ, বিজয় আমাদেরই হবে।" (বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল পত্র, তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য যে, জিয়ার পূর্বোক্ত ঘোষণাটি অন্য কারো লেখা ছিল না। তিনি নিজেই এ ঘোষণাটি লিখেছিলেন। প্রথম ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি কৌশলগত কারণে এর আংশিক সংশোধন করেন এবং দ্বিতীয় ঘোষণাটিতে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উল্লেখ করেন। প্রথম ঘোষণায় তিনি নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান এবং সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে নিজের নাম ঘোষণা করলেও পরবর্তী ঘোষণায় তিনি নিজেকে 'প্রভিশনাল কমান্ডার-ইন-চিফ অব দ্যা বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি' হিসেবে উল্লেখ করেন।

জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ইংরেজি ও বাংলা দু'ভাষাতেই পঠিত হয়েছিল। ঘোষণায় তিনি বাংলাদেশে পরিচালিত পাশবিক গণহত্যার বিরুদ্ধে যার যার দেশে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের সকল সরকারের কাছেও আবেদন জানান। তিনি বাংলাদেশের সার্বভৌম ও আইনানুগ সরকার বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক জাতির স্বীকৃতির দাবিদার বলে উল্লেখ করেন। জিয়া তাঁর ঘোষণায় আরো বলেছিলেন, 'আমরা কুকুর-বিড়ালের মতো মরব না, বরং বাংলা মায়ের যোগ্য নাগরিক হিসেবে মরব।"

মেজর জিয়া তাঁর বেতার ঘোষণায় শেষ শত্রুটি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত এবং বাংলাদেশের প্রতিটি স্থানে শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে জনগণকে অনুরোধ করেছিলেন। মেজর জিয়ার নির্দেশে পরবর্তীতে তাঁর পূর্বোক্ত ঘোষণাটি কিছুক্ষণ পরপর বেতার থেকে নিউজ বুলেটিন আকারে প্রচার করা হয়। ৩০ মার্চ একই বেতার কেন্দ্র থেকে জিয়াউর রহমানের আরেকটি বিবৃতি প্রচারিত হয়, যাতে তিনি পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা রোধে এগিয়ে আসার জন্য জাতিসংঘ ও বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি আহ্বান জানান।

চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে দেওয়া জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঙালি জাতির চরম দুর্যোগ মুহূর্তে কালুরঘাট বেতার ট্রান্সমিটার কেন্দ্র থেকে ভেসে আসা জিয়ার কণ্ঠস্বর 'আমি মেজর জিয়া বলছি' দীর্ঘ সংগ্রামের বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে স্বাধীনতা লাভের জন্য উন্মুখ বাঙালি জাতিকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। তাঁর স্বাধীনতার এ ঘোষণা দিশেহারা মানুষকে স্বস্তি দিয়েছিল, উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দেশি-বিদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের লেখনীর আলোকে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়েই প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। বস্তুত, জিয়ার এই স্বাধীনতা ঘোষণা ছিল বাংলাদেশের মানুষদের জন্য এক মুক্তিবার্তা। এই বার্তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশের বীর জনতা মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

জিয়াউর রহমান ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত এক অকুতোভয় বীরযোদ্ধা। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন জিয়াউর রহমান। মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং যুদ্ধ পরিচালনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের সমস্ত রণাঙ্গণকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে। ১৯৭১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১নং সেক্টরের (চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা) অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মেজর জিয়া। ১৯৭১ সালের ৭ জুলাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নিয়মিত বাহিনীর প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে একটি ব্রিগেড তৈরি করে মেজর জিয়াকে এর কমান্ডার নিয়োগ করা হয়। অধিনায়ক মেজর জিয়ার নামের প্রথম অক্ষর নিয়ে এই ব্রিগেডের নামকরণ করা হয় 'জেড ফোর্স'।

বাঙালি জাতির এক চরম ক্রান্তিকালে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ও রণাঙ্গনে নেতৃত্বদানকারী বীর যোদ্ধা হিসেবে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে নিজের অক্ষয় স্থান নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান, বীরত্ব ও কৃতিত্বের জন্য তিনি একদিকে যেমন বাঙালি জাতির অকুণ্ঠ ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছেন, তেমনি পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিও। মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ও বীরত্বব্যঞ্জক অবদানের জন্য জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মানসূচক 'বীর উত্তম' খেতাবে ভূষিত হন।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে জিয়াউর রহমানকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে তার প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়। তবে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমানকে দেশপ্রেমিক সিপাহী জনতা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণের পথ সুগম করে দেন। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে সবার আগে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এরপর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

মেজর জিয়াউর রহমান

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপারেশন সার্চলাইট নামের প্রাণঘাতী হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তারপর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলেছিল প্রায় নয় মাস। এ যুদ্ধ আপামর জনসাধারণের কাছে মুক্তিযুদ্ধ নামেই পরিচিত। এ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। সে কারণে এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ নামেও পরিচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে। এ জন্য দিবসটি আমাদের কাছে বিজয় দিবস নামে পরিচিত ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক বিবরণ তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

২৫মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন সার্চলাইট নামের গণহত্যা শুরু করে। মেজর জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ করে প্রতিরোধ যুদ্ধের সূচনা করেন। তারপর বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস?

ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ

গ) ১৪ ডিসেম্বর ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

২। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন কে?

ক) আতাউল গনি ওসমানি খ) কে এম শফিউল্লাহ

গ) মেজর জিয়াউর রহমান ঘ) মেজর জলিল

৩। আকলিমা রাজারবাগ পুলিশ লাইন ঘুরতে এসে জেনেছে ১৯৭১ সালে এখানেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে শহীদ হন পুলিশ বাহিনীর অসংখ্য সদস্য। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত–

i) ২৫ মার্চ গভীর রাত

ii) অপারেশন ক্লিনহার্ট

iii) অপারেশন সার্চলাইট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৪ প্রবাসী সরকার এবং ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- প্রবাসী সরকার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- প্রবাসী সরকার গঠনের পটভূমি ও সরকারের সদস্যদের নাম বর্ণনা করতে পারবেন;
- ১১টি সেক্টরে যুদ্ধ সম্পর্কে ধারণালাভ করবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	প্রবাসী সরকার, মুক্তিযুদ্ধ, ইন্দিরা গান্ধী, তাজউদ্দিন আহমদ, ১১টি সেক্টর।

প্রবাসী সরকার

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকারের অবদান ছিল অতুলনীয় ও অপরিসীম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার আত্মপ্রকাশ করে। তখন থেকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে বিজয় অর্জনের সময় পর্যন্ত এই সরকারের কর্মকাণ্ড ছিল ব্যাপক। প্রতিকূলতার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান, এক কোটির ওপর শরণার্থীর জন্য ত্রাণ ব্যবস্থা করা, দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গেরিলা বাহিনী গঠন করে পাকিস্তানী সৈন্যদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করা ছিল এই সরকারের সাফল্য। পাশপাশি স্বাধীন বাংলা বেতারের মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করাও ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

পটভূমি

মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত চলে যান। তারা ১ এপ্রিল 'ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সিনিয়র অফিসারদের সহায়তায় দিল্লি পৌঁছান। তারা ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারপর তাজউদ্দীন আহমদ প্রবাসী সরকার গঠন করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাখা হয় রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী, উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি) হিসেবে সৈয়দ নজরুল ইসলামের নাম নির্বাচিত করা হয়।

তাজউদ্দীন এই সরকারের অপর তিন মন্ত্রী নির্বাচিত করেন যথাক্রমে খন্দকার মোশতাক আহমেদ, এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। তাজউদ্দীন আহমেদ মুক্তিযুদ্ধকালীন সংকটময় সময়ে এই মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই প্রবাসী সরকারকে ভারত স্বীকৃতি প্রদান করে এপ্রিলের ৪ থেকে ৬ তারিখের মধ্যে। এপ্রিলের ৮ অথবা ৯ তারিখ তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম দিল্লী থেকে কলকাতায় আসেন। প্রবাসী সরকার গঠন নিয়ে শুরুতে অনেক তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন আহমেদের দৃঢ়তার ফলে সরকার সুগঠিতভাবে পরিচালিত হয়।

তাজউদ্দিন আহমেদ ১২ এপ্রিল মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান	-	প্রেসিডেন্ট
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	-	ভাইস-প্রেসিডেন্ট
তাজউদ্দীন আহমেদ	-	প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
খন্দকার মোশতাক আহমদ	-	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান	-	অভ্যন্তরীণ সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	-	অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্প

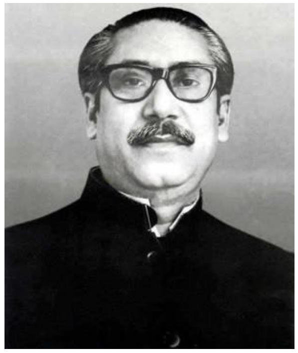
শেখ মুজিবুর রহমান

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমেদ

খন্দকার মোশতাক আহমদ

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

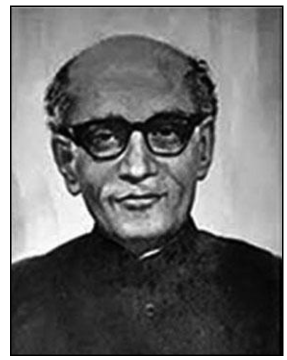
এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান

১৭ এপ্রিল (১৯৭১) নতুন সরকার শপথ গ্রহণ করে কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায়। বাংলাদেশ সরকার কখনই বৈদ্যনাথতলায় অবস্থান করেননি। সরকারের প্রকৃত কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয় কোলকাতায়।

প্রবাসী সরকার ও মুক্তিবাহিনী

শক্তিশালী পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাস্ত করার জন্য সুশৃঙ্খল সামরিক কাঠামোর অধীনে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গঠনের প্রয়োজন ছিল। এই দিকে তাজউদ্দীন আহমেদ নজর দিয়েছিলেন। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ এপ্রিল বেতারে তিনি একটি ভাষণ দেন। এখানে তিনি সারা দেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেছিলেন। সেগুলো হলো:

১. মেজর খালেদ মোশাররফ - সিলেট ও কুমিল্লা অঞ্চল।
২. মেজর জিয়াউর রহমান - চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চল।
৩. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল।
৪. মেজর কে এম সফিউল্লাহ - ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চল।
৫. মেজর গিয়াস উদ্দিন আহমেদ - রাজশাহী অঞ্চল।
৬. মেজর নাজমুল হক - সৈয়দপুর অঞ্চল।
৭. মেজর নওয়াজেশ - রংপুর অঞ্চল।
৮. মেজর জলিল - ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী অঞ্চল।

প্রবাসী সরকারের দপ্তর বণ্টন হলে তাজউদ্দীন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিজ দায়িত্বে রাখেন। ১৪ এপ্রিল কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন সশস্ত্রবাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক। মে ও জুন মাসে তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। ফোর্সের নামকরণ করা হয় অধিনায়কদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। ফোর্সগুলির নাম ছিল: 'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' এবং 'কে ফোর্স'। অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান, লেঃ কর্ণেল কে. এম সফিউল্লাহ ও লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ।

১১ থেকে **১৭** জুলাই কোলকাতায় ইতোপূর্বে গঠিত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাজউদ্দিন আহমেদ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভাতেই বাংলাদেশকে **১১**টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এভাবে সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড স্থাপন করার মাধ্যমে মুক্তিবাহিনীকে প্রবাসী প্রশাসনের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়। বাংলাদেশ বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয় কোলকাতার ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে।

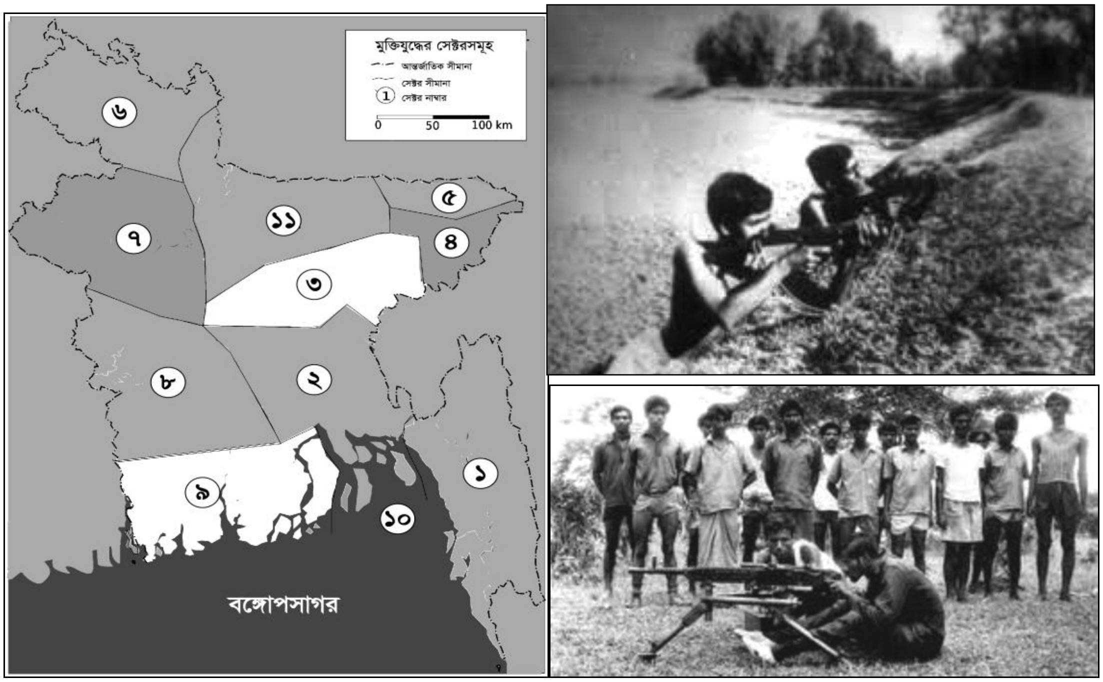

মুক্তিযুদ্ধের **১১**টি সেক্টর এবং ৭১ -এর মুক্তিযুদ্ধের খণ্ডচিত্র

অসংগঠিত বা পরে সংগঠিত বাহিনীর সদস্য হিসেবে যারা লড়াই করেছিলেন তাদের সবাইকে মুক্তিফৌজ, বা মুক্তিসেনা নামে অভিহিত করা হতো। পরে যারাই যুদ্ধ করেছেন তাদেরই মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত বাহিনীকে মুক্তিবাহিনী হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা অনিয়মিত ও নিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিতদের গণবাহিনী বলা হতো। নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্গত ছিল সৈন্যরা যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা ইপি.আর.-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বাকিরা গণবাহিনীতে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে গণবাহিনীতে নিযুক্ত করা হতো।

২৮ সেপ্টেম্বর এ.কে. খন্দকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় বিমান বাহিনী। পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করা নৌসেনাদের নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এছাড়া নৌকমান্ডোও গঠিত হয়। বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে সম্মুখ যুদ্ধ ও গেরিলা যুদ্ধে লিপ্ত হয় মুক্তিবাহিনী। এই প্রতিরোধ যুদ্ধের গৌরবময় পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশের বিজয়ের মাধ্যমে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন বিষয়ে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

২৫ মার্চ (১৯৭১) পাকিস্তান বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করে। দেশের ভয়াবহ সংকটের মুখে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে। এরপর মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। প্রবাসী সরকার ১০ এপ্রিল সারাদেশকে ৮টি রণাঙ্গনে বিভক্ত করেন। ১১ থেকে ১৭ জুলাই উক্ত ৮টি রণাঙ্গনের কমান্ডারদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। সেক্টরগুলোকে সাবসেক্টরে বিভক্ত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বৈদ্যনাথতলা কোন জেলায় অবস্থিত? (জ্ঞানমূলক)

ক) মেহেরপুর খ) ফরিদপুর
গ) যশোর ঘ) খুলনা

২। প্রবাসী সরকার গঠিত হয়েছিল কেন?

ক) দেশের অর্থ সম্পদ ভাগ করে দেওয়ার জন্য খ) পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতার জন্য
গ) উজ্জীবিত বাঙালিদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ঘ) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও বহির্বিশ্বের সহায়তা লাভের চেষ্টার জন্য

৩। সৈয়দ নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য–

i) তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা
ii) তিনি প্রবাসী সরকারের উপরাষ্ট্রপতি
iii) তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?

ক) ৮ টি খ) ৯ টি গ) ১০ টি ঘ) ১১ টি

৫। মুক্তিযুদ্ধকালে ব্রিগেড ফোর্স হিসেবে কোনটি সঠিক নয় ?

ক) জেড ফোর্স খ) কে ফোর্স গ) এস ফোর্স ঘ) এল ফোর্স

পাঠ-১৪.৫ মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধে শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও পেশাজীবী শ্রেণির ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা ও ভারতের অবদান সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধে দালাল, রাজাকার, আলবদর-আলশামসদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বুদ্ধিজীবী, 'পূর্ববাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ', 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ, 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি' তারামন বিবি, সিতারা বেগম, বামপন্থী দল, প্রবাসী বাঙালি, জর্জ হ্যারিসন, ওস্তাদ রবিশঙ্কর, ইন্দিরা গান্ধী, পিস কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, বিহারী, টিক্কা খান, নারী নির্যাতন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের অতি দ্রুত জয়লাভের কারণ ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, নারী, শ্রমিক ও আপামর জনসাধারণের সমর্থন, প্রবাসী বাঙালি, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ, ভারতের সমর্থন। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

ক. ছাত্রদের ভূমিকা

মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় ৭৫% ছিল ছাত্র, যাদের বয়স ছিল ১৫ থেকে ২০ এর মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের সামরিক সংগঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে– যেমন সেকশন কমান্ডার, প্লাটুন কমান্ডার ও কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছাত্রদের প্রাধান্য ছিল বেশি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ছাত্ররাই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সঙ্গে মাত্র তিন সপ্তাহের সামরিক ট্রেনিংকে সম্বল করে তারা নিজ জীবনকে বাজি রেখে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের পরোক্ষ ভূমিকাও ছিল। ছাত্রদের মধ্যে যারা সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি তারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। কেউ শরণার্থী শিবিরে ও ইয়োথ ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছে। কেউ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রেখে মুক্তি যোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করেছে।

খ. বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন করা, কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো, প্রচার মাধ্যমকে সচল রাখার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করা, রেডিওতে বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রোগ্রাম প্রচার করা, প্রবাসী সরকার পরিচালনায় সহযোগিতা করা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা ইত্যাদি কাজ ছিল অত্যন্ত জরুরি। এদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী এসব কাজের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কেবল ১৯৭১ সালেই নয়, ১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সমাজ স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

১৯৭১ সালের মার্চে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তাতেও বুদ্ধিজীবীগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেসময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পূর্ব বাংলা বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ' (৬.৩.১৯৭১), 'লেখক শিল্পী মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ' (৬.৩.১৯৭১) ইত্যাদি সংগঠন। তাছাড়া শিক্ষক সমিতি, চিকিৎসক সমিতি, আইনজীবী সমিতি, চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতি ও বিভিন্ন পেশাজীবী সমিতির ব্যানারে বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী শ্রেণির সদস্যবৃন্দ রাস্তায় নেমে আসেন এবং বিভিন্ন মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করেন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে অসংখ্য শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে গমন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে অসামরিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করেন। যেমন: প্রবাসী শিক্ষকগণ

ভারতীয় শিক্ষকবৃন্দের নৈতিক সমর্থন পাওয়ার জন্য ২১ মে (১৯৭১) গঠন করেন 'বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি'। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছিল কোলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গঠিত 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি'।

ভারতের শিক্ষকগণের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশের শিক্ষকগণ শরণার্থী শিবিরে ৫৬ টি স্কুল চালু করেছিলেন। তাছাড়া বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতি 'বাংলাদেশ : দ্যা রিয়েলিটি', 'বাংলাদেশ : দ্যা ট্রুথ' প্রভৃতি নামে পুস্তিকা প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, কবি, সাহিত্যিক, সংগীত শিল্পী, নাট্যকার, চারু ও কারু শিল্পী প্রমুখের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অব দি ইনটেলিজেন্টশিয়া'। এই সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত গঠনের কাজ করে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে নারী

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন। কেউ সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সংরক্ষণ ও সরবরাহকারীরূপে, কেউবা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দিয়ে, খাবার রান্না করে, অনুপ্রেরণা যুগিয়ে, তথ্য সরবরাহ করে, সেবাদান করে ইত্যাদি নানাভাবে ভূমিকা রেখেছেন। প্রতিটি নারী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধার মা, বোন ও স্ত্রী-এর যেকোনো একটি। সে হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান পুরুষের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো: কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে ৪০০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

আগরতলার লেম্বুচোরা ক্যাম্পে মহিলা গেরিলা স্কোয়াড-এর আধুনিক অস্ত্রের উচ্চতর ট্রেনিং হয়। রণাঙ্গনের যোদ্ধা তারামন বিবি বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন। চিকিৎসার কাজে নারী চিকিৎসকগণের গৌরবময় দৃষ্টান্ত ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম। তিনিও বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন। জনমতগঠনে দেশী-বিদেশী নারী মহিলা সংগঠন যেমন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন, পশ্চিমবংগ মহিলা সমিতি, লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন শিল্পী সংস্থা গঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে নারী সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রশংসনীয় অবদান ছিল।

ঙ. মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দল

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মস্কোপন্থী বামদলগুলো যেমন কমিউনিস্ট পার্টি (মনিসিংহ), ন্যাপ (মোজাফফর), ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও কৃষক সমিতি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই চারদলের প্রায় ছয় হাজার সদস্য বিভিন্ন সেক্টরে ভূমিকা পালন করে এবং স্পেশাল গেরিলা বাহিনীর ২০০০ সদস্য ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। স্পেশাল বাহিনীর একটি দলকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা ফিরে আসার পূর্বেই দেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

চ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা শুরু হলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সহায়তায় এগিয়ে আসেন। এর মধ্যে লন্ডন, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটনে (যেখানে বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন) বাঙালিরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন, স্মারকলিপি দেন, সংসদ সদস্যদের কাছে ধর্ণা দেন, মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। লন্ডনে ইউরোপের অন্যান্য প্রবাসী বাঙালিরা এসে মিলিত হতেন। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিদের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিদেশের দূতাবাসসমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন : কোলকাতার পাকিস্তানী ডেপুটি হাই কমিশনের হোসেন আলী এবং অন্যান্য বাঙালি স্টাফ (১৮.০৪.৭১), নিউইয়র্কে পাকিস্তান কনসুলেট জেনারেলের ভাইস কনসাল আবুল হাসান মাহমুদ আলী (২৬.০৪.৭১), লন্ডনস্থ পাকিস্তান হাই কমিশনের দ্বিতীয় সেক্রেটারি মহিউদ্দিন আহমদ (১.০৮.৭১), ওয়াশিংটনে পাকিস্তানী দূতাবাসে ইকনমিক কাউন্সিল পদে কর্মরত আবুল মাল আব্দুল মুহিত (১.০৮.৭১), আবুল ফতেহ (ইরাকে কর্মরত ২১.০৮.৭১), হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (দিল্লীতে কর্মরত, ৪.১০.৭১), আবদুল মোমিন (আর্জেন্টিনায় কর্মরত, ১১.১০.৭১), ওয়ালিউর রহমান (সুইজারল্যান্ডে কর্মরত, ০৩.১১.৭১) প্রমুখ।

ছ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী নাগরিকদের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ বাঙালিদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানের পক্ষে থাকলেও সেদেশের নাগরিকেরা বাঙালিদের সমর্থনে সরকারের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করেছিল যে, মার্কিন সরকার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি। যুক্তরাজ্যের নাগরিকেরা বাঙালিদের সংগে রাস্তায় নেমেছেন। পাকিস্তানে সিভিল সমাজের অনেকেই বাঙালিদের সমর্থন করতে গিয়ে জেলে গেছেন। অস্ট্রেলিয়ার এক কবি বাঙালি শরণার্থীদের জন্য অস্ট্রেলিয়ার সরকারের দানের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবিতে অনশন করেছেন। বুয়েনস আয়ার্সে নোবেলজয়ী লেখক বোর্হেস, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য বুদ্ধিজীবী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো বাংলাদেশের সমর্থনে মিছিল করেছেন। জর্জ হ্যারিসন, রিংগো স্টার, লিয়ন রাসেল, ওস্তাদ রবিশঙ্কর প্রমুখ নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বাঙালিদের জন্য কনসার্টের আয়োজন করেছিলেন। জন বেজ বাংলাদেশের জন্য গেয়েছিলেন। অ্যালেন গিনসবার্গ বাংলাদেশের জন্য কবিতা লিখেছেন।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধের সময় দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠি

লে. জেনারেল টিক্কা খান ৬ মার্চ (১৯৭১) পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও ৭ মার্চ গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ঐ দুই পদে বহাল থাকেন। ২ সেপ্টেম্বর ডা. এ.এম. মালিক গভর্নর এবং লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত হয়। ডা. মালিকের নেতৃত্বে ১৮ সেপ্টেম্বর বাঙালিদের এক মন্ত্রিসভা গঠন করার মাধ্যমে পাকিস্তান বাহিনী আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে সকল বাঙালিই মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক নয়। এসব বিশ্বাসঘাতক বাঙালিরাই মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে সরকারের বাইরে থেকেই সৃষ্টি করেছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী, সারাদেশে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও বিডি মেম্বারদেরকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পিস কমিটি। এসব পিস কমিটির সদস্য এবং রাজাকার ও আলবদর বাহিনীর সদস্যবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষের ওপর চালিয়েছিল অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, বাড়িঘর লুণ্ঠন ও তা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া এসব জঘন্য কাজ।

শান্তি কমিটি

৯ এপ্রিল (১৯৭১) ঢাকায় ডানপন্থী বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে ১০৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি নাগরিক শান্তিকমিটি গঠন করে। ১৪ এপ্রিল কমিটির নাম পরিবর্তন করে করা হয় পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। পরে জেলা, মহকুমা, থানা ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি কমিটি সাধারণ মানুষের কাছে পিস কমিটি নামে বেশি পরিচিত। পিস কমিটির সদস্যদেরকে দালাল বলা হয়। এখনও মানুষ রাজাকার ও দালালকে আলাদা নামে চেনে। রাজাকার বাহিনী গঠন, রাজাকারদেরকে পরিচালনা করা, রাজাকারের অপকর্মকে সম্মতি দেয়া এবং রাজাকারকে দিয়ে লূটপাট, অগ্নিসংযোগ করা, মেয়েদেরকে ধরে আনা এসব কাজ দালালরাই করেছে।

রাজাকার বাহিনী

লে. জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ৭১' জারি করেন। তার পূর্বেই '৭১-এর মে মাসে মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ ৯৬ জন জামায়াত কর্মীর সমন্বয়ে খুলনায় আনসার ক্যাম্পে 'রাজাকার বাহিনী' গঠন করেন। পরবর্তীকালে অর্ডিন্যান্সে এই নাম গ্রহণ করা হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রধান মোঃ ইউসুফ রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। রাজাকার বাহিনী পাকিস্তান রক্ষার সংগ্রামের নামে মুক্তিযোদ্ধার সন্ধান দেওয়া, হানাদার বাহিনীকে তাদের বাড়িঘর চিনিয়ে দেওয়া, গ্রাম থেকে গরু-ছাগল-মুরগি ধরে এনে পাকিস্তানী বাহিনীর ক্যাম্পে সরবরাহ করা, গ্রাম থেকে যুবতী নারী ধরে এনে আর্মি ক্যাম্পে সরবরাহ করেছে।

আলবদর বাহিনী

রাজাকার বাহিনী গঠনের পর আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। তবে রাজাকারের অধ্যাদেশের মত এর কোন আইনগত ভিত্তি নেই। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর উদ্যোগ ও প্রেরণায় এই বাহিনী গঠিত হয়। আলবদরদের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে পাকিস্তান বাহিনী। আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ইসলামী ছাত্র সংঘের সদস্যরাই আলবদর বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। এই বাহিনীর কাজ ছিল দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ভাবধারার সমর্থক ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক শ্রেণিকে হত্যা করা।

আলশামস বাহিনী ও বিহারী সম্প্রদায়

আলশামস বাহিনী গঠিত হয়েছিল প্রধানত অবাঙালি (বিহারি)-দের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানী বাহিনী এদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয় এবং বাঙালি নিধনে দেয় অবাধ অধিকার। বাঙালির সম্পদ লুট করতেও এদেরকে উৎসাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস জুড়ে বিহারী সম্প্রদায় যে লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা অকল্পনীয়। শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর বাহিনী প্রধানত গঠিত হয়েছিল বিভিন্ন পাকিস্তানপন্থী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে দখলদার সরকার ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠী ও দল সম্পর্কে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, পেশাজীবী শ্রেণি, শিল্পী, খেলোয়াড়, প্রবাসী বাঙালি প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে নারীদেরও অবদান ছিল। অনেক বিদেশী নাগরিক মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা ও পাকিস্তান সরকারকে ও বাহিনীকে সহযোগিতা করেছে দালাল, রাজাকার, আলবদর ও আলশামস বাহিনীসমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে–

i) কৃষক শ্রমিক ছাত্র শিক্ষক ii) পুলিশ ইপিআর সেনাবাহিনী iii) আলবদর আল শামসবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। কোলকাতার গোবরা ক্যাম্পে কতজন নারী সশস্ত্র ট্রেনিং গ্রহন করেন? (জ্ঞান)

ক) ২০০ জন খ) ৪০০ জন
গ) ৬০০ জন ঘ) ৮০০ জন

অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনারে একজন বক্তা বলেন, শুধু এদেশের সর্বস্তরের জনগণই নয় অনেক দল ও সংগঠন এমনকি অনেক দেশ ও এ যুদ্ধে সহায়তা করেছে প্রতিবেশী একটি দেশ প্রায় ১ কোটি শরণার্থীকে সে সময় আশ্রয় দেয়। যুদ্ধের জন্য যোদ্ধা তৈরির সশস্ত্র প্রশিক্ষণও দিয়েছিল।

৩। এদেশকে বেসরকারিভাবে সহযোগিতা করেছিল– (অনুধাবন)

i) অধিকাংশ রাজনৈতিক দল
ii) পেশাজীবী সংগঠন
iii) সেনাবাহিনী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। অনুচ্ছেদে উল্লিখিত কোন দেশের কথা বলা হয়েছে–

ক) চীন খ) নেপাল

গ) ভারত ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

৫। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বুয়েনস আয়ার্সে মিছিল করেছেন–

i) বোহের্স ii) অ্যালেন গিনসবার্গ iii) ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) i ও ii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৪.৬ মুক্তিযুদ্ধ ও বিশ্ব জনমত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা বলতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিরূপণ করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পরাশক্তি, চিন, আমেরিকা, মুসলিম দেশ, ভারত, সেভিয়েট ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, জাতিসংঘ, শরণার্থী।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। একভাগের নেতৃত্বে পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ও মুসলিম দেশসমূহ, অন্যদিকে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ। সৌদি আরব, ইরান, ইরাক প্রভৃতি দেশসমূহ এবং ওআইসি বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার প্রতিবাদ করেনি বরং পাকিস্তানকে সমর্থন করতে বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছে।

সোভিয়েত বলয়ভুক্ত দেশসমূহ সরাসরি বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। মার্কিন বলয়ভুক্ত দেশসমূহ মার্কিনী সরকারের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন জানায়নি। তারা গণহত্যার নিন্দা করেছে, শরণার্থীদের সহায়তা করেছে, রাজনৈতিক মীমাংসার আহ্বান জানিয়েছে। ওদিকে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে। চীনের গণহত্যা সমর্থন বিশ্বজুড়ে এমনকি ভারত ও বাংলাদেশের চিনাপন্থী কমিউনিস্টদের বিপদে ফেলেছে। জাতিসংঘে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে তিন পরাশক্তির বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে জাতিসংঘের উদ্বাস্তু বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইউএনএইচসিআর শরণার্থীদের সহায়তা করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যের নীতির মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের কাঠামোর অভ্যন্তরে বাঙালির স্বাধীকার সমস্যার সমাধান করা। বাংলাদেশের ঘটনায় ব্রিটেন সরকারিভাবে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য ব্রিটিশ সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকারের নিরপেক্ষ নীতির কারণে ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকায় ও বেতার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারণা সহজতর হয়েছিল এবং ব্রিটেনের মাটিকে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ে তোলার জন্য কোন সরকারি বাধা বিঘ্ন ছাড়াই জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এসব অবস্থা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল করে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন সরকার পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। এমনকি ডিসেম্বরে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে সপ্তম নৌবহর প্রেরণ করে। সে সময় মার্কিন সরকারের যুক্তি ছিল যে, পাকিস্তান পুরনো বন্ধু, সিয়াটো-সেন্টোর সদস্য, সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ, তদুপরি মার্কিন-চিন সম্পর্ক উন্নয়নে পাকিস্তান তখন মধ্যস্থতা করছিল। কিন্তু তখন মার্কিন আইন পরিষদের সদস্যরা, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, গণমাধ্যম, জনসাধারণ অর্থাৎ এক কথায় সরকার ব্যতিরেকে আর সকলেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধে মার্কিন সরকার ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা নিয়ে একটি অ্যাসাইমেন্ট লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সারা বিশ্ব ও পরাশক্তিসমূহ দুভাগে ভাগ হয়েছিল। ভারত ও সেভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তবে সবদেশের জনমত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিল। পরাশক্তিসমূহের বিভাজনের কারণে জাতিসংঘ কোন ভালো ভূমিকা রাখতে পারেনি। সে সময় যুক্তরাজ্য সরকার নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সারা বিশ্ব কয়টি ভাগে বিভক্ত হয়েছিল–

ক) ২টি খ) ৩টি

গ) ৪টি ঘ) অবিভক্ত

২। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের জন্য কোন সরকার আন্তর্জাতিক ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নেয়?

ক) যুক্তরাষ্ট্র খ) যুক্তরাজ্য

গ) সংযুক্ত আরব আমীরাত ঘ) চিন

পাঠ-১৪.৭ স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায় সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে ভারতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটো দেবার বিষযে বর্ণনা দিতে পারবেন;
- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের বিষয়ে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	গেরিলা আক্রমন, ইন্দিরা গান্ধী, ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তি, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী, ভারতীয় বাহিনী, যৌথবাহিনী, মুক্তিবাহিনী, সপ্তম নৌবহর, জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জেনারেল নিয়াজী, কাদের সিদ্দিকী।

পাকিস্তানী বাহিনী ও তার দোসর দালাল, আলবদর, আলশামস এবং রাজাকার বাহিনীর অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন প্রভৃতি সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনী কর্তৃক যৌথভাবে পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনি পরিস্থিতিতে আসন্ন পরাজয়ের মুখে পড়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা। তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়। ১৮ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশে পাকিস্তান বিমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে ভারতের বিমান বাহিনী। মুক্তিবাহিনী ও যৌথবাহিনীর আক্রমণের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী সর্বত্র পিছু হটতে শুরু করে।

রেসকোর্সে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ

৬ ডিসেম্বর ভূটান ও ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানকে রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করে। যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনবার ভেটো দেয়। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে ৭ম নৌবহর প্রেরণ করে। তার পাল্টা ভারত মহাসাগরে অবস্থিত সোভিয়েত ইউনিয়নের ২০তম নৌবহর ৭ম নৌবহরের পিছু নেয়। মিত্র বাহিনী বোমা নিক্ষেপ করে মার্কিন নৌবহরের চট্টগ্রাম অবতরণের পথ রুদ্ধ করে

দেয়। তবে এতে বন্দরের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রায় সকল ব্যবস্থাই অচল হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত জেনারেল আবদুল্লাহ নিয়াজী ১৬ ডিসেম্বর ৯৩ হাজার সৈন্য ও অফিসারসহ আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন।

যৌথবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা, জিওসি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খোন্দকার উপস্থিত ছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ৯ মাস ব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সূচিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের 'আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়'। সে হিসেবেই ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলির বিবরণ লিখে শিক্ষককে জমা দিন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারত আক্রমণ করে। ভারতও তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দেয়। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত হয় যৌথবাহিনী। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব আনলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তিনবার ভেটো দেয়। যৌথবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি বাহিনী ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক বিজয় ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার যথার্থ কারণ কোনটি? (অনুধাবন)

ক) পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ খ) পাকিস্তানের ভারত আক্রমণ

গ) পাকিস্তানের নেপাল আক্রমণ ঘ) পাকিস্তানের ভুটান আক্রমণ

২। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাবে ভেটো দানকারি দেশ হিসেবে নিচের কোনটি অধিক যুক্তিযুক্ত? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক) ভারত খ) চীন

গ) সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘ) ফ্রান্স

৩। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের কত হাজার সৈন্য উপস্থিত ছিল?

ক) ৯০ হাজার খ) ৯১ হাজার

গ) ৯২ হাজার ঘ) ৯৩ হাজার

৪। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিজয় দিবস কবে?

ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ২৬ মার্চ

গ) ১৭ এপ্রিল ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১	ঃ	১. ঘ	২. গ	৩. গ	৪. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২	ঃ	১. ক	২. খ	৩. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩	ঃ	১. খ	২. গ	৩. খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪	ঃ	১. ক	২. ঘ	৩. ঘ	৪. ঘ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৫	ঃ	১. খ	২. গ	৩. ক	৪. গ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৬	ঃ	১. ক	২. খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৭	ঃ	১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ঘ	